ক্রোচের এস্থেটিক
ও
এসেন্স অফ্ এস্থেটিক

সাধনকুমার ভট্টাচার্য্য

। জাতীয় সাহিত্য পরিষদ ।
১৪, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট কলি: ৯

প্রথম প্রকাশ : ১লা বৈশাখ, ১৩৭০

প্রচ্ছদ : গৌরীশংকর

১৭, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৯ জাতীয় সাহিত্য পরিষদ হইতে এস. দত্ত কর্তৃক প্রকাশিত ও ৬০, পটুয়াটোলা লেন, কলিকাতা-৯ হইতে রূপলেখা প্রেসের পক্ষে শ্রীঅজিতকুমার সাউ কর্তৃক মুদ্রিত।

উৎসর্গ

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, দর্শনরসিক সমালোচক ও সাহিত্যিক—শ্রীযুক্ত হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় আই. সি. এস. মহোদয়ের করকমলে—

বিনীত
সাধনকুমার ভট্টাচার্য্য

পৃষ্ঠা নির্দেশিকা

গ্রন্থকারের অন্যান্য গ্রন্থ

১। নাট্যসাহিত্যের আলোচনা ও নাটক বিচার — ১ম খণ্ড
২। ঐ — ২য় ,,
৩। ঐ — ৩য় ,,
৪। ঐ — ৪র্থ ,,
৫। ঐ — ৫ম ,,
৬। নাটক ও নাটকীয়ত্ব
*৭। নাটক লেখার মূলসূত্র
৮। রবীন্দ্র নাট্য সাহিত্যের ভূমিকা
৯। হোরেসের 'আরস পোয়েটিকা'
১০। এরিস্টটলের পোয়েটিকস্ ও সাহিত্যতত্ত্ব
১১। মহাকাব্য জিজ্ঞাসা
১২। শিল্পতত্ত্বের কথা
১৩। নাট্যতত্ত্ব মীমাংসা
১৪। নাটকের রূপ রীতি ও প্রয়োগ
১৫। রাজা ইডিপাস (অনুবাদ)
১৬। ভরতের নাট্যশাস্ত্র ও অভিনব ভারতী (যন্ত্রস্থ)
১ । বাংলার নাট্যকার ও নাটক ৩য় খণ্ড (,,)
১৮। বিশ্বনাট্য পরিক্রমা (,,)

থিওরি অফ এস্থেটিক

বিষয়-সূচী

১। প্রথম অধ্যায়—প্রতিভান ও প্রকাশন

২। দ্বিতীয় অধ্যায়—প্রতিভান ও শিল্প

৩। তৃতীয় অধ্যায়—শিল্প ও দর্শন

৯। নবম অধ্যায়—প্রকাশনের অবিভাজ্যতা এবং অলংকার শাস্ত্রের সমালোচনা।

শিল্পের বৈশিষ্ট্য—প্রকাশনে প্রকারভেদের অসম্ভবতা—অনুবাদের অসম্ভবতা—আলংকারিক শ্রেণীবিভাগের সমালোচনা—আলংকারিক পরিভাষার ব্যবহারিক তাৎপর্য—শৈল্পিক ব্যাপারের সমার্থক হিসাবে তাদের ব্যবহার—নানাপ্রকার শৈল্পিক অসম্পূর্ণতা বুঝাতে তাদের প্রয়োগ—তাদের শিল্পশাস্ত্র-বহির্ভূত প্রয়োগ—বিজ্ঞানে প্রয়োগ—বিদ্যালয়ে অলংকারশাস্ত্র—প্রকাশনের সঙ্গে সাদৃশ্য—অনুবাদের আপেক্ষিক সম্ভাব্যতা। (১২০-১২৬)

১০। দশম অধ্যায়—শৈল্পিক অনুভব এবং সুন্দর ও অসুন্দরের পার্থক্য।

অনুভব শব্দটির বিভিন্ন অর্থ—ক্রিয়াহিসাবে অনুভব—আর্থনৈতিক ক্রিয়ার সঙ্গে অনুভবকে এক করে দেখা—সুখবাদের সমালোচনা—প্রত্যেক ক্রিয়ার আনুষঙ্গিক রূপে অনুভব—অনুভবের সাধারণ কতকগুলি অর্থ—মূল্য ও অসৎমূল্য—বিপরীতধর্মী ও তাদের সংযোগ—প্রকাশনের মূল্য রূপে সৌন্দর্য—অথবা বিশেষণবিহীন প্রকাশন—অসুন্দর বা কুৎসিত—সুন্দরের উপাদান—সুন্দরও নয়, অসুন্দরও নয় এমন প্রকাশনের অস্তিত্বে মিথ্যা বিশ্বাস—বিশুদ্ধ শৈল্পিক আবেগ এবং আনুষঙ্গিক ও আকস্মিক আবেগ। (১২৭-১৩৫)

১১। একাদশ অধ্যায়—শৈল্পিক সুখবাদের সমালোচনা

সৌন্দর্য উচ্চতর ইন্দ্রিয়কে পরিতৃপ্ত করে—এই মতবাদের সমালোচনা—খেলাবাদের সমালোচনা—যৌনকামনাবাদের এবং বিজয়াকাঙ্ক্ষাবাদের সমালোচনা—সহানুভূতিবাদের সমালোচনা—সুখবাদে আধার ও আধেয়—সুখবাদ ও নীতিবাদ—নীতিবাতিকগ্রস্তের শিল্প অস্বীকার ও পণ্ডিতদের সমর্থন—বিশুদ্ধ সৌন্দর্যের সমালোচনা। (১৩৬-১৪০)

১২। দ্বাদশ অধ্যায়—সহানুভব্যের শিল্পশাস্ত্র এবং ছদ্ম শৈল্পিক সংজ্ঞা।

ছদ্ম-শৈল্পিক সংজ্ঞা—সহানুভব্যের শিল্পশাস্ত্র—শিল্পে অসুন্দর এবং তাকে

এসেন্স অফ এস্থেটিক

বিষয়-সূচী

—*—

মুখবন্ধ

বেনিডেট্টো ক্রোচের 'এস্তেতিকা' গ্রন্থের ইংরেজি-অনুবাদক শ্রদ্ধেয় ডগলাস্ আইন্স্লি মহাশয়, অনূদিত এস্থেটিক গ্রন্থের প্রথম মুদ্রণের ভূমিকায় (১৯০৯) লিখেছিলেন—'এ দাবি আমি করব না যে আমি আমেরিকা আবিষ্কার করেছি কিন্তু এ দাবি আমি করছি যে আমি একজন কলম্বাসকে আবিষ্কার করেছি। এই কলম্বাস হচ্ছেন—বেনিডেট্টো ক্রোচে।' অনুবাদক মহাশয়ের কাছে বেনিডেট্টো ক্রোচে—কলম্বাস—শিল্পতত্ত্বের নতুন জগতের আবিষ্কারক। ক্রোচে কলম্বাস কিনা সে প্রশ্নের আলোচনায় প্রবেশ না করে প্রথমেই আমরা এই আবিষ্কারককে যিনি আবিষ্কার করেছেন—নেপল্স্ নগরীর নতুন কলম্বাসকে যিনি ইংরেজি ভাষাভাষীর কাছে পৌঁছে দিয়েছেন, সেই আইন্স্লি মহাশয়কে বহু ধন্যবাদ জানাই। তাঁর পরিশ্রমের ফলেই আমরা ক্রোচের "অ' এস্তেতিকা" (১৯০২) এবং "ব্রিভিয়ারিয়ো ডি এস্তেতিকা"—যথাক্রমে "এস্থেটিক" এবং "এসেন্স্ অফ এস্থেটিক" নামে যা' ইংরেজিতে অনূদিত—এই বহুমূল্য দু'খানি শিল্পতত্ত্ব-শাস্ত্রের ইংরেজি অনুবাদ পেয়েছি—পেয়েছি নতুন মত-বাদ প্রতিভানবাদকে (intuitionism)—রূপায়নবাদকে (expressionism)। প্রতিভানবাদ বা রূপায়নবাদ কতখানি নতুন মতবাদ সেই আলোচনায় প্রবেশ না করেও আমরা বলতে পারি—ক্রোচে-স্থাপিত প্রতিভানবাদ বিংশ শতাব্দীর শিল্পতত্ত্ব-আলোচনায় বিশিষ্ট সংযোজনা—দার্শনিক শিল্পতত্ত্বে একটি নতুন অধ্যায়। প্রতিভানবাদে ক্রোচে শিল্পের জন্য একটি স্বতন্ত্র এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করেছেন, আত্মার বিভিন্ন বৃত্তির স্বরূপ নির্ধারণ করে তারই একটি স্বতন্ত্র ও স্বাধীন বৃত্তিকে শিল্পের উৎসরূপে স্থাপন করতে চেষ্টা করেছেন। এই চেষ্টার জন্য ক্রোচে অবশ্যই প্রবর্তকের মর্যাদা দাবি করতে পারেন। বাস্তবিকই ক্রোচে একজন নব-কলম্বাস। তাঁর আবিষ্কার শুধু ইতালীর সংকীর্ণ সীমার মধ্যেই আবদ্ধ হয়ে নেই, পৃথিবীর সমস্ত দেশেই তা' পরিব্যাপ্ত হয়ে গেছে। প্রতিভানবাদ আজ আর ব্যক্তিবিশেষের মন্তব্য মাত্র নয়, শিল্পতত্ত্বের একটি, এবং প্রধান একটি, প্রস্থান বা সিদ্ধান্ত। ক্রোচে আজ এতই প্রধান যে ক্রোচেকে স্বীকার বা খণ্ডন না করে শিল্পতত্ত্ব আলোচনায় অগ্রসর হওয়ার উপায় নেই। শিল্পতত্ত্ব আলোচনায় যেমন

এরিস্টটল, প্লাটিনাস, কাণ্ট, হেগেল, টলস্টয়, কোলরিজ, প্রমুখ শিল্পতত্ত্ববিদদের সিদ্ধান্তকে পাশ কাটিয়ে যাবার উপায় নেই, তেমনি ক্রোচেকে উপেক্ষা করে বা বাদ দিয়ে, শিল্পতত্ত্বের কোন আলোচনাই আজ সম্ভব নয়। শত্রুভাবেই করি আর মিত্রভাবেই করি—ক্রোচেকে ভজনা করতেই হবে। ক্রোচে আজ অপরিহার্য; তাঁর প্রতিভানবাদ আজ শুধু সুপ্রতিষ্ঠিতই নয়, জড়বাদী শিল্পদর্শনের প্রবলতম প্রতিদ্বন্দ্বী।

* * * *

বেনিডেট্টো ক্রোচে একুইলা প্রদেশের অন্তর্গত ছোট্ট একটি সহরে ধনাঢ্য ক্যাথলিক পরিবারে ১৮৬৬ খ্রীঃ জন্মগ্রহণ করেন। পিতামাতা ছিলেন গোঁড়া ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের লোক এবং অতিসংরক্ষণশীল। একমাত্র পুত্র ক্রোচেকে তাঁরা নিষ্ঠাবান ক্যাথলিকে পরিণত করবার জন্য ক্যাথলিক ধর্মতত্ত্বে শিক্ষিত করবার যথা সাধ্য চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু ফল হলো বিপরীত। ক্রোচে নাস্তিক হয়ে উঠলেন। কারণ ইতালীতে—যেখানে 'রেনেসাঁস' হয়েছিল, কিন্তু 'রিফর্মেশান' হয়নি,—আস্তিক্য ও নাস্তিক্যের মধ্যবর্তী কোন অবস্থা সম্ভব ছিল না। ক্রোচে ধর্মতত্ত্বগুলি নেতি নেতি ক'রে পাঠ করে, তাদের স্বরূপ বুঝতে পেরেছিলেন এবং ধর্মের উৎপত্তির ও স্থিতির কারণ বুঝতে পেরে অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছিলেন। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর জীবনে দারুণ এক দুর্ঘটনা ঘটল। ক্রোচে-পরিবার তখন 'কেসামিক্কিয়োলা'-সহরে বাস করছিলেন। ভূমিকম্পে সহরটি বিধ্বস্ত হল। ক্রোচের পিতামাতা এবং একমাত্র বোন মারা গেলেন। ক্রোচে কয়েক ঘন্টা ধ্বংসাবশেষের তলে কবরস্থ থাকার পরে, ভাঙ্গা পাঁজর নিয়ে কোন রকমে বেঁচে গেলেন। পিতামাতার মৃত্যুর পরে ক্রোচে তিন বছর রোমে বাস করেন এবং দার্শনিক এন্টোনিও লেব্রিয়োলার বক্তৃতা শুনে দর্শনের দিকে আকৃষ্ট হন। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি নেপলস্-এ ফিরে আসেন। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে ক্রোচে বিখ্যাত "লা' ক্রিটিকা" পত্রিকা প্রকাশ করেন। এই পত্রিকাতেই তিনি এবং জিওভানি জেন্টাইল নানাবিধ তত্ত্বের ও সাহিত্যের বিচার-বিশ্লেষণ করেন।

সম্পাদক ও দার্শনিক ক্রোচে ১৯১০ খ্রীঃ 'সেনেটর' নিযুক্ত হন। ইতালীতে

একবার সেনেটর তো চিরকাল সেনেটর। ফলে দার্শনিক রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন এবং ১৯২০-২১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি শিক্ষা মন্ত্রীর পদ অলংকৃত করেন। মুসোলিনীর আবির্ভাবে—ক্রোচে রাজনীতি থেকে দূরে সরে যান বটে, কিন্তু যুদ্ধের পরে আবার রাজনীতির ক্ষেত্রে ফিরে আসেন। বড় সৌভাগ্যের কথা এই যে রাজনীতি দার্শনিক ক্রোচের জ্ঞানপিপাসাকে নষ্ট করতে পারে নি, লক্ষ্মী এসে সরস্বতীকে বিতাড়িত করতে পারে নি। ক্রোচের রচনাগুলিই তার বড় প্রমাণ।

* ক্রোচের রচনা :—

ক্রোচের রচনা :—(ইংরেজি অনুবাদের নাম)

১। হিস্‌টোরিকাল মেটিরিয়ালিজিম এ্যাণ্ড দি ইকনমিকস্ অফ কার্ল মার্কস—(র. ১৯০০ ; অনু. ১৯১৭—সি-এম মেরিডিথ)

*২। এইস্থেটিক (১৯০২ ; অনু. ডগলাস আইনসলি—১৯০৯)

৩। লজিক (১৯০৫ ; অনু. ঐ —১৯০৭)

৪। ফিলোসফি অফ দি প্রাকটিকাল (১৯০৮ ; অনু. ঐ—১৯১৩)

৫। থিওরি এ্যাণ্ড হিস্ট্রি অফ হিস্টোরিয়োগ্রাফি (১৯১২ ; অনু.ঐ— ১৯২১)

৬। এ্যান অটোবায়োগ্রাফি ১৯১৮, অনু. আর. জি. কলিঙউড—১৯২৭)

*৭। দি এসেন্স অফ এইস্থেটিক (১৯২০ ; অনু. ডগলাস আইন্‌সলি—১৯২১)

৮। দি কন্‌ডাক্‌ট অফ লাইফ (১৯২১ ; অনু. এ. লিভিংস্টোন—১৯২৫)

৯। পলিটিকস এ্যাণ্ড মরালস্ (১৯৩১ ; অনু. এস. জে. ক্যাস্টিগলিয়োন—১৯৪৮)

১০। হিস্ট্রি এ্যাজ দি স্টোরি অফ লিবার্টি (১৯৪০ ; এস. স্প্রিগ্‌গ—১৯৪১)

১১। ইয়োরোপীয়ান লিটারেচার ইন দি নাইনটিনথ্ সেঞ্চুরি (১৯২৩ ; অনু. ডগলাস আইনসলি—১৯২৪)

১২। দি পোয়েট্রি অফ দান্তে (১৯২০ ; অনু. ড. আ.—১৯১২)

১৩। হিস্ট্রি অফ ইতালি (১৮৭১-১৯১৫)

১৪। হিস্ট্রি অফ ইয়োরোপ ইন দি নাইন্‌টিন্থ্ সেঞ্চুরি (১৯২২; অনু. এইচ ফুর্স্ট, ১৯৩৩)

১৫। Il carattere della philosophia Moderna (১৯৪১)

১৬। Philosophiae Storiagraphsa (১৯৪৯)

১৭। Poesia popolare e poesia d' Arte (১৯৩৩)

১৮। Poesia Antica e poesia Moderna (১৯৪০)

১৯। La Letleratura della Nuava Italia (৬ খণ্ড—১৯১৭-৪০)

* * * *

উল্লিখিত রচনাগুলির দিকে দৃষ্টিপাত করলেই ক্রোচের বহুমুখী চিন্তার পরিচয় পাওয়া যায়। তার বিশেষ পরিচয় দেওয়ার অবকাশ ও প্রয়োজন আমাদের নেই। প্রথম গ্রন্থখানির নাম দেখে এ অনুমান করা মিথ্যা নয় যে ক্রোচে প্রথমে মার্কসীয় চিন্তার দিকে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর নিজের উক্তিও উল্লেখযোগ্য। তিনি লিখেছেন—"This intercourse with the literature of Merxism and the eagerness with which for sometime I followed the socialistic press of Germany and Italy, stirred my whole being and for the first time awakened in me a feeling of political enthusiasm yielding a strange taste of newness to me." কিন্তু সৌভাগ্য কি দুর্ভাগ্য জানিনে মার্কসীয় সাহিত্য পাঠ করেও ক্রোচে বস্তুবাদের শিবিরে প্রবেশ করেননি, বস্তুবাদকে তিনি মনে প্রাণে গ্রহণ করতে পারেন নি। দার্শনিক হিসাবে ক্রোচে পুরোদস্তুর ভাববাদীই (আইডিয়ালিস্ট) থেকে গেছেন। ডগলাস আইনস্‌লির উক্তিটিও এই সিদ্ধান্তেরই পরিপোষক। তিনি লিখেছেন—ক্রোচের 'আত্মার দর্শন'-এ (Phtilosophy of the spirit), উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধের স্থূল বস্তুবাদী দর্শনের বিরুদ্ধে বিংশ শতাব্দীতে যে অভিপ্রেত প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল, সেই প্রতিক্রিয়াই প্রতিফলিত হয়েছে। ক্রোচে স্থূল বস্তুবাদের সংস্কার থেকে শিল্পতত্ত্বকে মুক্ত করে ভাববাদের স্বরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত তথা প্রকৃতিস্থ করেছেন। বলা বাহুল্য, অনুবাদকের এই মন্তব্যটি ক্রোচের দার্শনিক

শিবিরটির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেছে এবং মন্তব্যটি ক্রোচের ভাববাদ-আনুগত্যেরই প্রশংসাবচন। কিন্তু ক্রোচে ভাববাদীই হোন চৈতন্যবাদীই হোন বা আর যাই হোন—ক্রোচে পরাতত্ত্ববাদী বা অতিপ্রাকৃতবাদী বা দৈববাদী নন। পরমার্থ বা পরাতত্ত্ব হিসাবে তিনি কোন ঈশ্বরকে খাড়া করেননি, আত্মার অমরত্বে বিশ্বাস করেননি এবং ধর্মকে (রিলিজিয়ন) হেয় বলে ঘোষণা করেছেন। তিনি স্পষ্টভাষায় জানিয়েছেন—মানুষের জ্ঞানাত্মিকা ক্রিয়ার পাশাপাশি—শিল্প, সমালোচনা এবং দর্শনের পাশাপাশি—ধর্মকে জাইয়ে রাখার কোন সার্থকতা নেই ; দর্শনের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই ধর্মের অস্তিত্ব নিরর্থক হয়ে গেছে।—(we do not know what use could be made of religion by those who wish to preserve it side by side with the theoretic activity of man, with his art, with his criticism and with his philosophy. It is impossible to preserve an imperfect and inferior kind of knowledge, such as religion, side by side with what has surpassed and disproved it." (৬৩ পৃষ্ঠা) ক্রোচের উক্তিটি এতো স্পষ্ট যে এর কোন ব্যাখ্যারি প্রয়োজন নেই। আমরা অসংকোচেই এ কথা বলতে পারি—ক্রোচে আত্মায় বিশ্বাস করেন, কিন্তু 'পরমাত্মা'কে মানেন না, তিনি 'স্পিরিট' বলতে প্রধানতঃ চৈতন্যকেই বুঝেছেন—কোন পরমাত্মা ঈশ্বর-সত্তাকে বোঝেননি। ক্রোচে 'স্পিরিট' স্বীকার করেও প্রচলিত স্পিরিচুয়ালিস্ট' নন। এই কারণেই জনৈক দর্শনরসিক সমালোচক লিখেছেন—"we have here the unusual occurrence of a philosophy that is at once naturalistic and spiritualistic, agnostic and indeterministic, practical and idealistic, economic and aesthetic." (স্টোরি অফ ফিলোসফি—উইল ডুরান্ট)। অর্থাৎ সমালোচক বলতে চান—ক্রোচের দর্শনে বস্তুবাদের এবং অধ্যাত্মবাদের, অজ্ঞেয়বাদ ও অনির্দেশ্যবাদের, কর্মবাদের ও ভাববাদের অভূতপূর্ব সমাবেশ ঘটেছে। সে যাইহোক, ক্রোচের দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে অধিক আলোচনা করার প্রয়োজন এবং অবকাশ এখানে নেই। আমাদের

পক্ষে এইটুকু জানাই যথেষ্ট যে ক্রোচে একদিকে পুরোদস্তুর অধ্যাত্মবাদকে, অন্যদিকে স্থূল বস্তুবাদকে পরিহার করেছেন। ক্রোচে ভাববাদী হলে, ভাববাদের পক্ষে বা বিপক্ষে যত কথা বলার আছে, ক্রোচের দর্শন সম্বন্ধেও তত কথা বলা যেতে পারে। বস্তু আগে কি চেতনা আগে, বস্তু থেকে চেতনার উদ্ভব ঘটেছে, কি চেতনাই বস্তুরূপে পরিণত হয়েছে, বস্তু এবং চেতনা দুটিই অনাদি নিত্য সত্তা কি না, ক্রোচে এর কোন্‌টিকে সত্য বলে স্বীকার করেন এবং তাতে তাকে অদ্বৈতবাদী অথবা দ্বৈতবাদী, কোন্‌টি বলা হবে, বস্তুর জ্ঞানকে চৈতন্যসাপেক্ষ বলা আর বস্তুজগতের অস্তিত্বকে মন-গড়া বলা এক কথা কি না, চেতনার অস্তিত্ব দেশ-কালনিরপেক্ষ কিনা, নিরপেক্ষ চেতনার অস্তিত্ব সম্ভব না হ'লে বস্তুজগতের স্বতন্ত্র সত্তা স্বীকার করতে হয় কি না—এ সব জটিল দার্শনিক প্রশ্নের আলোচনার মধ্যে প্রবেশ করে কোন ফলই হবে না। এখানে যেটুকু জানলে যথেষ্ট হবে সে এই—ক্রোচে "Spirit"-এর (আত্মা) স্বতন্ত্র সত্তা স্বীকার করেছেন এবং তার দুটিমাত্র বৃত্তি কল্পনা করেছেন। একটি জ্ঞানবৃত্তি, অন্যটি কর্মবৃত্তি। এই দুটি বৃত্তির প্রত্যেকটি আবার দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। জ্ঞানাত্মিকা ক্রিয়া (ক) প্রাতিভানিক ক্রিয়া (intuitive) এবং (খ) নৈয়ায়িক ক্রিয়া (logical) এই দুই শ্রেণীতে এবং কর্মাত্মিকা ক্রিয়া—(ক) স্বার্থনৈতিক (economic) এবং (খ) নৈতিক (moral) এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। আত্মিক ক্রিয়া বলতে মোট এই চার প্রকার ক্রিয়াই বুঝায়। সুতরাং সমস্ত ক্রিয়াই এই চার শ্রেণীর কোন না কোন শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হবেই। ক্রোচের মতে—শিল্প জ্ঞানাত্মিকা ক্রিয়ার প্রাথমিক পর্যায় প্রাতিভানিক ক্রিয়ার সৃষ্টি,—এক কথায় "প্রতিভান" (ইণ্টুইশান)। এই প্রতিভানিক জ্ঞান স্বাধীন ও নিরপেক্ষ। এর অস্তিত্ব নৈয়ায়িক জ্ঞানের এবং কর্মবৃত্তির কোন অপেক্ষা রাখে না। বলা বাহুল্য, এই প্রতিভানতত্ত্বের মধ্যেই ক্রোচের শিল্পতত্ত্বের প্রাণসার নিহিত রয়েছে। প্রতিভানের সংজ্ঞা ও স্বরূপ এবং অন্যান্য আত্মিক ক্রিয়ার সঙ্গে প্রতিভানের সম্পর্ক সম্যকভাবে জানাই ক্রোচের শিল্পতত্ত্বের মূলকথার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হওয়া। প্রতিভানের সংজ্ঞা ও স্বরূপ ঠিকভাবে জানতে পারা যাবে তখনই যখন শব্দটি দর্শনে ও

মনোবিজ্ঞানে যে অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে এবং ক্রোচে কোন্ বিশেষ অর্থে শব্দটি প্রয়োগ করেছেন তা' আমরা জানতে পারব। ক্রোচে যে বিশেষ অর্থে শব্দটি ব্যবহার করেছেন তা' বুঝবার পক্ষে 'এস্থেটিক'-গ্রন্থের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ের সিদ্ধান্তগুলি যেমন অপরিহার্য তেমনি যে মূল দৃষ্টি নিয়ে ক্রোচে 'শিল্পতত্ত্বের ইতিহাস' আলোচনা করেছেন—শিল্পতত্ত্বের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ধারা নির্দেশ করেছেন, তা' খুবই সহায়ক হবে। সুতরাং প্রথমেই আমি ক্রোচের শিল্পতত্ত্বের ইতিহাস-আলোচনার সারাংশ উপস্থাপিত করে দেখাতে চাই—ক্রোচে শিল্পের বিশেষত্ব হিসাবে কোন ধর্মটিকে নির্ধারণ করেছেন, কোন্ মানদণ্ড দিয়ে শিল্পবিষয়ক সিদ্ধান্তগুলির সত্যতার মাত্রা পরীক্ষা করছেন।

শিল্পতত্ত্বের ইতিহাসের প্রথম অধ্যায়—"প্রাচীন গ্রীস ও রোমে শিল্পতত্ত্ব বিষয়ক চিন্তা"। এই অধ্যায়ের প্রথমেই ক্রোচে পরিষ্কার ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন—শিল্পতত্ত্ব হচ্ছে প্রকাশাত্মিকা (উপস্থাপনাত্মিকা বা কল্পনাত্মিকা) ক্রিয়ার বিজ্ঞান। যে পর্যন্ত কল্পনা, উপস্থাপনা বা রূপায়ণের তত্ত্ব সুনির্দিষ্টভাবে নির্ধারিত হয়নি, অর্থাৎ আত্মার তেমন একটি বৃত্তি, যা জ্ঞানবৃত্তি বটে কিন্তু বুদ্ধিবৃত্তি নয়, যা' সামান্যের জ্ঞানের পরিবর্তে বিশেষের জ্ঞান সৃষ্টি করে এমন কোন বৃত্তি স্বীকৃত হয়নি, সে পর্যন্ত শিল্পতত্ত্ব বলে কোন শাস্ত্রের উৎপত্তি হয়নি। কল্পনাবৃত্তি বলে একটি স্বাধীন বৃত্তি আছে এবং শিল্প এই স্বাধীন কল্পনাবৃত্তিরই সৃষ্টি—এই মূল ধারণা নিয়েই ক্রোচে শিল্পতত্ত্বের ইতিহাসের ধারা পর্যালোচনা করেছেন এবং দেখিয়েছেন—শিল্পতত্ত্বের ধারণায় দুই শ্রেণীর বিচ্যুতি ঘটেছে। এক শ্রেণীতে রয়েছে সেই সব বিচ্যুতি যাকে বলা চলে—"deviation from defect—আর এক শ্রেণীতে আছে সেই বিচ্যুতি যাকে বলা চলে—"deviation by excess"। প্রথম শ্রেণীর বিচ্যুতিকে তিনি তিন ভাগে ভাগ করেছেন—(ক) বিশুদ্ধ সুখবাদী (purely hedonistic)—এই মতে শিল্পের কাজ ইন্দ্রিয়ের আনন্দ সৃষ্টি করা—ইন্দ্রিয়কে পরিতৃপ্ত করা। (খ) শুচিবায়ুগ্রস্ত-সুখবাদী (rigoristic hedonistic)—এঁদের মতে শিল্প যেহেতু ইন্দ্রিয়কে তৃপ্তি দেয়, সে মানুষের উচ্চ বৃত্তির পরিপন্থী, অতএব হেয় বস্তু। (গ) সুখবাদী-

নীতিকামী (hedonistic moralistic)—এঁরা মনে করেন—শিল্প ইন্দ্রিয়কে তৃপ্তি দেয় বটে, কিন্তু শিল্পের সঙ্গে নীতির বিরোধ নেই। শিল্প একাধারে আনন্দদায়ক ও নীতিশিক্ষক হতে পারে। দ্বিতীয় শ্রেণীর বিচ্যুতি ঘটে যখন শিল্পসৃষ্টির ব্যাপারটিকে অতীন্দ্রিয় ও রহস্যময় ভাবাবেগের ব্যাপার করে তোলা হয়। এই বিচ্যুতিকে ক্রোচে নাম দিয়েছেন—'মিস্টিকাল'। ক্রোচে দেখিয়েছেন—প্রাচীন গ্রীস ও রোমে উল্লিখিত বিচ্যুতিগুলির সব কয়টিই পাওয়া যায়। তবে এ একথাও স্বীকার করেছেন—'It also exhibits attempts at the theory of expression or pure imagination। অবশ্য কল্পনাতত্ত্বে পৌঁছানোর চেষ্টা মাত্র, অধিক কিছু নয়। এই চেষ্টা করেছিলেন—প্লেটো-শিষ্য এরিস্টটল। এরিস্টটল মনে করেছেন—'মাইমেসিস'—হচ্ছে জ্ঞানাত্মিকা ক্রিয়া (থিওরেটিকাল এ্যাকটিভিটি) এবং তিনিই প্রথম বিজ্ঞান ও ইতিহাস থেকে শিল্পকে পৃথক করবার সার্থক চেষ্টা করেছেন এবং যে-ভাবে শিল্পের স্বরূপ নির্ধারণ করবার চেষ্টা করেছেন—ক্রোচের মতে—'this is the true and only way of stating it.'। কিন্তু ক্রোচের আক্ষেপ—বিশুদ্ধ কল্পনার আবিষ্কারের চেষ্টায় এত সুন্দর আরম্ভ করেও এরিস্টটল মাঝপথে থেমে গেছেন। এরিস্টটল বলেছেন—ইতিহাস অনুকরণ করে—'বিশেষ'কে (particular), দর্শন-বিজ্ঞান প্রকাশ করে—'সামান্য'কে (universal) এবং শিল্প অনুকরণ করে বিশেষকে আশ্রয় করে সামান্যকে (universal through the particular)। ইতিহাস বর্ণনা করে—যা ঘটেছে তাকে, শিল্প রূপ দেয় যা' ঘটতে পারে তাকে অর্থাৎ সম্ভাব্যকে। ক্রোচের ধারণা—এই সব শব্দের ব্যাখ্যা করবার সময়েই এরিস্টটল খেই হারিয়ে ফেলেছেন—কল্পনারও অনুকরণের সীমাচিহ্ন নির্দেশ করতে পারেননি। ক্রোচে বলেন—প্রাচীন মনস্তত্ত্বশাস্ত্র কল্পনা (fancy) বা কল্পনাবৃত্তি (imagination) সম্বন্ধে অবহিত না ছিল এমন নয়, কিন্তু কল্পনাকে বুদ্ধিবৃত্তি ও ইন্দ্রিয়ের মধ্যবর্তী একটি ব্যাপার বলে—ইন্দ্রিয়গৃহীত প্রত্যয়ের যথাযথ পুনরুপস্থাপনের ব্যাপার বা ধারণাকে ইন্দ্রিয়ের কাছে ব্যক্ত করবার

ব্যাপার বলেই মনে করেছে। শিল্পসৃষ্টির সঙ্গে কল্পনাবৃত্তির সম্পর্ক সম্বন্ধে স্পষ্ট চেতনা বা চিন্তা ছিলনা।

মধ্যযুগে এবং রেনেসাঁস যুগে—এরিস্টটলের বৈজ্ঞানিক প্রবৃত্তিটি ছাড়া গ্রীসে বা রোমে প্রচলিত আর সব প্রবৃত্তিগুলিই লক্ষ্য করা যায়। প্লাটিনাসের মধ্যে—নব্য প্লেটোবাদী আধ্যাত্মিক রহস্যমণ্ডিত যে চিন্তা দেখা গেছে, সেই চিন্তার ধারা এ যুগেও প্রবাহিত। নব্য প্লেটোবাদীদের কাছে "আইডিয়া"র যে স্থান ছিল সেই স্থান অধিকার করে—খ্রীষ্টধর্ম কল্পিত 'ঈশ্বর'। ঈশ্বরই সমস্ত সৌন্দর্যের মূলাধার—পরমতম সুন্দর। কিন্তু এই চিন্তার পাশে সৌন্দর্যের অন্য ধারণাও মাথা তুলে দাঁড়ায়। রূপ-সুষমার বা ঐক্যের মধ্যে, সম্পূর্ণতা, সামঞ্জস্য এবং পরিচ্ছন্নতার মধ্যে সৌন্দর্যের তত্ত্ব নিহিত—এমন সিদ্ধান্তও দেখা দেয়।

শিল্পকে ভাবের রূপক রূপে গণ্য ও বিচার করার প্রবৃত্তিও এ যুগে কম প্রবল হয় না। রেনেসাঁস-যুগে এরিস্টটলের পোয়েটিকসের অনেক টীকা ভাষ্য রচিত হয় বটে, কিন্তু বিশুদ্ধ কল্পনার ধারণা কারো মনেই স্পষ্টাকারে দেখা দেয় না।

সপ্তদশ শতাব্দীতে জিজ্ঞাসার ও আলোচনার মাত্রা বৃদ্ধি পায়। শৈল্পিক প্রতিভার স্বরূপ নির্ধারণ করতে যেয়ে পণ্ডিতরা, 'উইট','টেস্ট', 'ইমাজিনেশান' প্রভৃতি শব্দের প্রচুর ব্যবহার ও ব্যাখ্যা করেন। ব্যাখ্যার ভিতর দিয়ে এই কথাটাই বড় হয়ে দেখা দেয় যে, উইট, টেষ্ট, ফ্যান্সি বা ইমাজিনেশান প্রভৃতিই প্রতিভার ভিত্তি এবং বুদ্ধিনিরপেক্ষ ব্যাপার এবং বুদ্ধিনিয়ন্ত্রিত ব্যাপার নয় বলেই আবেগাত্মক ব্যাপার। এই যুগের লেখায়—ক্রোচে বলেছেন—ইমাজিনেশান ও উইটকে, উইট এবং টেস্টকে এবং টেস্ট এবং ফিলিঙ-কে এক বলে মনে করা হয়েছে। বুদ্ধিবাদী দার্শনিক ডেকার্তে ও তাঁর শিষ্যগণ কল্পনাকে জৈবিক সত্তার উদ্দীপনা বলে ঘৃণা করেছেন। তবে যে কল্পনা বুদ্ধিনিয়ন্ত্রিত অর্থাৎ তত্ত্বকে ব্যক্ত করারই উপায়-বিশেষ তাকে কোনমতে সহ্য করেছেন। ফ্রান্সের ডেকার্তের মতোই ইংল্যাণ্ডের লক ছিলেন

বুদ্ধিবাদী। ইন্দ্রিয়-সংগৃহীত প্রতীতিগুলি নিয়ে বিকল্পনা করা ছাড়া অন্য কোনরূপ আত্মিক ব্যাপার তিনি স্বীকার করেননি।

লাইব্‌নীজ সিদ্ধান্ত করলেন শিল্প হচ্ছে—দেকার্তে যাকে confused cognition বলেছেন, তাই অর্থাৎ এক প্রকার জ্ঞান বটে কিন্তু অপরিচ্ছন্ন জ্ঞান। তবে এই জ্ঞান অপরিচ্ছন্ন (indistinct) হলেও, স্পষ্ট (clear)। লাইবনীজের সমালোচনা করতে যেয়ে ক্রোচে বলেছেন—একথা মনে হতে পারে শৈল্পিক ব্যাপারকে 'অস্পষ্ট জ্ঞান' বলায়, লাইবনীজ শৈল্পিক ব্যাপারটিকে একদিকে আবেগ থেকে, অন্যদিকে বুদ্ধি থেকে স্বতন্ত্র করেছেন। কিন্তু আসলে অস্পষ্ট ও স্পষ্ট জ্ঞান একই বুদ্ধিবৃত্তির কাজ, সুতরাং তাদের মধ্যে যে পার্থক্য তা মাত্রাগত পার্থক্যমাত্র, গুণগত পার্থক্য নয়। তারপর কল্পনাকে 'অস্পষ্ট জ্ঞান' বলায় তাকে হেয় বলেই মনে করা হয়েছে। সুতরাং বলা যেতে পারে লাইবনীজও শিল্পের স্বরূপটি ধরতে পারেননি, কারণ—ডেকার্তের বুদ্ধিবাদের গণ্ডী অতিক্রম করতে পারেননি।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে,—ইংলণ্ডে, আবেগবাদের উপর ভিত্তি করে অতীন্দ্রিয় অনুভূতি-নির্ভর শিল্পতত্ত্বের প্রসার ঘটে। শ্যাপটস্‌বারি, ফ্রান্সিস্ হাচিসন প্রমুখ শিল্পতত্ত্ব-বিচারকরা সৌন্দর্যের জন্য সহজ ও স্বতন্ত্র প্রবৃত্তির অস্তিত্ব স্বীকার করেন—স্বীকার করেন এই সৌন্দর্যবোধ আসলে শিব ও সত্য বোধের সঙ্গে সুসমঞ্জস—সামঞ্জস্যবোধ—সঙ্গতিবোধ।

এই শতাব্দীতেই জার্মানীতে এবং ইতালীতে শিল্পতত্ত্ব আলোচনায় নতুন এবং উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা দেখা যায়। জার্মানীতে J. C. Wolff এবং Alexander Baumgarten এবং ইতালীতে Giambattista Vico অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের শিল্পতত্ত্ব সমালোচকদের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য। আমরা জানি 'এস্থেটিক' শব্দটি ভলফের শিষ্য আলেকজাণ্ডার গট্‌লিয়েব বোমগার্টেনই প্রথম (১৭৫০) শিল্পতত্ত্ব গ্রন্থের নাম হিসাবে প্রয়োগ করেন। বোমগার্টেনের কাছে শিল্পশাস্ত্র হচ্ছে 'science of sensory consciousness', শিল্পের বিষয়—ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু (sensible facts) এবং কল্পনার দ্বারা এই বস্তু নির্মিত হয়। কিন্তু ভল্‌ফ্ ও বোমগার্টেন—

productive imagination—সম্বন্ধে অবহিত থাকা সত্ত্বেও, বুদ্ধি ও কল্পনার পার্থক্য সুনির্দিষ্টভাবে নির্ধারণ করতে পারেননি। ক্রোচে মনে করেন—'এস্থেটিক' শব্দটি প্রথম ব্যবহার করলেও, বোমগার্টেন শিল্প-বিজ্ঞানের আবিষ্কর্তা নন, প্রকৃত আবিষ্কর্তা হচ্ছেন—ইতালীয় জ্যামবাত্তিস্তা ভিকো। ভিকোর গ্রন্থ শুধু যে বোমগার্টেনের গ্রন্থের দশ বৎসর আগেই প্রকাশিত হয় তা' নয়, তাতেই প্রথম শিল্পের এবং কাব্যের প্রকৃত স্বরূপ নির্ধারণের প্রচেষ্টা দেখা যায়। প্লেটো যে মূল প্রশ্নটি উত্থাপন করেছেন, এরিস্টটল যার সমাধান করতে পারেননি, রেনেসাঁস ও পরবর্তী যুগে যা'নিয়ে তুমুল বাদবিতণ্ডা চলেছে, সেই—Is poetry rational or irrational, spisitual or brutal? and if sptritual what is its special nature and what distinguishes it from history and science?—এই মূল প্রশ্নটি ভিকো নতুন করে আলোচনা করেছেন এবং 'সৃজনশীল কল্পনা'র স্বরূপ' (creative imagination) আবিষ্কার করার জন্য প্রশংসনীয় প্রচেষ্টা করেছেন। কিন্তু এতো নতুন আলোক সম্পাত করা সত্ত্বেও, ভিকো বিশুদ্ধ কল্পনাতত্ত্বের ভূমিতে স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে পারেননি বা শিল্পতত্ত্বের সমগ্র ক্ষেত্রটি আলোকিত করতে পারেননি। কল্পনার স্বাতন্ত্র্য বা নিরপেক্ষ সত্তা আবিষ্কার করার পরেও ভিকো বলেছেন, কাব্যের উদ্দেশ্য হচ্ছে—অশিক্ষিতদের সুনীতি শিক্ষা দেওয়া, আবেগ জাগানোর জন্য গল্প তৈরি করা; বলেছেন—'imaginative universals' (কল্পনাজ 'সামান্য') অসম্পূর্ণ সামান্য inperfict universals. তা ছাড়া ভিকো মূল পরিভাষাগুলি একই অর্থে সব সময় ব্যবহার করেননি। সংবেদন, স্মৃতি, কল্পনা, বাক্‌কেলি প্রভৃতি শব্দ এক কি পৃথক তা' স্পষ্ট বুঝা যায় না। অতএব এই সিদ্ধান্তই অনিবার্য যে ভিকোও শিল্পতত্ত্বকে দার্শনিক ভিত্তির উপরে দাঁড় করাতে পারেননি।

এই অষ্টাদশ শতাব্দীতে আরো অনেকেই—শিল্পতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। ইতালীতে ভিকোর অনুগামীদের এবং জার্মানীতে বোমগার্টেনের অনুগামীদের সংখ্যা একেবারে নগণ্য নয়। কিন্তু কেউই নতুন চিন্তা করেননি। ক্রোচের মতে—ভিকোর পরে ইমানুয়েল কান্টই সর্বাগ্রগণ্য

প্রতিভাধর দার্শনিক। অবশ্য—ক্রোচে বলেন—জার্মানীর লোকেরা কাণ্টকে যত গৌরবের আসনে বসিয়েছেন, ততখানি গৌরব কাণ্টের প্রাপ্য নয়। কারণ কাণ্ট—'was unable to attain a doctrine substantially true and unable to give his thoughts the necessary system and unity'। ক্রোচের সিদ্ধান্ত—কাণ্টের শিল্প-বিষয়ক ধারণা এবং বোমগার্টেনের ও ভলফের ধারণা মূলত এক। কাণ্ট কল্পনার প্রকৃত স্বরূপ অর্থাৎ নিরপেক্ষ ও স্বতন্ত্র সত্তা উপলব্ধি করতে পারেননি এবং তা' পারেননি এই কারণেই যে তিনি বুদ্ধিবাদের প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পারেননি। কাণ্ট আত্মার তিনটি বৃত্তি স্বীকার করেছেন এবং শিল্প সৃষ্টি ও আস্বাদন ব্যাপারটিকে অনুভব-বৃত্তির কাজ বলে মনে করেছেন। আত্মিক ব্যাপার হিসাবে কল্পনাকে তিনি স্বতন্ত্র মর্যাদা দেননি, অনুভব-বৃত্তিরই পরিধির মধ্যে স্থান করে দিয়েছেন। তিনি—'knows a reproductive imagination and an associative, but he knows nothing of a genuinely productive imagination, imagination in the proper sense'। তাঁর দর্শনে প্রতিভা হচ্ছে বহু বৃত্তির সমবায়ের ফল (co-operation of several faculties)। অবশ্য ক্রোচে স্বীকার করেছেন—'ক্রিটিক অফ পিয়োর রিজন্' গ্রন্থে কাণ্ট অতি সুন্দর ভাবে 'বিশুদ্ধ প্রতিভান' (intuition)-এর অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন—দেখিয়েছেন সংবেদনের (sensation) স্তর অতিক্রম করে প্রত্যয় রাজি তখনই চৈতন্যের স্তরে প্রবেশ করে, যখন আত্মা তাদের রূপ বা আকার দান করে। তবে এই রূপ আর বুদ্ধির গড়া রূপ এক নয়। প্রথম ব্যাপার ও পরবর্তী ব্যাপার দু'টি ভিন্ন বৃত্তির কাজ। এই দুই বৃত্তি থেকে দু'টি পৃথক শাস্ত্র সম্ভব। প্রথমটি থেকে—"ট্র্যানসেন্ডেন্টাল এইস্থেটিক", দ্বিতীয়টি থেকে—ট্র্যানসেন্ডেন্টাল লজিক"। ক্রোচের বড় আক্ষেপ এই যে এতদূর এগিয়েও কাণ্ট কল্পনার স্বাধীন রাজ্যের পূর্ণ গৌরব উপলব্ধি করতে পারেন নি।

কাণ্টের পরে—শিলার, রাইকতের, ফিকটে, শেলিঙ, শোলগের, হেগেল প্রমুখ চিন্তাশীলদের চিন্তা উল্লেখযোগ্য বটে, কিন্তু ক্রোচের মতে এঁদের কেউই

সৃজনশীল কল্পনার প্রকৃত রূপটি বুঝতে পারেননি। এই সব ভাববাদী শিল্পদার্শনিকরা মূলতঃ অতীন্দ্রিয়রহস্যবাদী এবং 'মিষ্টিকাল এস্থেটিক'কেই তাঁরা ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় ও পরিভাষায় প্রকাশ করেছেন। দার্শনিক হেগেলের কাছে শিল্প বা সুন্দর আইডিয়ারই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অভিব্যক্তি, শিল্পের বিষয়বস্তু বা আধেয় হচ্ছে আইডিয়া (ভাব) আর আধার বা রূপ হচ্ছে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কল্পনা-শরীর। এই সিদ্ধান্ত অনেক পরিমাণে বুদ্ধিবাদীদের সিদ্ধান্তরই অনুরূপ এবং বিশুদ্ধ কল্পনাবাদ থেকে বেশ খানিকটা দূরবর্তী।

এই সব ভাববাদীদের মত সমালোচনা করতে যেয়ে ক্রোচে সিদ্ধান্ত করেছেন—"Romanticism and metaphysical idealism had elevated art to such a fantastic height among the clouds that at last they were obliged to admit that it was so far away as to be absolutely useless"—রোমান্টিসিজম এবং পরাতত্ত্বনিষ্ঠ ভাববাদ শিল্পকে এমন এক কাল্পনিক উর্ধ্বাকাশে মেঘের রাজ্যে তুলে দিয়েছে যে শেষ পর্যন্ত তাকে সম্পূর্ণ নিরর্থক বলে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে।

তারপর ক্রোচে শোপেনহাউয়ার, জে. এফ. হারবার্ট, ফ্রিড্রিশ শ্লেইয়ের-মাসের এবং অন্যান্য অপ্রধান শিল্পতত্ত্ব-সমালোচকদের সিদ্ধান্ত আলোচনা করেছেন, কিন্তু তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কোন নতুন সত্য তিনি খুঁজে পাননি। কারণ ঐসব সমালোচকরা শিল্পের প্রকৃত রহস্য ভেদ করতে পারেননি—সৃজনশীল কল্পনার নিরপেক্ষ সত্তাকে সম্যকভাবে উপলব্ধি করতে পারেননি। ভাববাদীদের সমালোচনায় ক্রোচে যত নির্মম হয়েছেন বস্তুবাদীদের—(পজিটিভিস্ট এবং 'নেচারালিস্ট এবং সোসালিষ্টদের) সমালোচনায় তার চেয়ে আরো অনেক বেশী নির্মম হয়েছেন। হারবার্ট স্পেন্সার, সালি, বেন, গ্র্যান্ট এলেন, হেলমহোৎজ, হিপ্পোলিটে তেইন, জি. টি. ফেকনার, আর্নস্ট, গ্রোস, প্রুধোঁ, গুয়ো,নর্দু, লোমব্রোসো, প্রমুখদের শিল্পতত্ত্ব-আলোচনার তীব্র সমালোচনা করেছেন। প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন—কল্পনার স্বরূপ এঁরা বুঝতে পারেননি—প্রাতিভানিক ক্রিয়ার রহস্য না বুঝতে পারায় শিল্পতত্ত্বের সত্য থেকে অনেক দূরে প'ড়ে আছেন। ক্রোচের

মতে এঁদের সিদ্ধান্তগুলি—'worthless from the point of view of Aesthetic'—কেন অপদার্থ আগেই বলা হয়েছে এবং বহুবার বলা হয়েছে। প্রতিভানতত্ত্ব বা বিশুদ্ধ কল্পনাতত্ত্ব যিনি না জানেন, তিনি শিল্পতত্ত্বের আসল কথাই জানেন না। আমরা দেখলাম—'শিল্পতত্ত্বের ইতিহাস' লিখতে যেয়ে ক্রোচে প্রধানতঃ বিশুদ্ধ কল্পনাবাদের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ইতিহাসই বিবৃত করেছেন এবং বিশুদ্ধ কল্পনাবাদের মানদণ্ড দিয়েই অন্যান্য মতবাদ-গুলির যাথার্থ্য পরিমাপ করবার চেষ্টা করেছেন। প্লেটোর সিদ্ধান্ত থেকে আরম্ভ করে তাঁর সমসাময়িক দার্শনিকদের সিদ্ধান্ত পর্যন্ত যত সিদ্ধান্ত আছে সবক'টি সিদ্ধান্ত সমালোচনা ক'রে ক্রোচে যেন এই কথাটাই বলতে চেয়েছেন —তাঁর আলোচনার আগে যতো আলোচনা হয়েছে—তাতে শিল্পকে প্রতিভানতত্ত্ব বা সৃজনশীল কল্পনাতত্ত্বের ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত করা হয়নি এবং হয়নি বলেই তাবা অসম্পূর্ণ।

এবার আমরা ক্রোচে-প্রদত্ত প্রতিভানের সংজ্ঞার দিকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারি।

ক্রোচের শিল্পতত্ত্ব, এককথায় প্রতিভানতত্ত্ব। সুতরাং তাঁর শিল্পতত্ত্ব বুঝতে হলে প্রতিভানের সংজ্ঞা ও স্বরূপ এবং আত্মার অন্যান্য ক্রিয়ার সঙ্গে প্রতিভানের সম্পর্ক কি 'তা' ভালোভাবে বুঝতে হবে।

প্রতিভান (ইন্‌টুইশান) শব্দটির সংজ্ঞা ও স্বরূপ ক্রোচে যে ভাবে নির্দেশ করেছেন সেই সম্বন্ধে আলোচনা করার আগে প্রতিভান শব্দটি দর্শনেও মনোবিজ্ঞানে যে অর্থে ব্যবহৃত হ'য়েছে তার একটু পরিচয় দিয়ে নেওয়া দরকার।

প্রতিভান বিশেষ একপ্রকার জ্ঞান-প্রক্রিয়া, এবিষয়ে সকলেই একমত। এই প্রক্রিয়ার বিশিষ্টতা এই যে এতে বুদ্ধি বা বিকল্পনার কোন ক্রিয়া থাকে না। প্রতিভান নির্বিকল্পক জ্ঞান। প্রাচীন দর্শনে নির্বিকল্পক জ্ঞানের স্থান খুবই উচ্চে। বহু সাধনার ফলে যোগীরা এই জ্ঞানের অধিকারী হ'য়ে থাকেন —চেতনা বুদ্ধির স্তর থেকে আরো উন্নত স্তরে না উঠা পর্যন্ত এই অতীন্দ্রিয় বোধশক্তি জাগে না—যোগদৃষ্টি বা মর্মদৃষ্টি খোলে না। এই শক্তির অধিকারী

হলে তবেই আত্মা পরম সত্যকে উপলব্ধি করতে পারে, পরম সত্যে নির্বিকল্পক সমাধির অধিকার অর্জন করে। তখন চৈতন্য-স্বরূপ আত্মা তার বহিরাবরণ ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধির আশ্রয় ব্যতিরেকেই বিশুদ্ধ প্রজ্ঞাশক্তিবলে সত্যস্বরূপকে উপলব্ধি করে।

অধ্যাত্মবাদী দার্শনিকদের কাছে প্রতিভান হচ্ছে দিব্যদৃষ্টি—ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধিনিরপেক্ষ পরমার্থজ্ঞান—চৈতন্যস্বরূপ আত্মার স্বরূপে প্রতিষ্ঠা লাভের—সত্যকে স্বরূপে জানার একমাত্র উপায়—অন্তরাত্মার সহজ অনুভূতি।

বলা বাহুল্য অধ্যাত্মবাদী দর্শনের প্রাধান্যের যুগে প্রতিভান বা অতীন্দ্রিয় দর্শনের শক্তির মর্যাদা সবচেয়ে বেশী হবেই: হ'য়েছিলও তাই। কিন্তু কালক্রমে বিজ্ঞানের অগ্রগতি এবং বস্তুবাদী দর্শনের উপস্থিতির ফলে, প্রতিভানের মর্যাদাই শুধু কমে যায়নি, অস্তিত্বও বিপন্ন হ'য়ে পড়েছে। অবশ্য অধ্যাত্মবাদ ও বস্তুবাদের দ্বন্দ্বের মহাভারতে স্বর্গারোহণপর্ব এখনও লেখা হয়নি। তাই যাঁরা অধ্যাত্মবাদের শিবিরে আছেন তাঁরা "ইন্টুইশান"কে—অতীন্দ্রিয় প্রত্যক্ষকে আজও বৌদ্ধিক জ্ঞানের উপরে স্থান দিয়ে থাকেন; বৈজ্ঞানিকদের বুদ্ধির অহংকারের দর্প চূর্ণ করবার জন্য 'প্রতিভান'কেই প্রধান অস্ত্ররূপে প্রয়োগ করে থাকেন—বলেন, বিজ্ঞান জানে সত্যের অংশকে সমগ্রকে জানতে হ'লে চাই অতীন্দ্রিয় অনুভূতি—চাই প্রতিভান—মর্ম দৃষ্টি। সিংহকে সিংহের গুহায় বধ করবার জন্য কেউ কেউ বিজ্ঞানের অস্ত্র দিয়েই বিজ্ঞানকে মারবার চেষ্টা করেছেন। জীববিজ্ঞানের সাহায্য নিয়ে অর্থাৎ সহজাত সংস্কার (instincts) এর উপর ভিত্তি করে নতুন করে 'intuition'-এর মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করেছেন। হেনরি বের্গস মহাশয়ের "creative evolution" গ্রন্থখানি (১৯:১) এই চেষ্টার একটি বড দৃষ্টান্ত। বের্গস এই গ্রন্থে প্রতিভানের মহাত্ম্য স্থাপনা করতে যেয়ে বলেছেন—প্রতিভানিক জ্ঞানের দ্বারাই আমরা জীবনের গতিশীল বিশ্বের যথার্থ স্বরূপ জানতে পারি। বুদ্ধির দ্বারা আমরা জীবনের বা বিশ্বের যে জ্ঞান লাভ করি তা খণ্ডিত এবং অসম্পূর্ণ। বুদ্ধি জগতকে সেইভাবেই গ্রহণ করে যেভাবে একটা পোকা বস্তুকে কেটে কেটে খণ্ড খণ্ড

আকারে গ্রহণ করে। বুদ্ধির জগৎ সংজ্ঞার জগৎ, প্রতিভানের জগৎ প্রকৃত জগৎ। বুদ্ধি বিশ্ব ও মানুষের মধ্যে সহজ যোগের সম্পর্ক নষ্ট করে দিয়েছে, প্রতিভান মানুষকে জীবনের সঙ্গে বিশ্বের সঙ্গে সহজযোগে যুক্ত ক'রে দেয়। প্রতিভান – Sympathy যা' বাস্তব বা বিশ্বের সঙ্গে একাত্মতা স্থাপন করে যা'—উইল ডুরান্টের ভাষায় – 'beholds more truly the heart of life ?"

ইন্‌টুইশানের সংজ্ঞা দিতে বের্গসঁ লিখেছেন—Instinct that has become disinterested, self-conscious, capable of reflecting upon its objects and enlarging it indefinitly". জীবের মধ্যে আমরা যে instinct (innate knowbdge of a thing) দেখি, তা' বিষয়াভিমুখী, তা' আত্মসচেতন এবং বিষয়ানুচিন্তনে এবং বিষয়ের বিস্তার সাধনে সক্ষম নয়। Instinct-এর সঙ্গে intuition-এর ঐক্য এইটুকুই যে উভয়েই নির্বিকল্পক জ্ঞান এবং পার্থক্য এই যে instinct যেখানে বিষয়াসক্ত, বিষয়ের অনুধ্যানে ও বিস্তারসাধনে অক্ষম, intuition সেখানে নিরাসক্ত, অনুধ্যানে ও বিস্তারসাধনে সক্ষম।

প্রতিভানের স্বরূপ বুঝাতে গিয়ে তিনি শৈল্পিক প্রতিভানের (aesthetic intuition) অবতারণা করেছেন। শৈল্পিক প্রতিভান কথাটি শুনতে ক্রোচের শৈল্পিক প্রতিভানের মতোই বটে, কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলে দেখা যাবে দু'টির মধ্যে পার্থক্য আছে। শৈল্পিক প্রতিভানের ব্যাখ্যা করতে যেয়ে বের্গসঁ লিখেছেন—"Our eyes percieves the features of the living being merely as assembled not as mutually organised. The intention of life, the simple movement that run through the lives, that binds them together and gives them significance, escape it. This intention is just what the artist tries to regain in placing himself back within the object by a kind of sympathy in breaking down by an effort of intuition the barrier that space puts up between him and his model."

এখানে ইণ্টুইশান সম্বন্ধে যে কথা বলা হয়েছে তা'তে ইণ্টুইশানকে আমাদের সংস্কৃত সাহিত্যশাস্ত্রের পরিভাষায় বলতে পারি—তন্ময়ীভবন ক্ষমতা। বস্তুর সঙ্গে এক হয়ে যেয়ে বস্তুর স্বরূপটিকে দেখার ক্ষমতা। একটু এগিয়েই আমরা দেখব—ক্রোচের ইণ্টুইশান—সিমপ্যাথি বা তন্ময়ীভবন ক্ষমতা নয়।

দর্শনে ইণ্টুইশান শব্দটি যে বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, মনোবিজ্ঞানে সে অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। 'এনালিটিকাল সাইকোলজি'র প্রবর্তক ডাঃ সি. জি. য়ুঙ্, তদ্‌রচিত "কনট্রিবিউশান টু এনালিটিকাল সাইকোলজি"-গ্রন্থের 'সাইকোলজিকাল টাইপস' নামক প্রবন্ধে ইণ্টুইশান সম্বন্ধে যা' লিখেছেন, তাকেই আমরা মনোবিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত হিসাবে গণ্য করতে পারি। তিনি লিখেছেন—"· and intuition I hold to be perception by way of the unconscious or the perception of the unconscious content" অর্থাৎ প্রতিভান হচ্ছে নির্জ্ঞান বা অবোধপূর্বক প্রতীতি অথবা নির্জ্ঞান বিষয়ের প্রতীতি। নির্জ্ঞান প্রতীতিকে ব্যাখ্যা করে বলতে বলা যায় মনের নির্জ্ঞান অংশের দ্বারা বিষয়ের অবধারণ অর্থাৎ যে প্রতীতিতে সংজ্ঞান মনের কোন ক্রিয়া থাকে না। আর নির্জ্ঞান বিষয়ের প্রতীতি বলতে বুঝায়—যে বিষয় সংজ্ঞান মনে নেই, সেই বিষয়ের উপলব্ধি। নির্জ্ঞান মনের জ্ঞান হিসাবে "ইণ্টুইশান" এক প্রকার জ্ঞান-প্রক্রিয়া এবং নির্জ্ঞান বিষয়ের জ্ঞান হিসাবে "ইণ্টুইশান" বিশেষ অর্থাৎ অবচেতন স্তরের জ্ঞান। য়ুঙ্গের কাছে ইণ্টুইশান নির্জ্ঞান মনের জ্ঞান—নির্জ্ঞান বিষয়বস্তুর জ্ঞান বটে, কিন্তু বের্গসঁর ইণ্টুশানের মতো য়ুঙ্গের ইণ্টুইশানও—"should permit us to divine the more or less hidden possibilities and backgrounds of a situation, since these hidden factors also belong to a complete picture of a given moment" সে যাই হোক, মনোবিজ্ঞানীরা একদিকে যেমন নির্জ্ঞান জ্ঞান-অনুভব ইচ্ছার অস্তিত্ব স্বীকার করেন, তেমনি স্বীকার করেন নির্জ্ঞান বিষয়বস্তুর অস্তিত্ব। আমরা দেখব ক্রোচে এই ধরণের নির্জ্ঞান জ্ঞান এবং নির্জ্ঞান বিষয়বস্তু স্বীকার করেন না। ভাববাদী ক্রোচের কাছে জ্ঞান মাত্রই সংজ্ঞান এবং সংজ্ঞান মনের অর্থাৎ

কনসাস্‌নেস-এর বাইরে যা' তা' অসৎ—রূপহীন প্রকৃতি (ফর্মলেস্ ম্যাটার)। ক্রোচের ইন্‌টুইশান সর্বদাই সংজ্ঞান ব্যাপার। সুতরাং শিল্পসৃষ্টি ব্যাপারটি,—মনস্তাত্ত্বিকদের কাছে, যে পরিমাণে অবচেতন মনের ক্রিয়া বলে গণ্য হয়েছে, ক্রোচের কাছে তা' হয়নি। 'মডার্ণ ম্যান ইন্ সার্চ অফ এ সোল'-নামক গ্রন্থের 'সাইকোলজি এ্যাণ্ড লিটারেচার'-অধ্যায়ে শিল্প-সৃষ্টির রহস্য নির্দেশ করার প্রসঙ্গে লিখেছেন—"whenever the creative force predominates human life, is ruled and moulded by the unconscious as against the conscious will and the conscious will is swept along on a subterranean current, being nothing more than a helpless observer of events." অর্থাৎ সৃষ্টির আবেগ যখন প্রধান হয়ে উঠে তখন মানুষের জীবন, সংজ্ঞান ইচ্ছার পরিবর্তে নির্জ্ঞান মনের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। সংজ্ঞান ইচ্ছাটি তখন তলিয়ে বা আচ্ছন্ন হয়ে যায় এবং নিষ্ক্রিয় দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করে। মনোবিজ্ঞানীদের কাছে—"আনকনসাস মেণ্টেশান" নির্জ্ঞান মানসিক ক্রিয়া অতি স্বভাবিক এবং সাধারণ ঘটনা। এবং সংজ্ঞানের চেয়ে নির্জ্ঞানকেই তারা কম অনধিকার প্রবেশকারী বলে মনে করেন। "ইল্লিউশান এ্যাণ্ড রিয়েলিটি" গ্রন্থের লেখক ক্রীষ্টোফার কডওয়েলের ভাষায় বলা যেতে পারে—তাঁদের কাছে "the thing to be explained and accounted for as an intruder is not unconsciousness, but consciousness"। ক্রোচের কাছে, আগেই বলেছি, নির্জ্ঞান জ্ঞান বলে কোন পদার্থ নেই। সংজ্ঞান ইচ্ছার গণ্ডীর মধ্যেই সব রকম জ্ঞানের উৎপত্তি ও স্থিতি এবং ইন্‌টুইশান নির্জ্ঞান জ্ঞান নয়।

এবার, ক্রোচে 'ইন্‌টুইশান' বলতে কি বুঝেছেন বা বুঝাতে চেয়েছেন তা' দেখা যাক। ক্রোচের মতে :—

(১) প্রতিভান বুদ্ধি নিরপেক্ষ এক প্রকার জ্ঞান অর্থাৎ নির্বিকল্পক জ্ঞান

(২) " বিশেষের জ্ঞান

(৩) " সৃষ্টি করে প্রতিরূপ (ইমেজ)

(৪) প্রতিভান কল্পনাজ জ্ঞান (knowledge obtained through imagination)

(৫) „ স্থান-কালনিরপেক্ষ জ্ঞান

(৬) „ সংবেদন (সেনসেশান) নয়

(৭) প্রতিভান স্মৃতি বা সংবেদনসমষ্টি নয়

(৮) „ সৃজনশীল।

(৯) „ উপস্থাপন (রিপ্রেজেণ্টেশান)

(১০) „ রূপায়ণ (এক্‌স্‌প্রেশান)

প্রতিভানের স্বরূপ বুঝতে হলে প্রথমেই,—ক্রোচে আত্মার জ্ঞানাত্মিকা ক্রিয়ার এবং কর্মাত্মিকা ক্রিয়ার যে বিভাগ কল্পনা করেছেন সেই বিভাগকে চোখের সামনে রাখতে হবে। বিভাগটিকে এইভাবে সাজিয়ে দেওয়া যাক।

আত্মা (স্পিরিট)
- জ্ঞানবৃত্তি
  - প্রাতিভানিক জ্ঞান (ইন্টুইটিভ)
  - নৈয়ায়িক জ্ঞান (লজিকাল)
- কর্মবৃত্তি
  - আর্থনৈতিক ক্রিয়া (ইকনমিক)
  - নৈতিক ক্রিয়া (মরাল)

ক্রোচে জ্ঞানাত্মিকা ক্রিয়াকে দুই ভাবে ভাগ করেছেন এবং দেখিয়েছেন—জ্ঞানের মধ্যে দু'টি স্তর রয়েছে। প্রথম স্তরে—বস্তুবিশেষের জ্ঞান—প্রতিরূপের বা বিষয়াকারা প্রতীতির জ্ঞান, দ্বিতীয় স্তরে—বস্তুসম্বন্ধের জ্ঞান বা সামান্যের জ্ঞান—সংজ্ঞাশ্রয়ী জ্ঞান।

প্রথম স্তরের জ্ঞান একদিকে যেমন বিশেষের জ্ঞান অন্যদিকে তেমনি নির্বিকল্পক অর্থাৎ যুক্তি পরামর্শ-নিরপেক্ষ জ্ঞান। এই জ্ঞানের নামই প্রতিভান—যা প্রতিরূপ সৃষ্টি ছাড়া আর কিছুই করে না ; বিষয়াকারা প্রতীতি সৃষ্টি ক'রে যা প্রতিরূপ প্রতিভাত করেই যার কাজ শেষ হয়ে যায়। সুতরাং নব নব রূপ উদ্‌ভাসিত করা তথা অপূর্ব অপূর্ব বস্তু নির্মাণ করা ছাড়া প্রতিভানের আর কোন দায়িত্বই নেই। ক্রোচের মতে—শিল্প প্রাতিভানিক জ্ঞান এবং

প্রত্যেক শিল্পই স্বরূপতঃ প্রতিরূপ। ক্ষুদ্রতম প্রতিরূপ এবং বৃহত্তম প্রতিরূপের মধ্যে যে পার্থক্য তা' শুধু মাত্রাগত পার্থক্য, গুণগত কোন পার্থক্য নয়। একটি শ্লোক এবং একখানি বিরাট মহাকাব্য স্বরূপে একই—অর্থাৎ প্রতিরূপ বিশেষ। একই কল্পনাবৃত্তি থেকে উভয়ের জন্ম এবং একটি যে পরিমাণে অযৌগিক, অন্যটিও সেই পরিমাণে অযৌগিক বা অখণ্ড। এমন নয় যে একটি শ্লোক একক একটি প্রতিভান বটে, কিন্তু একখানি পঞ্চাঙ্ক নাটক বা মহাকাব্য একাধিক প্রতিভানের সংযোগের ফল—বহু প্রতিভানকে বুদ্ধি দ্বারা পরিকল্পিত করে মহাকাব্যের যৌগিক প্রতিভান গড়া হয়। একটি শ্লোক এবং একখানি মহাকাব্য সমান মাত্রায় একক—একটিমাত্র প্রতিভান। দর্শন-বিজ্ঞানের ফলশ্রুতি—সংজ্ঞা এবং শিল্পের ফলশ্রুতি—প্রতিরূপ। দর্শন-বিজ্ঞানে প্রতিরূপ থাকলেও, তা' যেমন ঐ সংজ্ঞারই উপাদান বিশেষ, তেমনি শিল্পে সংজ্ঞার মিশ্রণ থাকলেও তা' প্রতিরূপেরই উপাদান মাত্র। নাটকের, উপন্যাসের বা গল্পের চরিত্রের মুখে যে তত্ত্বকথা থাকে, তার চিন্তা-মূল্য যতোই থাক, তা ঐ চরিত্রেরই অঙ্গ হিসাবে গণ্য, চরিত্র-নিরপেক্ষভাবে তার কোন মূল্য নেই। দর্শনকে যেমন শেষ পর্যন্ত সংজ্ঞা হয়ে উঠতে হবে, তেমনি শিল্পকে শেষ পর্যন্ত প্রতিরূপ বা প্রতিভান হয়ে উঠতে হবে। এই হিসাবে প্রতিভানকে এক কথায় 'image-making' বলা চলে। কিন্তু এই "ইমেজ-মেকিং"-এর বিশেষ বৈশিষ্ট্য এই যে তার উপরে বুদ্ধির কোন প্রভাব নেই। impression-কে image'-এ পরিণত করাই তার একমাত্র ধর্ম। প্রতিরূপ-অতিরিক্ত কোন কিছু প্রতিভানের কাম্য নয় এবং নয় বলেই প্রতিভান ঠিক perception ও নয়; কারণ 'perception is neither more nor less than a complete judgment as judgment implies an image and a category or system of mental categories which must dominate the image (reality, quality etc); প্রতীতির (পারসেপ্শান) সঙ্গে ঐক্য এইটুকুই যে প্রতীতি যেমন প্রতিরূপাত্মক, প্রতিভানও তেমনি প্রতিরূপাত্মক। আর পার্থক্য এই যে প্রতীতি নিছক একটি প্রতিরূপ নয়, বিশেষ বিশেষ বৌদ্ধিক

প্রক্রিয়ায় বিধৃত প্রতিরূপ অর্থাৎ একটি সিদ্ধান্ত (জাজমেণ্ট)।। এই কারণেই ক্রোচে প্রতিভানের সংজ্ঞা নির্দেশ করতে যেয়ে লিখেছেন—Intuition is the undifferentiated unity of the perception of the real and of the simple image of the possible, অর্থাৎ প্রতিভানের মধ্যে কোন্‌টা-বাস্তবের প্রতিরূপ, কোন্‌টি অবস্তুর প্রতিরূপ এ বিচার বা পরিচ্ছেদ থাকে না। প্রাতিভানিক জ্ঞানের পর্যায়ে শিল্পী শুধু রূপ সৃষ্টি বা সম্ভোগ করেই পরিতৃপ্ত। অন্য কোন আকাঙ্ক্ষা তার থাকে না।

এই প্রতিভান-তত্ত্বের ভিত্তির উপরেই ক্রোচে তাঁর শিল্পতত্ত্বের প্রাসাদ নির্মাণ করেছেন এবং শিল্পকে, বৌদ্ধিক বা নৈয়ায়িক ক্রিয়া, আর্থনৈতিক ক্রিয়া এবং নৈতিক ক্রিয়া থেকে মুক্ত করতে অর্থাৎ নিছক প্রাতিভানিক ক্রিয়াতে পরিণত করতে চেষ্টা করেছেন। এই কারণেই ক্রোচে শিল্পসৃষ্টি ব্যাপারটিকে দুই পর্যায়ে ভাগ করেছেন—প্রথম পর্যায়ের নাম দিয়েছেন "একস্‌প্রেশান (expression), দ্বিতীয় পর্যায়ের নাম—"এক্‌স্‌টারনালাইজেশন (externalization)। শিল্পকে নিছক প্রাতিভানিক ক্রিয়ার ফল প্রতিপন্ন করতে-হলে এ না ক'রে উপায় নেই। কারণ—"একস্‌টারনালাইজেশান" ব্যাপারটি বাংলায় "প্রকাশ করা" ব'লতে আমরা যে ব্যাপার বুঝি—ক্রোচের মতে "প্রাকৃটিকাল এ্যাকৃটিভিটি" অর্থাৎ ঐ ব্যাপারের মূলে উপযোগ—বুদ্ধি ও নীতি কাজ করে থাকে। সুতরাং 'Art is intuition' বা 'Art is expression এই সিদ্ধান্তে আঁকড়ে থাকতে গেলে—শিল্পসৃষ্টি ব্যাপারটিকে শুধুমাত্র "একস্‌প্রেশানের" স্তরেই সীমাবদ্ধ করে রাখতে হবে। ক্রোচেও তাই করেছেন।

এই সিদ্ধান্তের দুর্বলতার দিকটিতে ক্রোচে নিজেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন—স্বীকার করেছেন—"If by art be understood the externalization of art, then utility and morality have a perfect right to enter into it; that is to say, the right to be master in one's own house."। (১১৬ পৃঃ—'টেকনিক এ্যাণ্ড দি আর্টস' অধ্যায়—ডগলাস আইনস্‌লির অনূদিত 'এস্থেটিক')। এ কথাও

তিনি বলেছেন—আমাদের মনের মধ্যে যে যে প্রতিরূপ ফুটে উঠে তাকেই আমরা প্রকাশ করিনে, বহুরূপের ভিতর থেকে আমরা কয়েকটিকে নির্বাচন করি এবং এই নির্বাচন ব্যাপারটি—"is ruled by the criteria of the economic disposition of life and of its moral direction"—জীবনের আর্থনৈতিক ও নৈতিক প্রবৃত্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। ক্রোচের সমালোচকরা এখানে অবশ্যই বলবেন—'নীরব কবিত্ব না মানলে স্বীকার করতেই হবে—'প্রকাশই কবিত্ব' (রবীন্দ্রনাথ), প্রকাশিত না হওয়া পর্যন্ত শিল্পের সৃষ্টি সম্পূর্ণই হয় না এবং তা' স্বীকার করলে সঙ্গে সঙ্গে এও বলতে হবে—শিল্পসৃষ্টি নিছক প্রাতিভানিক বা জ্ঞানাত্মিকা ক্রিয়া নয়, একাধারে জ্ঞানাত্মিকা ও কর্মাত্মিকা ক্রিয়া। অধিকন্তু এ কথাও হয়তো বলবেন—ক্রোচে যতোখানি আবেগ নিয়ে গোড়ার দিকে শিল্পের নিরপেক্ষ সত্তা প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন, শেষ পর্যন্ত ততখানি আবেগ রক্ষা করতে পারেননি, স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন—শিল্পের সঙ্গে উপযোগের ও নীতির নিগূঢ় যোগ থাকে। সমালোচকদের যুক্তি নিশ্চয়ই উপেক্ষণীয় নয়।

তারপর এ কথাও বলা যেতে পারে—নির্বাচন'-প্রক্রিয়াকে স্বীকার করে ক্রোচে শিল্পসৃষ্টির ব্যাপারকে যে শুধু কর্মাত্মিকা ক্রিয়াতেই পরিণত করেছেন তা' নয়, যেহেতু নির্বাচনের মধ্যে নৈয়ায়িক ক্রিয়াও বর্তমান শিল্পসৃষ্টিকে প্রাতিভানিক-নৈয়ায়িক ক্রিয়ায় পযবসিত করেছেন। অবশ্য ক্রোচের পক্ষ থেকে এই যুক্তি দেখানো যেতে পারে যে শিল্পসৃষ্টি বা প্রকাশন নির্বাচন-সাপেক্ষ এ কথা বলার অর্থ এ নয় যে একাধিক নির্বাচিত প্রতিভানের সংযোগে বুদ্ধিপূর্বক একটি যৌগিক প্রতিভান গড়ে তোলা হয় (মনে রাখতে হবে—'Art is expression of impressions, not expression of expression), 'নির্বাচন এক একটা গোটা গোটা প্রতিভানের নির্বাচন। কিন্তু এই যুক্তি দেখানোর সঙ্গে সঙ্গেই আর একটি সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে এবং সেই সমস্যাটি প্রশ্নাকারে এই—শেকস্‌পীয়রের সমগ্র একখানি পঞ্চাঙ্ক নাটকের মতো যৌগিক প্রতিভানকে (কম্‌প্লেক্‌স্ ইন্‌টুইশান) তার প্রথম পংক্তি থেকে শেষ পংক্তি পর্যন্ত, নির্বিকল্পক জ্ঞান বা এক নিমেষে উদ্ভাসিত

একক প্রাতিভানিক ক্রিয়ায় গৃহীত প্রতিরূপ বলা চলে কি? ক্রোচে হয়তো বলবেন—ছোট্ট একটি নুড়ি পাথর যে উপাদানে তৈরি, গোটা একটা হিমালয়ও সেই একই উপাদানে গঠিত, দুয়ের মধ্যে যে পার্থক্য তা' শুধু পরিমাণগত পার্থক্য। ছোট্ট একটি শ্লোক অল্পক্ষেত্রে প্রতিভানিক ক্রিয়ার প্রকাশ, মহাকাব্য বৃহৎক্ষেত্রে ঐ একই ক্রিয়ার প্রকাশ। প্রথম ক্ষেত্রে প্রতিভান অল্পক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে প্রতিভান বৃহৎক্ষেত্রে প্রসারিত।

কিন্তু সমালোচকরা বলবেন, ক্রোচের এই যুক্তি কতখানি মনস্তত্ত্বসম্মত তা' বলা কঠিন। গোটা একখানি মহাভারত তার প্রথম পংক্তি থেকে শেষ পংক্তি পর্যন্ত সমগ্র অবয়ব নিয়ে ব্যাসের মনে, এক মুহূর্তে প্রতিভাত হ'য়েছিল চরিত্রগুলির প্রতিমুহূর্তের কায়িক মানসিক বাচনিক রূপগুলি যুগপৎ স্রষ্টার মনে উদ্‌ভাসিত হ'য়েছিল—এ ধারণাকে সত্য মনে করতে অনেকেই কুণ্ঠিত হবেন। কুণ্ঠার কারণ নিশ্চয়ই এই যে সমালোচকরা মনে করেন—যৌগিক প্রতিভান' সুপরিকল্পিত প্রতিভান, খণ্ড খণ্ড প্রাতিভানের সংজ্ঞান সংযোগ-বিয়োগের অর্থাৎ নির্বাচনের দ্বারা গঠিত হয়। যৌগিক প্রতিভানের মূলে পরিকল্পনা (আইডিয়া) থাকে এবং ঐ পরিকল্পনা দ্বারা প্রতিভান-নির্বাচন নিয়ন্ত্রিত হয়, এ কথা স্বীকার করলে (ক্রোচে স্বীকার করবেন না), শিল্পসৃষ্টিকে প্রতিভানিক নৈয়ায়িক ব্যাপার ব'লেই স্বীকার করতে হয়। ক্রোচে একথা স্বীকার করেছেন বটে প্রত্যেক প্রতিভানের ভিতর দিয়ে আত্মার আকাঙ্ক্ষাই (ইণ্টারেস্ট) ব্যক্ত হয়ে থাকে। তা' যদি না হবে তবে আত্মা প্রতিভান করতেই বা যাবে কেন? কিন্তু প্রশ্ন উঠবে—এ আকাঙ্ক্ষা কিসের আকাঙ্ক্ষা? ক্রোচে বললেন—রূপের আকাঙ্ক্ষা। আবার প্রশ্ন হবে—রূপের যৌগক পরিকল্পনা—যার নাম 'যৌগিক প্রতিভান'—আমাদের সামনে যে প্রকাশিত শিল্পটি রয়েছে—তার গঠন কি শিল্পী ব্যক্তির উপযোগ-বুদ্ধি ও নীতিবুদ্ধি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়?

আর নিয়ন্ত্রিতই যদি হয় তবে বুঝতে হবে—শিল্পসৃষ্টির মূলে স্রষ্টার অভিপ্রায় ও পরিকল্পনা কাজ করে থাকে। কোন রসসৃষ্টির অভিপ্রায়ই থাক অথবা কোন একটি জীবনবোধকে রসরূপে ব্যক্ত করার অভিপ্রায়ই

থাক—বিশেষ একটি অভিপ্রায় প্রত্যেক সৃষ্টির মধ্যেই থাকে। ক্রোচে 'রূপ-সৃষ্টি'র উদ্দেশ্য ছাড়া অন্য যে কোন অভিপ্রায়কেই স্থান দিতে কুণ্ঠিত হবেন; কারণ ভাব বা বোধকে (আইডিয়া) শিল্পের উদ্দেশ্যের আসনে বসালে, শিল্পের স্বাতন্ত্র্য নষ্ট হয়ে যাবে—প্রতিভান বা প্রতিরূপ আর মুখ্য উদ্দেশ্যের স্থান অধিকার করে থাকবে না, ভাব বা বোধের বাহনে পরিণত হয়ে যাবে এবং যে 'হেডনিষ্টিক' এবং 'ইণ্টেলেকচুয়ালিষ্টিক' মতবাদের বিরুদ্ধে তিনি অবিরাম সংগ্রাম করেছেন, সেই মতবাদের কাছেই তাঁকে আত্মসমর্পণ করতে হবে। কিন্তু এ প্রশ্ন থেকেই যাবে—ক্রোচে 'যৌগিক প্রতিভান'কে সরল প্রতিভানের মতো নির্বিকল্পক প্রমাণ করতে পেরেছেন কি? শিল্পকে ভাব-নিরপেক্ষ বা ভাবনা-নিরপেক্ষ করতে সক্ষম হয়েছেন কি? অবশ্য শিল্পতত্ত্বে ক্রোচের দান ও স্থান নির্ধারণ করতে হলে এই সব প্রশ্নের উত্তর দিতেই হবে। এখানে সে অবকাশ নেই বা অবকাশ থাকলেও আমার সামর্থ্য খুবই অল্প। তব দু'একটি কথা বলছি—সমস্যার সমাধান করবার জন্য নয়, শুধু সমস্যার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্য।

আগেই বলেছি ক্রোচে শিল্পকে স্বতন্ত্র স্বাধীন সত্তা দেওয়ার অভিপ্রায়েই প্রতিভান-তত্ত্বের ভিত্তির উপরে শিল্পকে দাঁড় করাতে চেয়েছেন—শিল্প-সৃষ্টিকে প্রাতিভানিক ক্রিয়া এবং শিল্পকে 'প্রতিভান' বা 'প্রতিরূপ' বলে ঘোষণা করেছেন। এই সৃষ্টিকে তিনি একদিকে নৈয়ায়িক ক্রিয়া থেকে, অন্যদিকে আর্থনৈতিক ও নৈতিক ক্রিয়া থেকে পৃথক প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন। প্লেটো-এরিস্টটলের 'অনুকৃতি-করণ' (মাইমেসিস মেকিঙ) মতবাদকে তিনি খণ্ডন করেছেন, শিল্পকে যারা 'ভাবাবেগের প্রকাশ' (expression of feeling) বা 'আনন্দের প্রকাশ' বা 'ভাবনার কল্পনা শরীর' বলেছেন তাদের মতবাদকেও তিনি সমালোচনা ও খণ্ডন করেছেন এবং দেখিয়েছেন—তাঁরা কেউই শিল্পের স্বরূপটি অর্থৎ প্রতিভানের স্বরূপটি ধরতে পারেননি। এমন কি যাঁরা শিল্পকে কল্পনা-কর্ম (ইমাজিনেশান) বলে মনে করেছেন তাঁরাও—ক্রোচে বলেন—কল্পনা বৃত্তির স্বাধীনও স্বতন্ত্র সত্তাটি উপলব্ধি করতে পারেননি, কল্পনাকে ভাব ও ভাবনার বাহন হিসাবে দেখেছেন—কল্পনার সৃজনশীলতা,

ভাব ও ভাবনা নিরপেক্ষ সত্তা উপলব্ধি করতে পারেননি। ক্রোচের প্রতিপাদ্য—কল্পনাবৃত্তি স্বতন্ত্র এবং বুদ্ধিনিরপেক্ষ বৃত্তি, শিল্প এই বৃত্তিরই সৃষ্টি। তা' কোন কিছু সিদ্ধবস্তুর অনুকরণ নয় অথবা ভাবের বা ভাবনার (আইডিয়া) কল্পনা-পরিচ্ছাদিত রূপ নয়, তা' স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি প্রতিভান বা প্রতিরূপ। এই প্রতিভান যথার্থ প্রতিভান বা সুন্দর হয়েছে কি না, তা' বিচার করবার অন্য কোন প্রমাণ নেই—তাকে বিচার করতে হবে—intuitive absoluteness of imagination-এর সাহায্যে অর্থাৎ প্রতিরূপকে কোন ভাবের বা ভাবনার (আইডিয়ার) বাহন হিসাবে বিচার করলে চলবেনা, বিচার করতে হ'বে—আদর্শ প্রতিরূপের কতটা কাছাকাছি পৌঁছেছে না পৌঁছেছে সেই হিসাব করেই। সেই কল্পনাদর্শও অবশ্য নির্বিকল্পকজ্ঞানলভ্য। প্রতিভানবাদ অক্ষরে অক্ষরে মানলে এই পরিণাম অতিস্বাভাবিকই।

কিন্তু প্রশ্ন উঠবেই ক্রোচে এই স্বাভাবিক সিদ্ধান্তের গণ্ডীর মধ্যে থাকতে পেরেছেন কি ? প্রথমত: দেখা যাবে, ক্রোচে প্রতিরূপকে মুখে যত নিরপেক্ষ বলেছেন, কার্যে তত নিরপেক্ষ করতে পারেননি। আমরা দেখতে পাই—শিল্পকে তিনি সোজাসুজি—'ভাবাবেগের প্রকাশ' বলেননি বটে কিন্তু প্রতিভানকে ভাবাবেগ (ফিলিঙ্গ)-নিরপেক্ষ কোন স্বতন্ত্র সত্তায় পরিণত করতে পারেন নি। তিনি স্বীকার করেছেন—"if the concept as content of art and historical reality as such, be excluded from the sphere of art there remains no other content than reality comprehended in all its ingenuousness and immediacy in the vital impulse, in its feeling, that is to say again, pure intuition. এই উক্তি থেকে পাওয়া যাচ্ছে—প্রতিভান 'reality'-কে vital 'impulse' বা feeling দিয়ে গ্রহণ করা।

এই সিদ্ধান্ত যে মিথ্যা অনুমান মাত্র নয় 'এসেন্স অব এস্থেটিক' থেকে প্রমাণ তুলেও দেখানো যেতে পারে। বহু স্থলেই ক্রোচে প্রতিভান ও আবেগের অন্তরঙ্গ সম্পর্ক স্বীকার করেছেন। তিনি লিখেছেন—(১) What gives coherence and unity to the intuition is *feeling* ; the

intuition is reality such because it represents a feeling and can only appear from and upon that—(৩০ পৃষ্ঠা) (২) an aspiration enclosed in the circle of a representation—that is art. (৩) What we admire in genuine work of art is the perfect imaginative form which ***a state of the soul*** assumes. (৪) but it would have been more accurate to say that all the arts are music, if it be thus intended to emphasise the ***genesis of aesthic images in feelings***........(৫) art is a true aesthetic synthesis a priori of feeling and image in the intuition as to which it may be repeated that feeling without image is blind and image without feeling is void." আর প্রমাণ উদ্ধৃত করার প্রয়োজন নেই।

ক্রোচে নিজেই পূর্বপক্ষের যুক্তিটি উল্লেখ করেছেন। লিখেছেন—It is useless to refute an objection that certainly might be made (but rather with the sophistry of the advocate than with the acuteness of the scientist), namely that the aesthetic of the intuition also, since it describes the content of art as feeling or state of the soul, qualifies it outside the intuiton and seems to admit that a content which is not feeling or a state of the soul, does not lend itself to artistic elaboration, and is not an aesthetic content। পূর্বপক্ষের এই যুক্তিটি ক্রোচে উপেক্ষা করতে পারেননি। যদিও "Feeling বা state of the soul is not a particular content but the whole universe seen sub specie intuitionis" এই কথা বলে তিনি সামলে নিতে চেষ্টা করেছেন, তবু এ কথা মিথ্যা হয়ে যাচ্ছে না যে শিল্পের জন্ম হ'চ্ছে feeling বা state of the soul" থেকে। সুইজারল্যাণ্ডের জনৈক দার্শনিককল্প ব্যক্তির "every landscape is a state of the soul"—এই উক্তিটিকে সত্য বলে স্বীকার

করে নেওয়ায় ক্রোচে যেন এই সিদ্ধান্তই করেছেন যে বিশ্বের বস্তুরাজি শিল্পীর মনে বিশেষ আবেগ জাগিয়ে তোলে এবং শিল্পী সেই আবেগের বিভাব হিসাবেই বস্তুটিকে রূপ দিয়ে থাকেন। অর্থাৎ শিল্পী যে রূপ সৃষ্টি করেন তা' ভাবেরই প্রতীক।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে—ক্রোচের প্রতিভান যেহেতু, আবেগের বা আত্মার অবস্থারই অভিব্যক্তি—imaginative form which a state of the soul assumes', প্রতিভানের উৎকর্ষ-অপকর্ষ বিচারে রূপাদর্শ আর মানদণ্ড থাকছে না, feeling or state of the soul—মানদণ্ড হয়ে দাঁড়াচ্ছে। imaginative form অর্থাৎ প্রতিভান কি পরিমাণে সার্থক হয়েছে বা না হয়েছে তা' বিচার করবার একবার একমাত্র উপায় হচ্ছে রূপটি কি পরিমাণে আত্মার অবস্থাটিকে ব্যক্ত করতে পেরেছে বা না পেরেছে তারই হিসাব। সুতরাং প্রতিরূপের উৎকর্ষ বিচারে রূপাদর্শ ছাড়া অন্য কিছু মানদণ্ড হয়ে দাঁড়াচ্ছে। অন্য কিছুকে যে মানদণ্ড বলে স্বীকার করা হয়েছে, তার অন্য প্রমাণও আছে। 'এসেন্স অফ এস্থেটিক' গ্রন্থের শেষ অধ্যায়ে –'শিল্পের সমালোচনা ও ইতিহাস' অধ্যায়ে,ক্রোচে'শৈল্পিক সমালোচনা' এবং ঐতিহাসিক সমালোচনা'কে সমীকৃত করার পরে লিখেছেন—···criticism of art, when truly aesthetic or historical, becomes at the same time amplified into a criticism of life, since it is not possible to judge—that is to characterise—works of art without at the same time judging and characterising the works of the whole life. শিল্প সমালোচনা শেষ পর্যন্ত 'জীবন সমালোচনা'—এ কথার তাৎপর্য এই যে জীবনের রূপকে সম্যকভাবে বিচার করা যায় শুধু জীবনের অভিজ্ঞতার বা স্বরূপের ধারণার সঙ্গে মিলিয়েই, এক কথায় জীবন-বোধের মানদণ্ডের সাহায্যেই। জীবনের রূপ যথাযথভাবে ব্যক্ত হয়েছে কি না—তথা সুন্দর হয়েছে কি না, তখনই তা' বলা সম্ভব হবে যখন জীবন-বোধের সঙ্গে রূপকে মিলিয়ে মিলিয়ে দেখা হবে। আশা করি প্রতিভানের স্বরূপ বুঝবার পক্ষে এই আলোচনাটুকু সহায়ক হবে।

প্রতিভানের স্বরূপ বুঝবার জন্য আর একটি প্রশ্নেরও মীমাংসা আবশ্যক। প্রশ্নটি এই --প্রতিভান সংজ্ঞান বা নির্জ্ঞান ব্যাপার ?—সংজ্ঞান ইচ্ছার বা নির্জ্ঞান ইচ্ছার সৃষ্টি ? আগেই বলা হয়েছে মনস্তত্ত্ববিদ্‌রা প্রতিভান ব্যাপারটিকে নির্জ্ঞান বলেই মনে করে থাকেন ; কিন্তু আমরা জানি,ক্রোচের কাছে প্রতিভান সম্পূর্ণ সংজ্ঞান ব্যাপার এবং নির্জ্ঞান বলে কোন রকম জ্ঞান সম্ভব নয়—নির্জ্ঞান জ্ঞান স্বতোবিরুদ্ধ কথা। আত্মা সজ্ঞানেই প্রতিভান করে থাকে। এখন মনস্তত্ত্ব-বিদ্‌রা প্রতিভানকে যে অর্থে নির্জ্ঞান বলেন, ক্রোচের প্রতিভানকে সেই একই অর্থে নির্জ্ঞান বলা চলে কি না অবশ্যই ভেবে দেখা দরকার। এ কথা অবশ্যই ঠিক যে ব্যক্তির মনের মধ্যে যখন প্রতিরূপ জাগে তখন ব্যক্তি অচেতন অবস্থায় থাকেন না অর্থাৎ বাহ্য চেতনা হারিয়ে ফেলেন না। এই অর্থে প্রতিরূপ সৃষ্টি সংজ্ঞান ব্যাপারই বটে, কিন্তু এ কথাও মিথ্যা নয় যে, প্রতিরূপ সৃষ্টিতে সংজ্ঞান ইচ্ছা কতখানি অংশ গ্রহণ করে বা করেনা তা' বিচার করে সৃষ্টি ব্যাপারকে সংজ্ঞান ও নির্জ্ঞান আখ্যা দিতে গেলে, ক্রোচের প্রতিভান বা প্রতিরূপ সৃষ্টি ব্যাপারটিকে সংজ্ঞান না বলে নির্জ্ঞান বলাই যুক্তিযুক্ত হবে। প্রতিরূপ সৃষ্টির প্রক্রিয়াটি লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে—আত্মার রহস্যময় প্রদেশে (obscure region of the soul),—অবস্থিত প্রত্যয়রাজি (ইম্প্রেশানস) কি প্রক্রিয়ায় প্রতিরূপে পরিণত নয়, কেন এবং কিভাবে বিশেষ বিশেষ প্রতিরূপ রূপে সংশ্লেষিত হয় তা' আমরা জানিনে। আমরা সংজ্ঞান ইচ্ছার দ্বারা অর্থাৎ বুদ্ধি পরামর্শ অনুযায়ী 'প্রতিভান' সৃষ্টি করতে পারিনে। ক্রোচে স্বীকার করেছেন—we can not or not will our aesthetic vision অর্থাৎ ইচ্ছা করে প্রতিভানকে বোধ করতে বা সৃষ্টি করতে পারিনে। এ যদি সত্য হয় সংজ্ঞান ইচ্ছার পরিকল্পনা অনুসারে প্রতিরূপ যদি গঠিত না হয়, (হলে সেই প্রতি-রূপকে প্রতিভান বলা চলবে না) তা'হ'লে নিশ্চয়ই এ কথা বলা যাবে না যে প্রাতিভানিক ক্রিয়াটি সম্পূর্ণ সংজ্ঞান ব্যাপার। তারপর—"art is a true aesthetic synthesis a priori of feeling and image in the intuition—এ সিদ্ধান্তে—"synthesis a priori"—কথাটির উপর যে জোর দেওয়া হয়েছে, তাতেও সৃষ্টি ব্যাপারটি সংজ্ঞান ইচ্ছার অধীনে থাকছে কি না

বিচার করে দেখা দরকার। বলা বাহুল্য সংজ্ঞান ও নির্জ্ঞান শব্দ দু'টিকে আমরা মনোবিজ্ঞানীরা যে অর্থে ব্যবহার করে থাকেন সেই অর্থেই ব্যবহার করছি।

আর একটি বিষয়ে দু'একটি কথা বলেই আমি ক্রোচের প্রতিভান তত্ত্ব থেকে বিদায় নেব। শিল্পতত্ত্বের ক্ষেত্রে 'art for art's sake এবং 'art with a purpose' এই দুই মতবাদের লড়াই বহুদিন ধরে চলে আসছে। ক্রোচের প্রতিভানতত্ত্ব'art for art's sake—মতবাদের মস্ত বড় সমর্থক ও সহায় বটে, কিন্তু 'art with a purpose'—এর শত্রু নয়। প্রয়োজন সাধনের উদ্দেশ্য থাকলেই কোন শিল্প শিল্প হিসাবে উৎকৃষ্ট হ'তে পারবে না—এ কথা ক্রোচে স্বীকার করেন না। ত্রয়োদশ অধ্যায়ে মুক্ত ও অমুক্ত সৌন্দর্যের আলোচনা প্রসঙ্গে ক্রোচে স্পষ্ট ভাষায় লিখেছেন—প্রয়োজন সাধনের উদ্দেশ্য এবং শৈল্পিক সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য—এই দুই উদ্দেশ্য স্বতোবিরুদ্ধ কিছু নয়। 'The aesthetic activity can always agree with practical, because expression is truth.' সমর্থ শিল্পী যিনি তিনি একই সঙ্গে দুই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে পারেন—প্রয়োজনীয়কে সুন্দর রূপ দিতে পারেন। যেমন উৎকাল্পনিক সৃষ্টির মধ্যে প্রতিভানের স্ফূর্তি দেখা দিতে পারে, তেমনি বাস্তবরূপ বা সমস্যাও প্রতিভানের বিষয়ীভূত হতে পারে। যে কোন মহান শিল্পীর রচনা দেখলেই তার প্রমাণ মিলবে।

এতক্ষণ ক্রোচের প্রতিভান তত্ত্ব সম্বন্ধে যে আলোচনা করলাম তার উদ্দেশ্য ক্রোচের সিদ্ধান্তের সমালোচনা করা নয়। আসল উদ্দেশ্য—প্রতিভান তত্ত্বের বৈশিষ্ট্যের দিকে পাঠকের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা। শিল্পতত্ত্বে ক্রোচের দানের পরিমাণ সম্যকভাবে নিরূপণ করতে হ'লে বড় একখানি গ্রন্থের পরিসর আবশ্যক। আর সে উদ্দেশ্যও আমার নয়। শিল্পতত্ত্বের ক্রমবিকাশের ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে ক্রোচের শিল্পতত্ত্বকে বিচার করা আমার উদ্দেশ্য নয়। আমার উদ্দেশ্য—ক্রোচের 'থিওরি অফ এস্থেটিক' এবং 'এসেন্স অফ এস্থেটিক' এই দু'খানি মূল্যবান ও বিখ্যাত গ্রন্থের সঙ্গে বাঙালী পাঠকের পরিচয় ঘটানো।

* * * *

এবার, গ্রন্থ রচনা সম্বন্ধে দু'একটি কথা বলেই মুখবন্ধ শেষ করছি। বহুকাল আগে—১৯৪০-৪১ খ্রীষ্টাব্দে, আমি প্রথম ক্রোচের এস্থেটিক গ্রন্থখানি পাঠ করি এবং বার বার পাঠ করি। তখনই মনে এই ইচ্ছা জাগে ক্রোচের এস্থেটিকের বক্তব্যকে বাংলাভাষায় প্রকাশ করতে হবে। ইচ্ছাকে কার্যে পরিণত করতে—আমি এস্থেটিকের প্রত্যেক অধ্যায়ের সারাংশ বাংলায় অনুবাদ করে ফেলি এবং ক্রোচের মূল সিদ্ধান্তগুলির তাৎপর্য নির্ধারণ করবার জন্য বিভিন্ন মতবাদের আলোকে বক্তব্যগুলি বিচার করবার চেষ্টা করি। অনুবাদ এবং আলোচনা একত্রে একখানি গ্রন্থের আকার ধারণ করে এবং তার নামকরণ করি—"ক্রোচের এস্থেটিক পরিচয় ও সমালোচনা"। প্রখ্যাত দর্শন অধ্যাপক ডক্টর শ্রীমহেন্দ্র সরকার মহাশয় (এখন স্বর্গত) তখন যশোহর সহরে অবসর যাপন করছিলেন। অতি সঙ্কোচের সঙ্গে তাঁকে আমার দুঃসাহসের কথা জানাই। তিনি অপ্রত্যাশিত আগ্রহ নিয়ে আমার লেখা পাঠ করেন এবং স্বতঃপ্রণোদিত হয়েই গ্রন্থখানি পি. আর. এস.—'থিসিস' হিসাবে দাখিল করার নির্দেশ দেন। তাঁর নির্দেশ অনুসারেই আমি প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ বৃত্তির জন্য থিসিসটি দাখিল করি। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্যের (এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের কলঙ্কের) বিষয় থিসিসের দু'জন পরীক্ষকের মধ্যে একজন তাঁর মন্তব্যাদি পাঠালেন, আর একজন ৮খানি পত্রের তাগিদ সত্ত্বেও হাঁ-না কোন কথাই বললেন না। এমত অবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয়ের যা করণীয় ছিল তা' না করে—অর্থাৎ তৃতীয় পরীক্ষক দিয়ে থিসিসটি পরীক্ষা না করিয়ে, কর্তৃপক্ষ কাজ সংক্ষেপ করলেন—আমাকে বৃত্তি থেকে বঞ্চিত করলেন। আমি তখনকার উপাচার্য শ্রীযুক্ত প্রমথ নাথ বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের সঙ্গে দেখা করলাম। তিনি আমার কথা শুনে থিসিসটি পুনঃপরীক্ষার বন্দোবস্ত করবেন এমন আশ্বাস দিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত জানি না কি ভেবে পিছিয়ে গেলেন। ক্রোচের "এস্থেটিক পরিচয় ও সমালোচনা" ঘরেই পড়ে রইলো।

তারপর অনেক কিছু লিখেছি, প্রকাশিতও হয়েছে, কিন্তু ক্রোচেকে প্রকাশ করতে সাহস পাইনি। কোন কোন প্রকাশক প্রকাশের আগ্রহ দেখিয়েছেন বটে, কিন্তু আমি 'আজ দেব' 'কাল দেব' করে পাণ্ডুলিপি পাঠাইনি। ক্রোচের

'এস্থেটিক' যেমন ছিল তেমনি পড়ে রইলো। কয়েক মাস আগে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক শ্রদ্ধেয় ডক্টর শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত মহাশয় ক্রোচের প্রকাশ বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করায়, ক্রোচের কথা নতুন করে মনে এলো। স্থির করলাম—সারাংশ নয়, এবার ক্রোচের বক্তব্যের সবটুকু আমি বাংলা ভাষায় প্রকাশ করতে চেষ্টা করব। গত গ্রীষ্মের অবকাশে আমি আমার সঙ্কল্প কার্যে পরিণত করলাম—'এস্থেটিক' গ্রন্থের "থিওরি অফ এস্থেটিক" অংশকে (হিষ্ট্রী অফ এস্থেটিক অংশ বাদ) ভাষান্তরিত করে ফেললাম। এই কাজ শেষ করার পরে মনে হল—"এসেন্স অফ এস্থেটিক গ্রন্থখানির বক্তব্যকেও এই সঙ্গে উপস্থাপিত করতে পারলে, ক্রোচের সব কথাকেই জানানো হবে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার থেকে ডক্টর দাশগুপ্ত মহাশয় এই গ্রন্থখানি আমাকে সংগ্রহ করে দিলেন। আমি 'এসেন্স অফ এস্থেটিক' গ্রন্থের চারটি অধ্যায়ের সারাংশ বাংলায় তর্জমা করলাম এবং মূল গ্রন্থের সঙ্গে যুক্ত করলাম। সুতরাং গ্রন্থের পুরোনো নামটি পরিবর্তন করে নতুন নাম দিলাম—"ক্রোচের থিওরি অফ এস্থেটিক এবং এসেন্স অফ এস্থেটিক"। 'পরিচয়' কথাটা রাখলাম উহ্য।— কারণ ক্রোচে নিজের কথা নিজেই বলেছেন; আমি গ্রন্থের মধ্যে ক্রোচের কোন সিদ্ধান্ত নিয়ে কোন কথা বলিনি, আমার আলোচনা দিয়ে ক্রোচের বক্তব্য আচ্ছন্ন করতে চেষ্টা করিনি। আমি যা বলেছি তা এই ভূমিকাতেই। পাঠকের সুবিধার জন্য, আমি ক্রোচের জীবন, দর্শন এবং প্রতিভানের স্বরূপ সম্বন্ধে অতি সামান্য ভাবে দু'চারটি কথা বলেছি। আশা করি, ভূমিকা পাঠ করে নিলে এস্থেটিক পাঠ করা সহজসাধ্যই হবে।

বলা বাহুল্য পরিভাষায় হোঁচট খাওয়ার আশংকা ষোল আনাই আছে। সকলেই স্বীকার করবেন এই জাতীয় গ্রন্থের অনুবাদ করার প্রথম এবং বড় বাধা—পরিভাষার অভাব। কিন্তু অভাবকে বড় করে দেখতে—পরিভাষা নিয়ে খুঁৎ খুঁৎ করতে, পাঠককে আমি নিষেধ করছি। কারণ পরিভাষার পাশেই ইংরাজীতে মূল কথাটি লিখে দিয়েছি, ফলে পরিভাষা ভুল হলেও বিষয়টি বুঝতে কোন অসুবিধা হবে না। আমি মনে করি পরিভাষার অভাবে চুপ করে বসে না থেকে লিখতে লিখতে পরিভাষা

সক্ষমদের তিরস্কারের ভয় না করেই ক্রোচের "এস্থেটিক"-এর মতো জটিল মননময় গ্রন্থের পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করেছি। জানি অনেক ত্রুটি বিচ্যুতি ঘটেছে, মানি আর কোন কৃতী লোকে এ চেষ্টা করলে কাজটি আরো সর্বাঙ্গ-সুন্দর হতে পারতো, কিন্তু এও জানি সহৃদয় পাঠক নিজ গুণেই সব দোষ মার্জনা করবেন, সাধ্যের সীমাবদ্ধতা এবং কাজের দুঃসাধ্যতা উপলব্ধি করে ক্ষমার দৃষ্টিতেই সব কিছু দেখবেন এবং পরিভাষার ত্রুটি বিচ্যুতিকে খুব বড়ো করে দেখবেন না। নিশ্চয়ই তাঁরা এ কথা স্বীকার করবেন যে—এই সন্ধি-পর্বে (যখন পরিভাষা গড়ে উঠেনি বা উঠলেও বাঙালীর কান তাতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেনি), বাংলা ভাষায়-লেখা শাস্ত্র-গ্রন্থাদিতে বাংলার পাশেই বন্ধনীতে ইংরেজি পারিভাষিক শব্দ বা অল্প বিস্তর উদ্ধৃতি থাকবেই এবং থাকা উচিতও। কালক্রমে যখন পরিভাষা এবং চিন্তা-পদ্ধতি সহজ হয়ে উঠবে তখন পরনির্ভরতাও কেটে যাবে আর বাংলার পাশে ইংরেজি পরিভাষা দেওয়ার প্রয়োজন থাকবে না। আশা করি, বাংলার অক্ষমতার লজ্জা নিবারণ করতে যে সব পরিভাষা ও উদ্ধৃতি ব্যবহার করেছি, তা' দেখে পাঠক বিরক্ত হবেন না ; গ্রন্থকারের সঙ্গে একমত হয়ে তাঁরা সেই দিনটির জন্য অপেক্ষা করবেন যেদিন ভাব ব্যক্ত করতে বাংলা ভাষাকে আর পর-মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হবে না। বাংলা দেশের প্রত্যেকটি বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক, যদি শিল্পতত্ত্বকে অবশ্য পাঠ্য একটি বিষয় হিসাবে পূর্ণ পত্রের মর্যাদা দিয়ে পাঠ্য সূচীর অন্তর্ভুক্ত করেন এবং এরিস্টটলের পোয়েটিকস্‌কে যেমন কোন কোন বিশ্ব-বিদ্যালয় পাঠ্য হিসাবে নির্বাচিত করেছেন তেমনি কাণ্টের 'ক্রিটিক অফ জাজমেণ্ট'কে এবং ক্রোচের "এস্থেটিক"কেও নির্বাচন করেন, তা' হ'লে অনতিবিলম্বেই দার্শনিক পরিভাষার সঙ্গে আমাদের পরিচয় সহজ হয়ে উঠবে। শিল্পতত্ত্বকে একটি পূর্ণ পত্রের মর্যাদা দেওয়া শুধু যে বাংলা ভাষার ভাবপ্রকাশ শক্তির বৃদ্ধির জন্যই প্রয়োজন তা নয়, শিল্পতত্ত্ব আলোচনার উন্নততর মান সৃষ্টির তথা শিল্প-শিক্ষার ভিত্তি দৃঢ়তর করবার জন্যও অপরিহার্য। আমি আশা করি, বাংলা বিভাগের কর্ণধারগণ এ বিষয়ে একটু মনোযোগ দেবেন এবং শিল্পতত্ত্ব বিষয়ক উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলির অনুবাদে

প্রেরণা যোগাবেন। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষরা মিলিত হয়ে যদি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মতো একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করেন এবং এম. এ. পাঠ্যতালিকা পুনর্গঠনের চেষ্টা করেন তা'হ'লে অতি অল্পকালের মধ্যেই বাংলা শিল্পতত্ত্ব-সাহিত্যের দৈন্য দূর হয়ে যাবে। আমি মনে করি বাংলার অগ্রগণ্য বিশ্ববিদ্যালয় কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বাংলা-বিভাগের প্রধান অধ্যাপক মহাশয়ের এ ব্যাপারে একটি বিশেষ দায়িত্ব আছে এবং আশা করি তিনি সে দায়িত্ব এড়িয়ে যাবেন না। এই প্রসঙ্গেই মনে প্রশ্ন জাগে—এম.এ. শ্রেণীতেও যদি শিল্পতত্ত্বকে পরিপাটি করে পড়ানোর ব্যবস্থা না করা হয়, তবে আর কোথায় তা' হবে? শিল্প শিক্ষার্থীকে যদি শিল্পতত্ত্বের বিভিন্ন শাখা এবং সমস্যা সম্বন্ধেই জ্ঞান দেওয়া না হয় তা' হ'লে আসল বস্তু থেকেই তাকে বঞ্চিত করা হয় না কি? কে এ কথা অস্বীকার করতে পারেন —সাহিত্য শিল্পে যে সর্বোচ্চ উপাধি লাভ করতে চলেছে, তাকে শুধু সাহিত্য-কর্মগুলির সঙ্গে পরিচিত হলেই চলবে না, পরিচিত হতে হবে— সাহিত্যের এবং শিল্পের মূল তত্ত্বের সঙ্গেও এবং সেই পরিচয় তখনই সম্পূর্ণ হবে যখন শিল্পতত্ত্বকে একটি পূর্ণ পত্রের মর্যাদা দিয়ে পাঠ্য-তালিকা ভুক্ত করা হবে। 'নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়'।

এই গ্রন্থ রচনায় অনেকেই অনেক ভাবে আমাকে সাহায্য করেছেন এবং প্রেরণা দিয়েছেন। আমার পূজ্যপাদ গুরু অধ্যাপকপ্রবর শ্রীশ্যামাপদ চক্রবর্তী মহাশয়কে (বর্তমানে বঙ্গবাসী কলেজের বাংলা বিভাগের এমেরিটাস অধ্যাপক) আমি প্রথমেই প্রণাম জানাচ্ছি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের রামতনু অধ্যাপক ডক্টর শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত মহাশয়ের আগ্রহ আমাকে কি ভাবে উৎসাহিত করেছে এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার থেকে দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ সংগ্রহ করে দিয়ে তিনি আমাকে কি ভাবে সাহায্য করেছেন তা' আগেই উল্লেখ করেছি। ডক্টর শ্রীযুক্ত দাশগুপ্ত মহাশয়কে আমি আন্তরিক শ্রদ্ধা ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমার বহুদিনের সঙ্গী ও সহকর্মী বঙ্গবাসী কলেজের সংস্কৃত সাহিত্যের সুপণ্ডিত অধ্যাপক সহোদরোপম শ্রীমান ননীলাল সেনের সঙ্গে নানা বিষয়ে আলোচনা করে

আমি যথেষ্ট উপকৃত হয়েছি ; তাকেও আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।' ক্রোচের এস্থেটিক বিষয়ে গ্রন্থ প্রকাশিত হচ্ছে শুনে যিনি আন্তরিক আনন্দ প্রকাশ করেছেন এবং নানা ভাবে আমাকে উৎসাহিত করেছেন সেই রবীন্দ্র-ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সুপণ্ডিত দর্শনবিদ সমালোচক ও সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। ক্রোচের "থিওরি অফ এস্থেটিক" এবং "এসেন্স অফ এস্থেটিক" প্রকাশ করতে যেয়ে, বিশেষ ভাবে মনে পড়ছে স্বর্গত ডক্টর মহেন্দ্রলাল সরকারকে, তিনিই প্রথম "এস্থেটিক পরিচয় ও সমালোচনা'র পাণ্ডুলিপি পাঠ করে অপ্রত্যাশিত প্রশংসাপত্র দ্বারা উৎসাহিত করেছিলেন। তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করি। আমার প্রিয় ছাত্র শ্রীমান রঞ্জিত মুখোপাধ্যায় বিষয়-সূচী রচনা ক'রে আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছে তাকে আমি ধন্যবাদ ও আশীর্বাদ জানাচ্ছি।

'বিশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি—শ্রীযুক্ত সুনীল দত্ত মহাশয়কে। তাঁর দুঃসাহস না থাকলে এই গ্রন্থ এতো তাড়াতাড়ি আলোর মুখ দেখতে পারত না। তাঁকে আমি আন্তরিক প্রীতি ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। প্রুফ সংশোধক শ্রীঅমরেন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে এবং মুদ্রণ কার্যের জন্য রূপলেখা প্রেসকেও আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়
কলিকাতা

শ্রীসাধনকুমার ভট্টাচার্য

ক্রোচের "থিওরি অফ এস্থেটিক"

থিওরি অফ এস্থেটিক

প্রথম অধ্যায়

প্রতিভান ও প্রকাশন

এস্থেটিক গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে বেনিডেটো ক্রোচে প্রতিভান ও প্রকাশনের (Intuition and expression) ঐক্য প্রতিপাদন করতে চেষ্টা করেছেন এবং তা' করতে যেয়ে নিম্নলিখিত বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন :—

(ক) প্রাতিভানিক জ্ঞান, (খ) নৈয়ায়িক জ্ঞান থেকে প্রাতিভানিক জ্ঞানের স্বাতন্ত্র্য, (গ) প্রতিভান ও প্রতীতি, (perception) (ঘ) প্রতিভান ও দেশ-কালের ধারণা, (ঙ) প্রতিভান ও সংবেদনা, (sensation) (চ) প্রতিভান ও ভাবানুষঙ্গ, (association) (ছ) প্রতিভান ও উপস্থাপনা, (জ) প্রতিভান ও প্রকাশন, (ঝ) প্রতিভান ও প্রকাশনের সম্পর্ক সম্বন্ধে মিথ্যা ধারণা, (ঞ) প্রতিভান ও প্রকাশনের ঐক্য।

* * 'প্রাতিভানিক জ্ঞান' বিষয়ে ক্রোচের বক্তব্য এই :—"জ্ঞানের দুই প্রকার বা রূপ; এক প্রাতিভানিক, অপর নৈয়ায়িক; এক কল্পনা-মাধ্যমে পাওয়া, অন্য মেধার মাধ্যমে পাওয়া ; এক বিশেষের জ্ঞান, অন্য সামান্যের জ্ঞান ; এক বিশেষ বস্তুর জ্ঞান,—অন্য বস্তু-সম্পর্কের জ্ঞান ; এক সৃষ্টি করে—প্রতিরূপ, অন্যে —সংজ্ঞা। সাধারণ কথাবার্তাতেও প্রাতিভানিক জ্ঞানের কথা স্বীকার করা হয়ে থাকে। বলা হয় যে আমরা কোন কোন সত্যের সংজ্ঞা দিতে পারিনে, 'নৈয়ায়িক' যুক্তিতে তাদের প্রমাণ করা যায় না, তাদের প্রতিভান সাহায্যে জানতে হবে। বাস্তব পরিস্থিতি বিষয়ে যাদের মর্ম-দৃষ্টি নেই, সেই সব যুক্তিবাদী বিচারকদের রাজনীতিবিদরা নিন্দা করে থাকেন। শিক্ষাতত্ত্ববিদগণ শিক্ষার্থীর মধ্যে বোধি বা প্রাতিভানিক-বৃত্তি উদ্বোধিত করার জন্যই বেশী জোর দিতে বলে থাকেন ; শিল্প-সমালোচকরা শিল্প সমালোচনাকালে সূত্র-তত্ত্ব সব পাশে সরিয়ে রাখেন এবং প্রত্যক্ষ উপলব্ধি বা প্রতিভান দিয়ে

বিচার করার কথা বলে থাকেন। বিষয়ী লোকরা যুক্তির চেয়ে অন্তঃকরণের সহজ প্রবৃত্তিকে মেনেই জীবনযাত্রা নির্বাহ করে থাকেন।

কিন্তু সাধারণ জীবনে প্রাতিভানিক জ্ঞানকে যথেষ্ট স্বীকৃতি দেওয়া হ'লেও, তত্ত্বের এবং দর্শনের ক্ষেত্রে ততখানি স্বীকৃতি দেওয়া হয় না। নৈয়ায়িক জ্ঞানের আলোচনার জন্য অতি প্রাচীন এবং সর্বজনস্বীকৃত শাস্ত্র রয়েছে, তার নাম ন্যায়শাস্ত্র (লজিক), কিন্তু প্রাতিভানিক জ্ঞান আলোচনা করার শাস্ত্র সম্ভব এ কথা ভয়ের এবং সংকোচের সঙ্গে দু' একজন স্বীকার করে থাকেন। নৈয়ায়িক জ্ঞানই বেশী ভাগ দখল করে আছে। তার সঙ্গীকে একেবারে মেরে বা খেয়ে না ফেল্লেও, অতি অনিচ্ছায় তাকে দাসী বা দারোয়ানের নগণ্য পদ দিয়ে রেখেছে। নৈয়ায়িক জ্ঞানের আলো ব্যতীত প্রতিভানিক জ্ঞানের মূল্য কী? সে তো তা' হ'লে প্রভুহীন ভৃত্য। প্রভুর কাছে ভৃত্য প্রয়োজনীয় হতে পারে কিন্তু ভৃত্যের প্রভু থাকা চাই-ই চাই, কারণ প্রভুই তো তাকে জীবিকা দিয়ে বাঁচিয়ে রাখে। প্রতিভান অন্ধ, বুদ্ধি তাকে দৃষ্টি ধার দেয়।

* * এর পরে ক্রোচে দেখাতে চেয়েছেন—প্রাতিভানিক জ্ঞান নৈয়ায়িক জ্ঞান থেকে—স্বতন্ত্র, তার নিরপেক্ষ অস্তিত্ব রয়েছে। তিনি বলছেন—"এখন এই কথাটা প্রথমেই মনে গেঁথে রাখতে হবে যে প্রাতিভানিক জ্ঞানের কোন প্রভুর প্রয়োজন নেই, কারো উপরে নির্ভর করারও প্রয়োজন নেই। অপরের চোখ ধার করবার কোন আবশ্যকতাই নেই; কারণ তার নিজেরই সুন্দর চোখ রয়েছে। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে এমন এমন সংজ্ঞা রয়েছে যার সঙ্গে প্রতিভান মিশ্রিত হ'য়ে আছে। কিন্তু এমনও সব প্রতিভান আছে যার সঙ্গে ঐ মিশ্রণের লেশমাত্রও নেই এবং তা'তে এই প্রমাণিত হয় যে মিশ্রণ অপরিহার্য নয়। চিত্রকরের আঁকা চন্দ্রালোকের দৃশ্য, রেখাঙ্কন শিল্পীর আঁকা কোন একটি দেশের রূপ-রেখা, সংগীতের একটি করুণ অথবা উদ্দীপক সুর, উচ্ছ্বাসময় গীতিকবিতার শব্দগুলি, অথবা লৌকিক ব্যবহারে যে সব শব্দ আমরা জিজ্ঞাসায় আদেশে বা বিলাপে প্রয়োগ করে থাকি—এ সমস্তই প্রাতিভানিক ব্যাপার এবং যার মধ্যে বুদ্ধি-সম্পর্কের ছায়াটুকুও নেই। তবে, এই দৃষ্টান্তগুলির সম্বন্ধে যে, যাই মনে করুন, আর এ কথাও স্বীকার করে নেওয়া গেলেও যে সভ্য

মানুষের অধিকাংশ প্রতিভান সংজ্ঞাগর্ভিত, পক্ষে আরো অনেক গুরুতর এবং বড় যুক্তির কথা বলার আছে। যে সমস্ত সংজ্ঞার সঙ্গে প্রতিভান মিশ্রিত এবং ওতপ্রোতভাবে মিলিত হয়ে থাকে, সেই সমস্ত সংজ্ঞা বা সামান্য বচনকে আর সংজ্ঞা বলা চলে না, কারণ তারা সব স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে ফেলে। আগে তারা সংজ্ঞা ছিল বটে, কিন্তু—এখন তারা প্রতিভানের উপাদানে পরিণত। ট্র্যাজেডির বা কমেডির চরিত্রের মুখে যে দার্শনিক তত্ত্বকথা বসানো হয়, তা' সংজ্ঞার নিজের স্বরূপ ব্যক্ত করে না, চরিত্রের চরিত্র বৈশিষ্ট্যকেই ব্যক্ত করে ; যেমন কোন বর্ণালিপ্ত মুখের লাল রং, পদার্থতত্ত্ববিদের পরীক্ষার লালরং নয়—চিত্রেরই বিশেষ উপাদান মাত্র। অঙ্গী হচ্ছে সেই যে অঙ্গের ধর্ম নিয়ন্ত্রিত করে। কোন শিল্পকর্ম দার্শনিক সংজ্ঞায় পূর্ণ হ'তে পারে, প্রচুর পরিমাণে তা'তে ঐ সব সংজ্ঞা থাকতে পারে এবং দার্শনিক নিবন্ধের, বক্তব্যের চেয়েও হয়তো সেই সব কথা গভীরতর হ'তে পারে—অন্যপক্ষে, দার্শনিক নিবন্ধে বর্ণনার এবং প্রতিভানের প্রাচুর্য থাকতে পারে। কিন্তু ঐ সব সংজ্ঞা-প্রাচুর্য থাকা সত্ত্বেও, শিল্পের সামগ্রিক পরিণাম হ'চ্ছে—প্রতিভান এবং প্রতিভান-প্রাচুর্য থাকা সত্ত্বেও দার্শনিক নিবন্ধ সামগ্রিক পরিণামে একটি সামান্য বচন বা সংজ্ঞা। "প্রোমেস্‌সি স্পোসি"তে প্রচুর নীতিবচন এবং নৈতিক উদ্দেশ্য ব্যক্ত হয়েছে, কিন্তু তা' হ'য়েছে ব'লেই, গল্প বা প্রতিভান হওয়ার বৈশিষ্ট্য সে হারায়নি। তেমনি দার্শনিকের রচনায় অনেক গল্প এবং ব্যঙ্গোক্তি পাওয়া গেলেও—যেমনটি শোপেনহাওয়ারে পাওয়া যায়—ঐ রচনাকে মননাত্মক গ্রন্থ হওয়ার গৌরব থেকে তা বঞ্চিত করে না। বৈজ্ঞানিক রচনা এবং শিল্পীর রচনার মধ্যে—অর্থাৎ মনন ব্যাপার এবং প্রতিভান ব্যাপারের মধ্যে পার্থক্য, রচয়িতা কোন্ সামগ্রিক ফল পেতে চেষ্টা করেছেন তার মধ্যেই নিহিত থাকে। ঐ সামগ্রিক পরিণামটিই বিভিন্ন অঙ্গ বা অংশকে নিয়ন্ত্রিত করে ; ভিন্ন ভিন্ন অংশ বিচ্ছিন্ন বা স্বতন্ত্রভাবে পরিণামকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারে না।"

** প্রাতিভানিক জ্ঞানের নিরপেক্ষ অস্তিত্ব প্রমাণ করার পরে ক্রোচে প্রতিভান ব'লতে ঠিক কি বুঝায় তা' ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করেছেন এবং

প্রথমেই প্রতীতির (পারসেপ্‌শান) সঙ্গে প্রতিভানের ঐক্য ও পার্থক্য নির্দেশ করেছেন।

এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন—"সংজ্ঞা বা সামান্য বচন থেকে প্রতিভান স্বতন্ত্র ও স্বাধীন—এ কথা স্বীকার করাই প্রতিভানের সত্য ও নির্দিষ্ট ধারণা করার পক্ষে যথেষ্ট নয়। যাঁরা এ কথা স্বীকার করেন অথবা যাঁরা প্রতিভানকে বুদ্ধি—নির্ভর ব'লে প্রকাশ্যে কিছু বলেন না, তাঁরাও অনেক সময় প্রতিভানের স্বরূপ বুঝে উঠতে না পেরে ভুল করে বসেন। প্রতিভান ব'লতে প্রায়ই 'প্রতীতি' (পারসেপ্‌শান) অথবা বাস্তব কোন সত্তার জ্ঞান—বস্তু রূপে কোন কিছুর ধারণা বুঝায়।

নিশ্চয়ই—প্রতীতি প্রতিভানই বটে। যে ঘরে বসে আমি লিখছি আমার সামনে যে দোয়াত ও কাগজ রয়েছে, যে কলম দিয়ে লিখছি, যে সমস্ত বস্তুকে আমি স্পর্শ করছি এবং লেখার সময় ব্যবহার করছি—তারা সবাই প্রতিভান। কিন্তু আমার মাথার মধ্যে এই আমারই অন্য ঘরে বসে লেখার, অন্য সহরে বসে লেখার, ভিন্ন কাগজে কলমে ও কালিতে লেখার যে ছবি ফুটে উঠছে, সেও প্রতিভান। এর তাৎপর্য দাঁড়াচ্ছে এই যে প্রতিভানের স্বরূপ নির্ধারণে বাস্তবতা-অবাস্তবতার বিচার অনাবশ্যক এবং অবান্তর। ধরা যাক, কোন মানুষের মনে প্রথম প্রতিভান ব্যাপার ঘটছে; দেখা যাবে বাস্তব বস্তুই প্রথম প্রতিভাত হ'চ্ছে, অর্থাৎ বাস্তব বস্তু ছাড়া অন্য কিছুরই প্রতীতি সম্ভব হ'চ্ছে না। কিন্তু যেহেতু বাস্তব সত্তার জ্ঞান, সত্যপ্রতিরূপ এবং মিথ্যা প্রতিরূপের পার্থক্য—চেতনার উপরে নির্ভর করে এবং যেহেতু ঐ পার্থক্যচেতনা জ্ঞানের প্রথম মুহূর্তে থাকে না, ঐ প্রতিভানগুলি আসলে বাস্তবের বা অবাস্তবের প্রতিভান—প্রতীতির প্রতিভান হবে না, হবে—বিশুদ্ধ প্রতিভান। যেখানে সবই বাস্তব সেখানে বাস্তব বলে কিছু নেই। এই অবস্থার অতি অস্পষ্ট ধারণা এবং দূর সাদৃশ্য পাওয়া যায় সেই শিশুর দৃষ্টান্তে যে শিশু সত্য থেকে মিথ্যাকে পৃথক করতে পারে না, গল্প থেকে ইতিহাসকে পৃথক করতে পারে না। প্রতিভান হ'চ্ছে বাস্তবের প্রতীতি এবং সম্ভাব্যের সরল প্রতিরূপের অবিচ্ছিন্ন ঐক্য। প্রতিভান-

ব্যাপারে, আমরা লৌকিক সত্তার অধিকারী হিসাবে বাহ্যিক সত্তার সঙ্গে কোনরূপ বুঝাপড়া করতে চাইনে, আমরা শুধু প্রত্যয়রাজিকে—সে যে প্রত্যয়ই (impression) হোক না কেন,—রূপ দিতে চাই।"

* * * এর পরে, ক্রোচে প্রতিভানের সঙ্গে দেশ-কালের সম্পর্ক সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন এবং দেখাতে চেষ্টা করেছেন—দেশ-কালের সঙ্গে অনেক প্রতিভানের সংযোগ থাকলেও, দেশ-কাল নিরপেক্ষ প্রতিভানও সম্ভব। এ প্রসঙ্গে ক্রোচের বক্তব্য এই :—

"মনে হতে পারে, যাঁরা মনে করেন—প্রতিভান হচ্ছে দেশে-কালে আকৃত এবং বিন্যস্ত সংবেদন (সেনসেশান্), তাঁরা অনেকটা সত্যের কাছেই পৌঁচেছেন। তাঁরা বলেন—দেশ এবং কাল প্রতিভানের আধার, প্রতিভান করতে গেলেই বিষয়কে দেশ-কালের আধারে স্থাপনা করতে হবে। তা' হ'লে প্রাতিভানিক ব্যাপার হবে আসলে দেশের ও কালের—এই দুই সত্তার যুগপৎ সংযোগের ফল। প্রতিভানমিশ্র বৌদ্ধিক ক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে যা' বলা হয়েছে এই দুই, দেশ-কাল প্রক্রিয়া (ক্যাটিগরী) সম্বন্ধেও সেই একই কথার পুনরাবৃত্তি করতে হবে। দেশ-নিরপেক্ষ এবং কাল-নিরপেক্ষ প্রতিভান সম্ভব। আকাশের রং, বিশেষ আবেগের বর্ণ, আর্তনাদ এবং ইচ্ছাশক্তির চেষ্টা চেতনায় যখন রূপ নিয়ে উপস্থিত হয়, তখন আমরা সেই সব প্রতিভানকেই পাই, যাদের সৃষ্টির সঙ্গে দেশ-কালের কোন সম্বন্ধই নেই। কোন কোন প্রতিভানে, দেশ-চেতনা বা দৈশিকতা (spatiality) থাকে কিন্তু কাল-চেতনা বা কালিকতা (temporality) থাকে না, আবার কোন কোন প্রতিভানে বিপরীত অবস্থাও দেখা যায়; আবার যেখানে উভয়ই থাকে, সেখানেও পরবর্তী চিন্তার সাহায্যে তাঁদের উপলব্ধি করতে হয়। প্রতিভানের মধ্যে অন্যান্য উপাদান যেমনভাবে মিশে থাকে, তারাও প্রতিভানের সঙ্গে তেমনিভাবে মিশে থাকতে পারে। অর্থাৎ, তারা প্রতিভানের মধ্যে উপাদান হিসাবে (মেতিরিয়েলিতের) থাকতে পারে, প্রতিভানের আধার (ফর্মালিতের) হতে পারে না—উপাদান হতে পারে, নিমিত্ত বা আয়োজক হতে পারে না। চিন্তা এসে ধ্যান ভঙ্গ না করা

পর্যন্ত, কে চিত্র বা দৃশ্য দেখার সময় দেশের কথা ভাবে? কে, ঐরূপ চিন্তা এসে ধ্যান ভঙ্গ না করা পর্যন্ত, গল্প বা গান শুনতে শুনতে কালিক পারম্পর্যের কথা ভাবতে যায়? শিল্পকর্মে প্রতিভান কোন দেশ-কালকে ব্যক্ত করে না, করে চরিত্রকে (ক্যারেকটার), বিশেষ অবয়ব বা রূপকে (ইণ্ডিভিজুয়াল ফিজিয়োগনমী)। যে ধারণা এখানে ব্যক্ত করা হ'লো আধুনিক দার্শনিকদের অনেকেরই তা অভিমত। দেশ এবং কালকে পারমার্থিক সত্তা ব'লে স্বীকার করা দূরে থাকুক, আজকাল অনেকেই দেশ-কালকে বুদ্ধিগঠিত জটিল বস্তু ব'লে মনে করে থাকেন। তারপর, এমন কি যাঁরা দেশ-কালের সংগঠনে ধর্ম, 'ক্যাটিগোরী'ত্ব প্রভৃতি ধর্ম একেবারে অস্বীকার করেন না, তাঁদেরও মধ্যে দেখা যায়, কেউ কেউ দু'টিকে এক করবার চেষ্টা করেছেন এবং সাধারণতঃ এই দুই ক্যাটিগোরিকে যে-ভাবে দেখা হয়ে থাকে তা থেকে ভিন্ন ভাবে দেখতে চেষ্টা করেছেন। কেউ কেউ প্রতিভানকে একমাত্র দেশসাপেক্ষ ব্যাপার প্রতিপন্ন করেন এবং বলেন—এমন কি সময়কে প্রতিভাত করতেও দেশ অপেক্ষিত। অন্যেরা দেশের ত্রিমান—বিভাগকে দর্শনের দিক থেকে অনাবশ্যক ব'লে মনে করেন এবং দেশকে অখণ্ডিত এবং উপাধি-মুক্ত বলে বিবেচনা করে থাকেন। কিন্তু কী সেই নির্বিশেষ দৈশিক সত্তার স্বরূপ যা কালকেও ধারণ বা সৃষ্টি করে থাকে? সব সমালোচনা ও খণ্ডনের পরে যা থাকছে তা' হচ্ছে—প্রাতিভানিক ক্রিয়ার অস্তিত্বের চাহিদা। কিন্তু এই ব্যাপারটির প্রকৃতি ঠিকভাবে নিরূপণ করতে গেলে এবং তা'তে একটিমাত্র ধর্ম আরোপ করতে গেলে এই দেখা যাবে না কি যে ব্যাপারটি দেশে-কালে স্থাপনা করার অর্থাৎ দৈশিকী-করণ (স্পেটিয়ালাইজিং) বা কালিকীকরণ (টেম্পোরালাইজিং) ক্রিয়া নয়। ব্যাপারটি আসলে ব্যক্তীকরণ (ক্যারাকটারাইজিং?)। অথবা ব্যাপারটিকে স্বতন্ত্র বৃত্তি বা ।টিগোরী হিসাবে দেখলে, যে বৃত্তি আমাদের বস্তুকে তার বাস্তব সত্তায় এবং বিশিষ্টরূপে জ্ঞানগোচর করায় সেই বৃত্তি বলে মনে করতে হবে না কি?''

* * দেশ-কালের সঙ্গে প্রতিভানের সম্পর্ক নির্ধারণ করার পরে, ক্রোচে প্রতিভানের সঙ্গে সংবেদনের (সেন্‌সেশান) পার্থক্য নিয়ে আলোচনা

করেছেন। তিনি বলছেন :—"প্রাতিভানিক জ্ঞানকে বৌদ্ধিক ব্যাপার থেকে এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক ও বাহ্যিক ব্যাপার থেকে মুক্ত করার পরে, এবার তাকে আমরা ব্যাখ্যা করব এবং অন্য একটি দিকে তার সীমা নির্ধারণ করব এবং ভিন্ন এক রকমের আক্রমণ ও ভ্রান্তি থেকে তাকে রক্ষা করতে চেষ্টা করব। এর নীচুর দিকের সীমানায় রয়েছে—সংবেদন, নিরাকার বস্তু—যে বস্তুকে আত্মা (স্পিরিট) কখনই বিশুদ্ধ বস্তুরূপে জানতে পারে না। জানতে পারে শুধু তখনই যখন তাকে আকার দিতে পারে—তা' আকার নিয়ে চেতনায় দেখা দেয়। তবে সীমা নির্দেশ করবার জন্য ঐরূপ কোন বস্তু কল্পনা করে নেয়। প্রকৃতি তার নির্বিশেষ রূপে—জড়তা, যান্ত্রিকতা। সে হচ্ছে তই যা মানুষের চেতনাকে যাতনা দেয়, কিন্তু যাকে মানুষ সৃষ্টি করে না। তাকে বাদ দিয়েও কোন জ্ঞান বা ক্রিয়া সম্ভব নয়। তবে শুধু প্রকৃতি পশুত্বকে—মানুষের মধ্যে যা' নিষ্ঠুর এবং আবেগমত্ত তাকে, জন্ম দিয়ে থাকে; চৈতন্যের জগৎ—মানুষের জগৎ তা' নয়। কত সময়েই না আমরা, আমাদের আত্মার মধ্যে কি ঘটছে তা' স্পষ্ট করে জানবার জন্য চেষ্টা করে থাকি। কোন কিছুর অস্পষ্ট আভাস আমরা পাই, কিন্তু মনের কাছে স্পষ্ট রূপ বা আকার নিয়ে তা উপস্থিত হয় না। ঐ সব মুহূর্তেই আমরা বস্তু-প্রকৃতির ও আকারের নিগূঢ় পার্থক্য উপলব্ধি করতে পারি। তারা আমাদেরই পরস্পর বিরুদ্ধ দু'টি কাজ নয়। একটি আমাদের বাইরে এবং বাইরে থেকে আমাদের উপরে হামলা করছে, আমাদের পদস্খলন ঘটাচ্ছে; অন্যটি আমাদের ভিতরে থেকে বাইরের বস্তু-নিচয়কে আত্মসাৎ করতে এবং বস্তুর আকারের মত আকার গ্রহণ করতে চেষ্টা করছে। বস্তু-প্রকৃতি আকার দ্বারা পরিচ্ছন্ন ও বিজিত হ'লে তবেই বিশিষ্ট আকার লাভ করে। বস্তু-প্রকৃতিই—আধেয়-ই (কনটেণ্ট) এক প্রতিভান থেকে অন্য প্রতিভানকে পৃথক করে। আকার নিত্য—আত্মিক ক্রিয়া বিশেষ, আর বস্তু পরিবর্তনশীল। বস্তু না থাকলে আত্মিক ক্রিয়া তার নির্বিশেষত্ব পরিহার করে সবিশেষ হ'তো না—প্রকৃত ক্রিয়ায়,—ভিন্ন ভিন্ন মানসিক সামগ্রীতে—ভিন্ন ভিন্ন প্রতিভানে—পরিণত হ'তো না।

খুবই আশ্চর্যের বিষয় এবং আমাদের যুগেরই বৈশিষ্ট্য বলতে হবে, যে এই

আকার, আত্মার এই বিশেষ ক্রিয়াটি যা' একান্তই আমাদের, প্রায়শই উপেক্ষিত এবং অস্বীকৃত হয়ে থাকে। কেউ কেউ মানুষের আত্মিক ক্রিয়াকে, যান্ত্রিকতাময় ও বিজাতীয় প্রাকৃতিক ব্যাপারের সঙ্গে এক করে ফেলেন। কেউ কেউ বলেন যে তাঁরা কখনও তাঁদের মধ্যে ঐ জাতীয় কোন "রহস্যময়" (মিরাকুলাস) ব্যাপার লক্ষ্য করেন নি। যেন ঘর্মাক্ত হওয়া এবং চিন্তা করা, শীত বোধ করা এবং ইচ্ছার উদ্দীপনা, এই দু'য়ের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই বা থাকলেও তা শুধু মাত্রাগত পার্থক্য। অন্যেরা অবশ্য আরো বড় যুক্তির সাহায্যে, চৈতন্যক্রিয়া ও যান্ত্রিকতাকে, স্বভাবে সতন্ত্র-হওয়া সত্ত্বেও, আরো বড় সামান্য সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত ক'রে এক করবার চেষ্টা করবেন। ঐরূপ একীকরণ সম্ভব কি না এবং কোন অর্থে সম্ভব—এ প্রশ্নের বিচার থেকে এখন নিবৃত্ত হওয়া যাক। তবে ঐ দুটোকে মেলানোর চেষ্টা করলেও করা যেতে পারে এ কথা স্বীকার ক'রে নিলেও, এ কথা খুবই স্পষ্ট যে দু'টি ধারণাকে তৃতীয় ধারণার অধীনে একীকরণ করার অর্থ, প্রথমেই ঐ দুটি ধারণার পার্থক্য স্বীকার ক'রে নেওয়া। পার্থক্য আছে—এইটুকু স্বীকার ক'রে নিলেই যথেষ্ট এবং আমরা নিশ্চিন্ত।

* * এরপর ক্রোচে প্রতিভান এবং ভাবানুষঙ্গ (এসোসিয়েশান) সম্পর্ক সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। এ বিষয়ে তাঁর বক্তব্য এই :—"প্রতিভানকে কখনো কখনো, প্রাথমিক সংবেদনের সঙ্গে এক করে দেখা হয়েছে। কিন্তু, যেহেতু এই ভুলটি প্রত্যক্ষ বাধের দ্বারা সঙ্গে সঙ্গে নিরস্ত হয়, সেই জন্য একে প্রায়ই সূক্ষ্ম পরিভাষার দ্বারা আচ্ছাদিত করা হয়ে থাকে এবং সেই পরিভাষা একদিকে যেমন বিভ্রান্ত করে, অন্যদিকে তেমনি উভয়ের পার্থক্যও নির্দেশ করে। বলা হয়েছে—প্রতিভান সংবেদন বটে তবে প্রাথমিক বা সরল সংবেদন নয়, ভাবানুষঙ্গী সংবেদন। এখানে 'ভাবানুষঙ্গ' (এসোসিয়েশান) শব্দটির মধ্যে দুটি অর্থ লুকিয়ে আছে। 'ভাবানুষঙ্গ' এক অর্থে—স্মৃতি,—স্মরণসহায় সমানুবন্ধন,—সংজ্ঞান স্মরণ বুঝায় এবং তা' হ'লে যা' প্রতিভাত হয়নি, বিশিষ্টতা পায়নি, আত্মার দ্বারা গৃহীত হয়নি এবং চৈতন্য দ্বারা সৃষ্ট হয়নি, সেই সব উপাদানকে স্মৃতির মধ্যে একত্রীকরণ করার দাবী, সম্ভব ব'লে ধারণা করা

যায় না। আর অন্য অর্থে বুঝায় নির্জ্ঞান বিষয়ের সমানুবন্ধন এবং তা' ধরলে, আমরা সংবেদনের এবং প্রকৃতির রাজ্যেই পড়ে থাকি। তবে যদি কোন কোন ভাবানুষঙ্গ-বাদীর সঙ্গে এক হয়ে আমরা ভাবানুষঙ্গ, বলতে স্মরণ বা সংবেদন-প্রবাহ না বুঝে, সৃজনধর্মী সমানুবন্ধন (সংগঠনধর্মী, নির্মাণশীল, বিশেষীকরণধর্মী) বুঝি তা' হলে আমাদের বক্তব্যই স্বীকৃত হয়, শুধু তার নামটি অস্বীকার করা হয়। কারণ সৃজনশীল ভাবানুষঙ্গ প্রত্যক্ষবাদীরা যে অর্থে ভবানুষঙ্গ শব্দটি প্রয়োগ করেন, সেই অর্থ আর বহন করে না, সংশ্লেষণের (সিন্‌থেসিস্) সঙ্গে সে একার্থক, অর্থাৎ সে আত্মিক ব্যাপার। সংশ্লেষণকে সমানুবন্ধন বলা যেতে পারে। কিন্তু সৃজনধর্মী বিশেষণ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই জড়তার ও ক্রিয়াশীলতার, সংবেদনের ও প্রতিভানের ভিতরকার পার্থক্য নির্দেশিত হয়ে গেছে।"

* * ক্রোচের পরবর্তী আলোচ্য বিষয়—প্রতিভান ও রূপোদ্‌বোধন বা উপস্থাপন (রিপ্রেজেন্টেশান)। এ বিষয়ে তাঁর বক্তব্য এই:—"অন্যান্য মনস্তত্ত্ববিদরা, সংবেদনও নয় আবার বুদ্ধিকৃত সংজ্ঞাও নয় এমন একটি বিষয় কল্পনা করে থাকেন। বিষয়টি হচ্ছে—রূপোদ্‌বোধন বা প্রতিরূপ। তাঁদের ঐ রূপোদ্‌বোধন বা প্রতিরূপের সঙ্গে আমাদের প্রাতিভানিক জ্ঞানের পার্থক্য কোথায়? সর্বত্রই আছে অথবা কোথাও নেই। কারণ, রূপ-উপস্থাপন শব্দটি দ্ব্যর্থক শব্দ। যদি রূপ-উপস্থাপন ব'লতে এমন কিছু বুঝায় যা' সংবেদনরূপ মানসিক ব্যাপার থেকে বিচ্ছিন্ন ও স্বতন্ত্র তা' হ'লে রূপ-উপস্থাপন প্রতিভানই বটে। আর যদি এই বুঝায় যে উপস্থাপন হ'চ্ছে যৌগিক সংবেদন, তা' হ'লে আমরা আবার সেই স্থূল সংবেদনের স্তরে গিয়ে দাঁড়ালাম।

কারণ, তার দৈন্যের বা প্রাচুর্যের মাত্রা অনুসারে অথবা কোন্ অতি প্রাথমিক দেহে কিংবা অত্যুন্নত এবং অতীত সংবেদনের স্মৃতিরেখায়-পূর্ণ দেহের মধ্যে তার উৎপত্তি হ'য়েছে তার হিসাব অনুসারে তার মধ্যে কোন গুণগত পরিবর্তন ঘটে না। তারপর উপস্থাপনকে সংবেদনের তুলনায় *দ্বিতীয় পর্যায়ের মানসিক ব্যাপার বল্‌লেও ভ্রান্তির নিরসন হয় না। দ্বিতীয়*

পর্যায় বলতে কি বুঝায়? গুণগত, রূপগত পার্থক্য বুঝায় কি? যদি তাই হয় তবে উপস্থাপন সংবেদনের বিস্তার সাধন, অতএব—প্রতিভান। অথবা উপস্থাপন ব'লতে আরো জটিলতা বা যৌগিকতা, মাত্রাগত—বস্তুগত পরিবর্তন, বুঝায় কি? তা' হ'লে—প্রতিভানকে প্রাথমিক সংবেদনের সঙ্গে এক করে ফেলা হয়।"

* * এরপর ক্রোচে প্রতিভান ও প্রকাশনের (এক্স্‌প্রেশান) সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং দেখাতে চেয়েছেন প্রতিভান ও প্রকাশন মূলতঃ একই ব্যাপার। ক্রোচে বলেন—"অবশ্য বিশুদ্ধ প্রতিভানকে—যথার্থ উপস্থাপনাকে—অযথার্থ প্রতিভান থেকে, যান্ত্রিক, জড় প্রাকৃতিক ঘটনা থেকে আত্মিক ব্যাপারকে, পৃথক করার অব্যর্থ উপায় আছে। প্রত্যেক খাঁটি প্রতিভান বা উপস্থাপন প্রকাশনও বটে। যা' রূপ নিয়ে ব্যক্ত বা প্রকাশিত না হয় তা' প্রতিভান বা উপস্থাপন নয়। সৃষ্টি, নির্মাণ এবং প্রকাশ করার ভিতর দিয়েই আত্মা প্রতিভান করতে পারে। প্রকাশন থেকে প্রতিভানকে যিনি একবার পৃথক করেন, আর তাদের এক করতে পারেন না।

প্রাতিভানিক ক্রিয়ার মধ্যে সেই পরিমাণেই প্রতিভান থাকে যে পরিমাণে সে তাদের প্রকাশ বা ব্যক্ত করতে পারে। বিরোধাভাস ব'লে এ কথা মনে হ'তে পারে, তার আংশিক কারণ এই যে, সাধারণতঃ 'প্রকাশন' শব্দটিকে অতি সংকীর্ণ অর্থে ব্যবহার করা হ'য়ে থাকে। শুধু বাচনিক প্রকাশনের সংকীর্ণ অর্থেই শব্দটিকে সাধারণতঃ ব্যবহার করা হয়। কিন্তু অবাচনিক প্রকাশনও আছে যেমন, রেখা, বর্ণ, শব্দ দ্বারা প্রকাশ। এদের প্রত্যেকটিকেই প্রকাশন ব'লে স্বীকার করতে হবে। মানুষ বক্তারূপে, গায়করূপে, চিত্রকর রূপে অথবা যে-কোন রূপেই ব্যক্ত করুক, সব অভিব্যক্তিই এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে। চৈত্রিক অথবা বাচনিক অথবা সাংগীতিক অথবা যে-কোন রূপেই ব্যক্ত হো'ক, কোনও প্রকাশনই প্রতিভানশূন্য হ'তে পারে না। বস্তুতঃ প্রকাশন প্রতিভানের অপরিহার্য অংশ। কি ক'রে আমরা কোন জ্যামিতিক ক্ষেত্রের প্রতিভান পেতে পারি, যতক্ষণে না আমরা তার এমন একটা অতি সুস্পষ্ট প্রতিরূপ মনে পাচ্ছি, যা দেখে আমরা তৎক্ষণাৎ

কাগজে বা ব্লাকবোর্ডে তাকে আঁকতে পারছি? কি করে আমরা কোন প্রদেশের—ধরা যাক সিসিলি দ্বীপের—বহিঃসীমারেখার প্রতিভান পেতে পারি, যদি না আমরা তার সমস্ত রেখাবৈচিত্র্যসহ তাকে আঁকতে সক্ষম হই? মনের ভিতরকার প্রত্যয় ও আবেগকে রূপ দিতে সমর্থ হ'লে—অবশ্য সমর্থ হ'লেই তবে—মনে যে উদ্‌ভাসন ঘটে, তার অভিজ্ঞতা সকলেরই আছে। তখন অন্তর্নিহিত প্রত্যয় বা আবেগ শব্দের আশ্রয়ে আত্মার অন্ধকার প্রদেশ থেকে, চৈতন্যের আলোকিত প্রদেশে এসে উপনীত হয়। জ্ঞান প্রক্রিয়ায় প্রকাশন থেকে প্রতিভানকে পৃথক করা অসম্ভব। একটির সঙ্গে অন্যটি যুগপৎ উপস্থিত হয়, কারণ তারা দুই নয়, একই ব্যাপার।"

** এই আলোচনার প্রসঙ্গেই, কেন দু'টোকে পৃথক ব'লে ভুল করা হয় তা' নিয়ে আলোচনা করেছেন—বলেছেন—"আমরা যা বলেছি তা' যে বিরোধাভাস ব'লে মনে হ'য়েছে তার প্রধান কারণ হ'চ্ছে, বাস্তব জগতের প্রকৃত প্রতিভান না হওয়া সত্ত্বেও আমরা মনে করি প্রকৃত প্রতিভান হ'য়েছে—এই ভ্রান্তিটি বা মিথ্যা সংস্কারটি। অনেক সময়েই লোকের মুখে এমন কথা শোনা যায় যে তাদের মনের মধ্যে অনেক বড় বড় চিন্তা রয়েছে, কিন্তু তারা তা' প্রকাশ ক'রতে পারছেন না। বাস্তবিকই তা' যদি থাকতো, তা' হ'লে অবশ্যই তাঁরা তাঁদের সুন্দর সুশ্রাব্য ভাষায় পরিণত ক'রতে তথা প্রকাশ করতে পারতেন।

যদি প্রকাশ করতে গেলে ঐ সব চিন্তা উবে যায় অথবা সংখ্যায় অল্প হ'য়ে যায়, তবে বুঝতে হবে যে ঐ সব চিন্তা আদৌ ছিল না বা থাকলেও অতি স্বল্পই ছিল। সকলে মনে করে, আমরা সাধারণ যারা আছি তাদের প্রত্যেকেই চিত্রকরের মতো দেশ, মূর্তি এবং দৃশ্যাবলী এবং ভাস্করের মতো দেহ-ভঙ্গিমা কল্পনা এবং প্রতিভান করি, পার্থক্য শুধু যেন এই যে চিত্রকর এবং ভাস্কর জানে কি করে আঁকতে হয়, কি করে মূর্তি বানাতে হয়, আর আমরা ঐ রূপগুলি শুধু মনে মনে অব্যক্ত অবস্থায় বহন ক'রে চলি। তাঁরা বিশ্বাস করেন—যে-কেউ রাফেলের ম্যাডোনাকে কল্পনা ক'রতে পারতো কিন্তু রাফেল রাফেল হ'য়েছিল শুধু পটের উপর ম্যাডোনার মূর্তি

আঁকবার বা কৌশল জানবার জন্যই। এর চেয়ে ভুল ধারণা আর কিছুই হ'তে পারে না। আমরা সাধারণতঃ জগতের যতটুকু প্রতিভান করি তা' অতি সামান্য সামান্য বস্তু। ছোট ছোট প্রকাশ। বিশেষ বিশেষ মুহূর্তে আত্মিক ক্রিয়ার মাত্রা ও গভীরতা বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঐ সব ছোট ছোট প্রকাশ ক্রমশঃ আরো বৃহৎ ও আরো ব্যাপক হ'য়ে থাকে। তারা হ'চ্ছে সেই সব কথা যা' আমরা মনে মনে বলি—আমাদের নীরব মন্তব্য, যেমন—এই একটি মানুষ, এখানে একটি ঘোড়া, এটা ভারী, এটা তীক্ষ্ণ, এ আমাকে আনন্দ দিচ্ছে···প্রভৃতি। আলো ও রঙের এ এক বিশৃঙ্খল মিশ্রণ। ইতস্ততো-বিক্ষিপ্ত রঙের অর্থহীন ছাপের যে চিত্রমূল্য, তার চেয়ে এর চিত্রমূল্য বেশী নয়। সাধারণ জীবনে এই এবং এর চেয়ে বেশী আর কিছুই আমরা পাইনে। এই আমাদের সাধারণ কাজকর্মের ভিত্তি। এ হ'চ্ছে গ্রন্থের সূচীপত্র। বস্তুতে বস্তুতে যে সংকেত (লেবেল) লাগানো রয়েছে তাদেরই আমরা বস্তু মনে করি। এই সূচী ও সংকেত (স্বভাবে প্রকাশই বটে), অল্পস্বল্প প্রয়োজনের এবং কাজের পক্ষে যথেষ্ট। সময়ে সময়ে আমরা সূচী থেকে গ্রন্থের মধ্যে প্রবেশ করি, সংকেত থেকে বস্তুতে, স্বল্প থেকে বৃহত্তর প্রতিভানে এবং বৃহত্তর থেকে বৃহত্তম প্রতিভানে পৌঁছে থাকি। এই প্রবেশ বা যাত্রা সহজ ব্যাপার নয়। যাঁরা শিল্পীর মনস্তত্ত্ব নিয়ে গভীর আলোচনা ক'রেছেন তাঁরা ব'লেছেন—কোন একজন ব্যক্তির প্রতি দ্রুত দৃষ্টিপাত ক'রে শিল্পী যখন তার মূর্তি আঁকবার জন্য, তার যথার্থ ধ্যান বা প্রতিভান ক'রতে চেষ্টা করেন তখন তার ঐ সাধারণ দৃষ্টি যা প্রথমতঃ সুনির্দিষ্ট ও সজীব ব'লে মনে হ'য়েছিল, কোন কাজেই লাগে না। মনের মধ্যে অবশিষ্ট থাকে এমন কয়েকটি অতিবাহ্য বৈশিষ্ট্য যা অনুকরণ করার পক্ষেও যথেষ্ট সহায়ক নয়। যে ব্যক্তির মূর্তি আঁকতে হবে সেই ব্যক্তি শিল্পীর কাছে, আবিষ্কারের প্রতীক্ষায় রয়েছে যে তেমন একটি অনাবিষ্কৃত জগৎ। মাইকেল এঞ্জেলো বলেছিলেন—'কেউ হাত দিয়ে আঁকে না, মাথা দিয়ে আঁকে। লিয়োনার্ডো 'কনভেণ্ট অফ দি গ্রেসেস'-এর প্রধানকে বিস্ময়বিমূঢ় ক'রে দিয়েছিলেন, যখন "শেষ নৈশভোজন"-এর দৃশ্য

আঁকতে এসে তিনি দিনের পর দিন তুলি হাতে ছবির দিকে এক দৃষ্টিতে চেয়ে দাঁড়িয়েছিলেন—পটে তুলির স্পর্শ দেননি। এই মনোভাব সম্বন্ধে তিনি মন্তব্য করেছিলেন—বড় বড় শিল্পীর মন আবিষ্কার উদ্‌ভাবনে অতি-সক্রিয় থাকে, যখন তাঁরা বাহ্যতঃ কোন কাজই করেন না।" চিত্রকর চিত্রকর হন, কারণ অন্যেরা যা শুধু অনুভব করেন, যার আভাসটুকু পান, যা দেখেন না, তিনি তা' দেখতে পান। আমরা মনে করি—আমরা একটি স্মিত হাসিকে দেখলাম, আসলে আমরা দেখি না, শুধু একটা অস্পষ্ট ছাপ মনে থাকে—যে সমস্ত বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্যের সংযোগে ঐ হাসির সৃষ্টি সেই বৈশিষ্ট্যগুলি আমরা প্রত্যক্ষ ক'রতে পারিনে। তা' পারেন ঐ চিত্রকর যিনি দেখেন, আবিষ্কার করেন এবং পটের উপর তাকে স্থাপনা ক'রতে পারেন। এমন কি সেই অতি অন্তরঙ্গ বন্ধু যার সঙ্গে প্রতিদিন এবং প্রতি মুহূর্তে বাস করছি, তারও কয়েকটি বিলক্ষণ আকৃতি বৈশিষ্ট্য ছাড়া আর বেশী কিছু আমাদের মনে প্রতিভাত হয় না। সংগীতের ক্ষেত্রে এই ভ্রান্তিটি আরো সহজে এসে থাকে। কারণ, অনেকেই ব'লে থাকেন যে গীতকার নতুন কিছু সৃষ্টি করেন না, শ্রোতার মনে যে রাগ-রাগিণী নিহিত আছে তাতেই শুধু সুরারোপ করে থাকেন। তাঁরা যেন বলতে চান—বিটোফেনের "নাইন্‌থ সিম্ফনি" তাঁর নিজের প্রতিভান নয় এবং তার প্রতিভান 'নাইন্‌থ্ সিম্ফনি' নয়।

নিজের ধনসম্পত্তির প্রাচুর্যের পরিমাণ বুঝতে না পেরে বিমূঢ় হয়েছে যে এমন কোন ব্যক্তিকে যেমন গণিতের সঠিক গণনা মোহমুক্ত করে, তেমনি যে তার চিন্তার ও প্রতিরূপের প্রাচুর্য সম্বন্ধে ঐরূপ মিথ্যা ধারণা পোষণ করে, প্রকাশ ক'রতে বল্‌লেই সে বাস্তবের মুখোমুখি এসে দাঁড়ায়। আগের লোকটিকে বলা হো'ক—গুণে দেখো, পরের লোকটিকে বলা হোক—ব্যক্ত কর, অথবা এই যে পেন্সিল, এঁকে দেখাও, নিজেকে প্রকাশ কর।

বাস্তবিকই আমাদের প্রত্যেকেরই মধ্যে—কবির, ভাস্করের, গীতকারের চিত্রকরের, গদ্য লেখকের অল্পস্বল্প অংশ বা সত্তা র'য়েছে। কিন্তু ঐ সব শিল্পীদের তুলনায় তা' কত অল্প। আর এই কারণেই অল্প যে তাঁরা তাঁদের

মধ্যে অতি অধিক মাত্রায় মানব প্রকৃতির সার্বজনীন ভাব ও আবেগ ধারণ করে আছেন। তারপর কোন একজন চিত্রকর কত অল্পই না কবি-প্রতিভানের অধিকারী। এক চিত্রকরের প্রতিভান থেকে অন্য চিত্রকরের প্রতিভান কতই না পৃথক। সে যাই হোক, যত অল্পই থাক, ঐ অল্পই আমাদের প্রতিভানের বা উপস্থাপনার সম্পদ। ঐটুকু ছাড়া আর যা' তা' হ'চ্ছে—প্রত্যয়, সংবেদন, আবেগ, অনুভব প্রভৃতি অনাত্মিক ব্যাপার—অসমীকৃত বস্তু। ব্যাখ্যার সুবিধার জন্য এগুলি প্রকল্পিত বটে, কিন্তু বস্তুতঃ তারা অসৎ; কারণ সৎ হতে গেলেই আত্মার গোচরীভূত হ'তে হবে।

* * এবার অধ্যায়ের উপসংহার। উপসংহারের সিদ্ধান্ত—প্রতিভান ও প্রকাশন এক। ক্রোচে বলেছেন—"প্রতিভান সম্বন্ধে এ পর্যন্ত যে-সব বিবরণ দেওয়া হ'য়েছে তার সঙ্গে এখন এইটুকু যোগ করা যেতে পারে—প্রাতিভানিক জ্ঞান হ'চ্ছে প্রাকাশনিক জ্ঞান। বৌদ্ধিক ব্যাপার থেকে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র; অন্যান্য উপাধি বিষয়ে—বাস্তবতা ও অবাস্তবতা বিষয়ে, দেশ-কাল-চেতনার ব্যাপারে উদাসীন। আবেগ-অনুভূতি থেকে, সংবেদনের তরঙ্গ বা প্রবাহ থেকে, অথবা মানসিক বস্তু থেকে, প্রতিভান বা উপস্থাপনা পৃথক। তার আকার বা রূপবিশিষ্টতায়, এই আকার (ফর্ম) দেওয়ার—বস্তুকে রূপের বাঁধনে বাঁধার নামই প্রকাশন; প্রতিভান মানেই প্রকাশন এবং প্রকাশন ছাড়া আর কিছু (বেশী বা কম) নয়।"

———

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রতিভান ও শিল্প

এই অধ্যায়ে ক্রোচে প্রধানতঃ প্রতিভানের সঙ্গে শিল্পের যোগ এবং উভয়ের ঐক্য সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। যাঁরা শিল্পকে বিশেষ ধরনের প্রতিভান ব'লে বিশিষ্ট করে তুলতে চান, ক্রোচে তাঁদের মতও খণ্ডন করতে চেষ্টা করেছেন। এই অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয়।

(ক) প্রাতিভানিক জ্ঞান ও শিল্পের ঐক্য।

(খ) বিলক্ষণ পার্থক্য কিছু নেই।

(গ) গভীরতার দিক দিয়েও পার্থক্য নেই।

(ঘ) পার্থক্য শুধু পরিমাণগত।

(ঙ) শৈল্পিক প্রতিভা।

(চ) শিল্পতত্ত্বে—আধেয় ও আধার (বস্তু ও রূপ)।

(ছ) 'প্রকৃতির অনুকরণ'—এই মতবাদের সমালোচনা।

(জ) শিল্প আবেগের অভিব্যক্তি—এই মতের সমালোচনা।

(ঝ) 'শৈল্পিক ইন্দ্রিয়'—সমালোচনা।

(ঞ) শিল্পকর্মের ঐক্য ও অবিভাজ্যত্ব।

(ট) শিল্প মুক্তিদাতা।

একে একে এই বিষয়ের আলোচনায় প্রবেশ করা যাক। ক্রোচে বলছেন—

"আরো অগ্রসর হওয়ার আগে, যা প্রতিষ্ঠিত করা গেল তা থেকে কয়েকটি অনুসিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যাক এবং তার কিছু ব্যাখ্যাও করা যাক।

আমরা স্পষ্ট ভাবেই প্রাতিভানিক বা প্রাকাশনিক জ্ঞান এবং শৈল্পিক কর্ম বা কলাকর্মকে এক ব'লে ঘোষণা করেছি, কলাকর্মকে প্রাতিভানিক জ্ঞানেরই রকমফের বলে মনে করেছি, কলাকর্মে প্রতিভানের ধর্ম এবং প্রতিভানে কলাকর্মের ধর্ম আরোপ করেছি। কিন্তু আমাদের এই ঘোষণায়

অনেক দার্শনিক এই ব'লে আপত্তি করেছেন যে কলাকর্ম সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জাতের প্রতিভান। তাঁরা বলেছেন—স্বীকার করা গেল বটে যে শিল্প হচ্ছে প্রতিভান কিন্তু প্রতিভান হ'লেই তো শিল্প হয় না, শৈল্পিক প্রতিভান, সাধারণ প্রতিভান থেকে বিলক্ষণ ধর্মের জন্য পৃথক।

** ক্রোচে দেখাতে চেয়েছেন—কোন বিলক্ষণ পার্থক্য নেই। তিনি বলেন—"এ পর্যন্ত কেউই সেই বিলক্ষণ ধর্মটি কি তা' নির্দেশ করতে পারেন নি। কোন কোন সময় এরূপ মনে করা হয়েছে যে শিল্প কোন সরল প্রতিভান নয়, বিজ্ঞানের সংজ্ঞাকে যেমন সংজ্ঞার সংজ্ঞা বলা হ'য়ে থাকে, তেমনি শিল্প হ'চ্ছে প্রতিভানের প্রতিভান। অতএব সংবেদনরাজির প্রতিভানের মধ্যে যে সাধারণ প্রতিভানের রূপ দেখা যায়, সেই প্রতিভান করলে মানুষ শিল্পীর স্তরে পৌছবে না। সেই স্তরে পৌছবে তখনই যখন সে প্রতিভানকে রূপায়িত করবার চেষ্টা করবে। কিন্তু কথা হচ্ছে এই যে ঐরূপ কোন দ্বিতীয় শক্তির স্তরে উত্তোলনের ব্যাপার বলে কোন কিছু নেই। এবং সাধারণ বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞার সঙ্গে এর তুলনা করায় কোন অভিপ্রায়ই সিদ্ধ হয় না এবং হয় না এই কারণেই যে বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা হচ্ছে সংজ্ঞার সংজ্ঞা, এ কথা সত্য নয়। যদি ঐ তুলনায় কিছু প্রমাণিত হয়ে থাকে তবে বিপরীতটিই প্রমাণিত হয়েছে। যে কোন সাধারণ সংজ্ঞা যদি উপস্থাপনা না হয়ে যথার্থ সংজ্ঞা হ'য়ে থাকে, তবে তা' তার দৈন্য ও সংকীর্ণতা সত্ত্বেও, খাঁটি সংজ্ঞাই বটে। বিজ্ঞান রূপ-উপস্থাপনের পরিবর্তে সংজ্ঞা সৃষ্টি করে, তুচ্ছ এবং সংকীর্ণ সংজ্ঞার স্থানে বৃহৎ এবং ব্যাপক সংজ্ঞা উদ্‌ভাবন করে—অবিরাম নতুন সম্বন্ধ আবিষ্কার করে চলে। কিন্তু তা'ই বলে, অতি সাধারণ ব্যক্তির মস্তিষ্কে যে প্রক্রিয়ায় অতি ক্ষুদ্র সংজ্ঞা তৈরি হয়, তা' থেকে এর পদ্ধতি পৃথক নয়। যা'কে সাধারণতঃ বলা হয়—খাঁটি শিল্প বা কলাকর্ম তা' সাধারণ প্রতিভান থেকে ব্যাপকতর ও জটিলতর প্রতিভানকে সংগ্রহ করে বটে, কিন্তু ঐ প্রতিভানগুলি সর্বদাই সংবেদন এবং প্রত্যয়ের প্রতিভান। শিল্পকলা প্রত্যয়ের প্রকাশন, প্রকাশনের প্রকাশন নয়।

একই কারণে এ কথা বলা চলে না যে যাকে শৈল্পিক প্রতিভান বলে তা'

সাধারণ প্রতিভান থেকে গভীরতার দিক দিয়ে পৃথক—শৈল্পিক প্রতিভান—গভীরতর বা স্পষ্টতর প্রতিভান (ইন্‌টেন্‌সিভ্‌ ইন্‌টুইশান)। তা' হ'তে পারতো যদি একই বস্তুর উপরে ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে তার প্রয়োগ ঘটতো। কিন্তু যেহেতু শৈল্পিক ব্যাপার বৃহত্তর ক্ষেত্রে পরিব্যাপ্ত হলেও সাধারণ প্রতিভানের প্রক্রিয়া থেকে স্বতন্ত্র কোন কিছু নয়, সেইহেতু. তাদের মধ্যে যে পার্থক্য তা' মাত্রাগত নয়--ব্যাপ্তিগত। অতিসরল প্রেম-গীতির প্রতিভান অথবা হাজার হাজার সাধারণ লোকের মুখ থেকে প্রতি মুহূর্তে যে প্রেমোচ্ছ্বাস নির্গত হচ্ছে, অতি সরল হওয়া সত্ত্বেও তা' স্পষ্টতার বা গভীরতার দিক দিয়ে সম্পূর্ণ; অবশ্য তা' লিওপার্ডির প্রেমসংগীতের যৌগিক প্রতিভানের ব্যাপ্তির তুলনায় খুবই সংকীর্ণ।

তা'হলে পার্থক্য যা' আছে তা পরিমাণগত; সুতরাং. দার্শনিক বিচারের বাইরে। কারণ দর্শন হ'চ্ছে—গুণ-বিচার বিজ্ঞান (সায়েন্‌শিয়া কোয়ালিতেতুম্)। কিছু কিছু লোকের, মনের জটিল অবস্থাকে সম্পূর্ণরূপে ব্যক্ত করাব প্রবণতা এবং অধিকতর নৈপুণ্য আছে; সাধারণ কথায় এঁদেরই লোকে শিল্পী বলে থাকে। খুব অতি জটিল এবং দুঃসাধ্য প্রকাশন অনেক সময় সম্ভব হয় না বটে, কিন্তু এই সব কর্মকেই শিল্পকর্ম বলা হয়ে থাকে। যে সীমা অতিক্রম করলে প্রকাশন বা প্রতিভান শিল্প পদবাচ্য হয়, আর না করতে পারলে অশিল্পপদবাচ্য হয়, তা' ভূয়োদর্শননির্ভর, তা' নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। একটি শ্লিষ্ট বাক্যকে যদি শিল্পকর্ম বলা যায়, তবে একটি শব্দকে বলা যাবে না কেন? একটি গল্প যদি শিল্প হয়, সাংবাদিকের সংবাদ বিন্যাস হবে না কেন? প্রাকৃতিক দৃশ্য যদি হয়, স্থান বর্ণনার নক্‌সা কেন হবে না? মলেয়ারের কমেডির দর্শন—শিক্ষক যথার্থ কথাই বলেছিলেন—"যখনই আমরা কথা বলি আমরা গদ্য সৃষ্টি করি।" কিন্তু মঁশিয়ে জোর্দাঁর (Monsieur Jourdain) মতো পণ্ডিত সর্বকালেই পাওয়া যাবে যারা চল্লিশ বছর ধরে গদ্য বলবেন অথচ জানবেন না যে গদ্য বলছেন, যাঁরা কিছুতেই একথা বুঝতে চাইলেন না যে, তারা যখন চাকরকে চটি জুতো এগিয়ে দিতে বলেন, তখন গদ্যই বলেন এবং গদ্য ছাড়া আর কিছুই বলেন না।

আমরা দৃঢ়ভাবে আমাদের সিদ্ধান্তকে ধরে থাকব ; কারণ যে প্রধান কারণে শিল্পতত্ত্ব—কলা-বিজ্ঞান—শিল্পের সত্যস্বরূপকে ব্যক্ত করতে পারেনি, মানুষের স্বভাবের মধ্যেই যে তার প্রকৃত মূল নিহিত রয়েছে তা' প্রকাশ করতে পারেনি, তা' হ'চ্ছে সাধারণ আত্মিক ব্যাপার থেকে শিল্পকে পৃথক করে রাখা—শিল্পকে অসাধারণ বা স্বতন্ত্র ব্যাপারে পরিণত করা—'অভিজাত মজলিস'-এ পরিণত করা। কেউই শরীরবিজ্ঞান থেকে এ কথা শুনে বিস্মিত হয় না যে প্রত্যেকটি কোষই এক একটা জীব এবং প্রত্যেক জীবই এক বা একাধিক কোষের সংশ্লেষ। ছোট একখণ্ড পাথর যে উপাদানে গঠিত, উচ্চ একটি পর্বতেও সেই একই রাসায়নিক উপাদান দেখে কেউ বিস্মিত হয় না। যেমন ছোট ছোট প্রাণীদের জন্য একরূপ শারীর বিজ্ঞান এবং বড় বড় প্রাণীর জন্য ভিন্ন শারীর বিজ্ঞান নেই তেমনি পাথরখণ্ডের জন্য একরূপ এবং পর্বতের জন্য অন্যরূপ রসায়নতত্ত্ব নেই। সেইরূপ, ক্ষুদ্র এবং সাধারণ প্রতিভানের জন্য এবং বৃহৎ শৈল্পিক প্রতিভানের জন্য কোনরূপ পৃথক বিজ্ঞান নেই। একটিমাত্র শিল্পতত্ত্বই আছে—সে হচ্ছে প্রাতিভানিক জ্ঞানের বিজ্ঞান, প্রাতিভানিক জ্ঞানই শৈল্পিক ব্যাপার। এই বিষয়ে শিল্পতত্ত্ব ন্যায়শাস্ত্রেরই সমগোত্রীয়। ন্যায় শাস্ত্রে থাকে একই প্রকার আত্মিক ব্যাপার—অতি ক্ষুদ্র এবং সাধারণ সংজ্ঞার গঠন থেকে অতিজটিল বৈজ্ঞানিক এবং দার্শনিক তন্ত্রের গঠন।

* * * এর পর ক্রোচে শৈল্পিক প্রতিভার স্বরূপ নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং এই সিদ্ধান্তেই পৌঁচেছেন যে শিল্পীর প্রতিভার সঙ্গে সাধারণ লোকের প্রকাশ শক্তির যে পার্থক্য, তা' কোন গুণগত পার্থক্য নয় ; মাত্রাগত পার্থক্য। ক্রোচে বলেন :--"এ কথাও আমরা মানতে পারিনে যে প্রতিভা কথাটি বা শৈল্পিক প্রতিভা, সাধারণ লোকের অপ্রতিভা থেকে শুধু মাত্রার দিক দিয়ে ছাড়া অন্য কোন দিক দিকে পৃথক। বলা হয়, বড় শিল্পীরা আমাদের আত্মসাক্ষাৎকার ঘটিয়ে থাকেন। কিন্তু কি করে তা সম্ভব হবে যদি না, তাঁদের কল্পনার প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের কল্পনার প্রকৃতি এক হয়,---যদি না পার্থক্য শুধু পরিমাণগত হয়।

"পোয়েতা ন্যসিতুর" না ব'লে 'হোমো ন্যাসিতুর পোয়েতা' বলাই সঙ্গত।

কেউ স্বভাবে বড় কবি কেউ বা ছোট কবি এই যা পার্থক্য। পরিমাণগত পার্থক্যকে গুণগত পার্থক্য ব'লে মনে করাতেই প্রতিভাপূজা এবং তার আনুষঙ্গিক কুসংস্কার দেখা দিয়েছে। ভুলে যাওয়া হয়েছে যে প্রতিভা স্বর্গ-থেকে -খসে-পড়া কোন কিছু নয়, মানুষেরই শক্তি বিশেষ। যে প্রতিভাবান ব্যক্তি নিজেকে মানুষের সংসার থেকে পৃথক বলে ভাণ করে, বা যাঁকে ঐভাবে দেখানোর চেষ্টা করা হয়, সে নিজেকে হাস্যাস্পদ করে শাস্তিভোগ করে। এর দৃষ্টান্ত রোমান্টিক যুগের প্রতিভাবানরা এবং আমাদের যুগের 'অতিমানব'গণ।

এই প্রসঙ্গেই বলা দরকার যে যাঁরা বাহ্যজ্ঞানহীনতাকে শৈল্পিক প্রতিভার প্রধান গুণ বলে মনে করেন তাঁরা শিল্পীকে মানবিকতার অসাধারণ স্তর থেকে অতি নিম্নস্তরে নিক্ষেপ করে থাকেন। শৈল্পিক প্রতিভা, অন্যান্য মানবিক ক্রিয়ার মতোই সংজ্ঞান ব্যাপার; তা যদি না হয়, তবে তা অন্ধ যান্ত্রিকতামাত্র। শৈল্পিক প্রতিভায় শুধু একটিমাত্র বস্তুর অভাব থাকে সে হচ্ছে সেই বিচারাত্মক বা বিকল্পনাত্মক চেতনা—যা দেখা যায় ঐতিহাসিক বা সমালোচকের মধ্যে।

* * * এর পর ক্রোচে শিল্পতত্ত্বের অতিবিসংবাদিত একটি সমস্যা—বস্তু এবং আকার—আধেয় এবং আধার (কনটেন্ট এ্যাণ্ড ফর্ম) সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন।

ক্রোচে বলছেন :—উপাদান ও আকারের—সাধারণতঃ যাঁকে বলা হয়—বস্তু ও রূপ—পারস্পারিক সম্পর্ক, শিল্পতত্ত্বের অতিবিসংবাদিত প্রশ্নগুলির অন্যতম। শৈল্পিক ব্যাপারটি শুধু কি উপাদানাশ্রয়ী? অথবা আকারসর্বস্ব? অথবা উভয়াত্মক? এই প্রশ্নটিকে নানা অর্থে গ্রহণ করা হয়েছে; যথাস্থানে আমরা প্রত্যেকের উল্লেখ করব। কিন্তু আমরা যে অর্থে শব্দ দুটি গ্রহণ করেছি এবং আগেই তার সংজ্ঞা দিয়ে নিয়েছি—তাতে "উপাদান" বলতে বুঝানো হয়েছে—অরূপায়িত আবেগ বা প্রত্যয় এবং "আকার" বলতে—মানসিক ক্রিয়া এবং প্রকাশন। সুতরাং আমাদের মতকে ভুল বুঝবার কোন অবকাশ নেই। অতএব, যে সিদ্ধান্তে শৈল্পিক কর্ম বলতে শুধুমাত্র উপাদান (অর্থাৎ শুধু প্রত্যয়) বুঝায় এবং যে সিদ্ধান্তে শিল্পসৃষ্টি বলতে বস্তু ও রূপের

সংযোগ অর্থাৎ প্রত্যয় ও প্রকাশনের যোগ বুঝায়, সেই উভয় সিদ্ধান্তকেই আমরা পরিহার করব। শিল্প সৃষ্টি ব্যাপারে প্রকাশন ক্রিয়া প্রত্যয়রাজির সঙ্গে যুক্ত হয় না, ঐ সব প্রত্যয়কে আকার দেয় এবং বিস্তারিত করে। পরিস্রুতিযন্ত্রে যে জল ঢালা হয় সে যেমন অন্য দিক দিয়ে একই অথচ ভিন্ন জল রূপে বেরিয়ে আসে, ঠিক তেমনিই প্রত্যয়গুলিই প্রকাশনরূপে পুনরাবির্ভূত হয়। অতএব, শৈল্পিক ব্যাপার হচ্ছে রূপদান এবং রূপদান ছাড়া আর কিছুই নয়।

অবশ্য এ কথার অর্থ এ নয় যে বিষয়বস্তু অনাবশ্যক (বরং বিষয়বস্তুর সীমাচিহ্ন থেকেই প্রকাশনের শুরু), অর্থ এই যে বিষয়বস্তুর ধর্ম থেকে রূপের ধর্মে পৌঁছানোর কোন পথ নেই। অনেক সময় একথা ভাবা হয় যে শিল্পের সামগ্রী অর্থাৎ রূপায়ণযোগ্য হতে গেলে উপাদান বা বিষয়বস্তুর নির্দিষ্ট বা নির্দেশ্য গুণ থাকা চাই। তাই যদি হয়, তবে—রূপ ও উপাদান, প্রকাশন ও প্রত্যয়, একই হ'য়ে দাঁড়াবে। একথা ঠিক যে বিষয়বস্তু হ'চ্ছে তাই যাকে রূপে পরিণত করা যায়, কিন্তু রূপে পরিণত না হওয়া পর্যন্ত তার স্বরূপ নির্দেশ করা সম্ভব নয়। তার সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানিনে ; চেতনায় রূপ নিয়ে ফুটে না ওঠা পর্যন্ত তা' শৈল্পিক বিষয়বস্তুতেই পরিণত হয় না। শৈল্পিক বিষয়বস্তুকে বলা হয়—রসনীয় (ইণ্টারেষ্টিঙ্)। কথাটি মিথ্যা তা নয় তবে অর্থশূন্য। রসনীয় কার কাছে ? প্রকাশন ব্যাপারের কাছে ? নিশ্চয়ই প্রকাশনের প্রকৃতির কাছে বিষয়বস্তুটি রসনীয় না হলে তাকে তা রূপের গৌরব দিতে যাবে কেন ? রস পাওয়ার অর্থই হলো বিষয়বস্তুকে রূপের মহিমায় উন্নীত করা। তবে 'রসনীয়' কথাটিকে ভিন্ন এবং ভুল অর্থেও ব্যবহার করা হয়েছে, পরেই তা' ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেওয়া হবে।

* * * এর পরে ক্রোচে শিল্পকে যাঁরা প্রকৃতির অনুকরণ বলেন তাঁদের মতবাদ নিয়ে আলোচনা করেছেন। ক্রোচে বলেন—'শিল্প প্রকৃতির অনুকরণ—এই বাক্যটির একাধিক অর্থ আছে। কখনও সত্য অথবা সত্যের আভাস ব্যক্ত হয়েছে, কখনও মিথ্যা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অধিকাংশ সময়েই নির্দিষ্ট কোন চিন্তা প্রকাশিত হয়নি। বিজ্ঞানসম্মত একটি অর্থ ব্যক্ত হয়

যখন অনুকরণ (ইমিটেশান) বলতে প্রকৃতির রূপ রচনা বা প্রতিভান—তথা এক রকমের জ্ঞান বুঝায় এবং যখন এই অভিপ্রায় নিয়ে বাক্যটি প্রয়োগ করা হয় এবং ব্যাপারটি যে আসলে আত্মিক ব্যাপার তা জোর দিয়ে বলা হয়, তখন এই অনুসিদ্ধান্তই যুক্তিযুক্ত হয় যে—শিল্প হচ্ছে প্রকৃতির আদর্শায়ন অথবা ভাবানুবন্ধী অনুকরণ। কিন্তু প্রকৃতির অনুকরণ বলতে যদি এই বুঝায় যে শিল্প প্রকৃতিকে যন্ত্রবৎ যথাযথ উপস্থাপিত করে, প্রাকৃতিক বস্তুর যথাসম্ভব যথাযথ প্রতিরূপ তৈরি করে এবং তা' দেখে মনে প্রাকৃতিক বস্তু দেখারই প্রতিক্রিয়া উপস্থিত হয়, তা' হ'লে বাক্যটি অবশ্যই মিথ্যা। যাদুঘরে যে সব বিচিত্র জীবনানুকারী মমি দেখে আমরা বিস্মিত হই, তারা আর যাই করুক শৈল্পিক প্রতিভান জাগায় না।

শৈল্পিক প্রতিভানের শান্ত রাজ্যের সঙ্গে ভ্রমের (ইল্যুশান) এবং বিভ্রমের (হ্যালুসিনেশান) কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু যদি কোন শিল্পী ঐ যাদুঘরের কোন একটি মমি-মূর্তি-সাজানো কক্ষের চিত্র আঁকেন, অথবা যদি কোন অভিনেতা রঙ্গমঞ্চের উপরে কোন একটি মনুষ্য-মূর্তির হাস্যকর ভঙ্গিমা প্রদর্শন করে, তা হ'লে আমরা সেখানে আত্মার কাজ এবং শৈল্পিক প্রতিভান দেখতে পাই। আলোকচিত্র, (ফটোগ্রাফির) মধ্যে শিল্পকলা বলে যদি কিছু থেকে থাকে, তার মাত্রা সেই পরিমাণেই যে পরিমাণে তা' চিত্র গ্রাহকের প্রতিভানকে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীকে, সুষ্ঠু বস্তু সমাবেশ করার শক্তিকে, ব্যক্ত করে। আলোকচিত্র-গ্রহণ যদি শিল্প না হয় তা হয় না এই কারণেই যে তার মধ্যে যে প্রাকৃতিক উপাদান থাকে তা অবিজিত এবং অবিকৃতই থেকে যায়। সর্বোৎকৃষ্ট আলোকচিত্র দেখেও কি আমরা পূর্ণ পরিতৃপ্তি লাভ করি ? শিল্পী কি কম বেশী পরিবর্তন ও পরিমার্জন করেন না ? কিছু বর্জন, কিছু সংযোজন করেন না ?

* * এই প্রসঙ্গের পর, ক্রোচে শিল্পের অন্য একটি সংজ্ঞার বিরুদ্ধে আলোচনা এবং সংজ্ঞাটিকে খণ্ডন করতে চেষ্টা করেছেন। সংজ্ঞাটি হচ্ছে—'শিল্প আবেগের ব্যাপার'—আবেগের অভিব্যক্তি। এর বিরুদ্ধে ক্রোচের বক্তব্য এই—

এই কথাটি অনেক সময়েই বলা হয়ে থাকে যে শিল্প কোনরূপ জ্ঞান নয়,

সে সত্যকে জানায় না, তত্ত্বের রাজ্য নয়, ভাবের রাজ্যের ব্যাপার, এবং কথাটি উঠেছে প্রতিভানের জ্ঞানাত্মিকা প্রকৃতিটি উপলব্ধি করতে না পারার ফলেই। এই প্রতিভান একদিকে যেমন বৌদ্ধিক জ্ঞান থেকে পৃথক, অন্যদিকে তেমনি বস্তু প্রতীতি বা প্রত্যক্ষ থেকেও পৃথক। উল্লিখিত মন্তব্যগুলি এই ধারণা থেকেই জন্মেছে যে বুদ্ধিলব্ধ জ্ঞানই একমাত্র জ্ঞান। আমরা দেখেছি যে প্রতিভান হচ্ছে জ্ঞান—সংজ্ঞানিরপেক্ষ জ্ঞান এবং বাস্তব বস্তুর প্রতীতি অপেক্ষাও অধিকতর সরল ব্যাপার। অতএব শিল্প জ্ঞান, আকার; আবেগ-রাজ্যের কোন ব্যাপার নয়। যে কারণে বহু শিল্পতত্ত্বদর্শী বলেছেন—'শিল্প হ'চ্ছে প্রতিচ্ছায়া' (এপ্নিয়ারেন্স্), সে এই যে তাঁরা শিল্পকে যৌগিক প্রত্যক্ষ বা প্রতীতি থেকে পৃথক করবার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছেন এবং করেছেন শিল্পের প্রতিভানত্ব অক্ষুণ্ণ রেখেই এবং ঐ একই কারণে এমন দাবি যদি করা হয়ে থাকে যে শিল্প হচ্ছে অনুভবন (ফিলিঙ) তার কারণও ঐ একই। কারণ শিল্পের ক্ষেত্র থেকে শিল্পের উপাদান বা সামগ্রী হিসাবে সংজ্ঞা এবং ঐতিহাসিক সত্য যদি বাদ পড়ে, তা হলে শিল্পের উপাদান স্বরূপে যা অবশিষ্ট থাকে তা' হ'চ্ছে—প্রাণের সহজ আবেগে বা অনুভবে অর্থাৎ প্রতিভানে গৃহীত সত্তা ('রিয়েলিটি')।

* * * শিল্প প্রতিচ্ছবি, শিল্প অনুভূতির অভিব্যক্তি—এই মতগুলি সমালোচনা করার পরে, ক্রোচে 'শৈল্পিক ইন্দ্রিয়' বলে কোন বিশেষ বিশেষ ইন্দ্রিয় আছে কিনা অর্থাৎ সমস্ত ইন্দ্রিয়োপাত্ত বিষয়ই শিল্পে উপযোগী কিনা অথবা বিশেষ বিশেষ ইন্দ্রিয়লব্ধ প্রত্যয় শিল্পের উপাদান হওয়ার যোগ্য কি না, এই প্রশ্নটি নিয়ে আলোচনা করেছেন। ক্রোচে বলছেন—

'শৈল্পিক ইন্দ্রিয়' কথাটিরও জন্ম হয়েছে—প্রত্যয় থেকে প্রতিভানের, বস্তু থেকে আকারের পার্থক্য প্রতিষ্ঠিত করতে না পারার জন্য। বস্তুর ধর্ম থেকে আকারের ধর্মে যাওয়ার জন্য পথ খুঁজবার যে ইচ্ছা রয়েছে, সেই ভুল থেকেই এই ধারণাটির উৎপত্তি হয়েছে। বস্তুতঃ, শৈল্পিক ইন্দ্রিয় কোনগুলি—এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা, আর কোন্ জাতীয় প্রত্যয় শৈল্পিক প্রকাশনে প্রবেশ করতে পারে—বা করে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা একই কথা। এর স্পষ্ট উত্তর এই যে

সব রকম প্রত্যয়ই শৈল্পিক প্রকাশনে বা মূর্তিতে প্রবেশ করতে পারে। অবশ্য প্রবেশ করার বাধ্যবাধকতা কারোরই নেই ; দান্তে শুধু যে "প্রাচ্য নীলকান্ত-মণির মধুর বর্রণ" কেই (চাক্ষুস প্রত্যয়) রূপ গৌরব দান করেছিলেন তা' নয়, তিনি যেমন "ঘন বাতাস এবং তৃষ্ণার্তের কণ্ঠকে" শুকিয়ে কাঠ করে দেওয়া "স্বচ্ছ স্রোতস্বিনী" (ফ্রেশ্ রিভুলেট্স্ প্রভৃতি) ত্বাচ প্রত্যয়কেও রূপ দান করেছিলেন।

ছবিতে শুধু চাক্ষুস প্রত্যয়ই থাকে—কী অদ্ভুত এক ধারণা। কপোলের আভা, যৌবনোচ্ছল দেহের উত্তাপ, ফলের মিষ্টতা এবং সজীবতা, শাণিত ছুরির ধারা—এই সমস্ত প্রত্যয়ও কি ছবিতে পাওয়া যায় না ? এটা কি চাক্ষুস ? ধরা যাক একটি কাল্পনিক লোককে যার পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের কোনটিই নেই, বা অল্পই আছে। এই লোকটি হঠাৎ যদি একমাত্র দৃষ্টিশক্তিই লাভ করে এবং কোন একখানি ছবি দেখে, তার কাছে ছবিখানি কি মনে হবে ? আমরা যে ছবিখানি দেখছি এবং মনে করছি শুধু চোখ দিয়েই দেখছি, তার কাছে ছবি-খানি শিল্পীর রঙ্-মাখানো রংদানীর মতোই কিছু একটা মনে হবে।

যাঁরা দৃষ্টিগৃহীত এবং শ্রুতিগৃহীত প্রত্যয়কে শিল্পোপযোগী ব'লে দৃঢ় মত পোষণ করেন এবং অন্য প্রত্যয়কে বাদ দিয়ে রাখেন, তাঁদের কেউ কেউ একথা স্বীকার করেন যে, চাক্ষুস এবং শ্রাবণ প্রত্যয়ই প্রত্যক্ষভাবে শৈল্পিক ব্যাপারে প্রবেশ করতে পারে, অন্যান্য ইন্দ্রিয়জন্য প্রত্যয়ও থাকে তবে আনুষঙ্গিকভাবে থাকে। কিন্তু এই ভেদ কল্পনা সম্পূর্ণ অহেতুক। শৈল্পিক প্রকাশন এমন এক সংশ্লেষণ যাতে প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ পরিচ্ছেদ কল্পনার কোন অবকাশ নেই। সমস্ত প্রত্যয়ই, যখন শিল্পায়িত হয়, একটি বিশেষ স্তরে স্থাপিত হয়। যে মানুষ চিত্রের বিষয়বস্তু ।। কবিতার বিষয়বস্তু আস্বাদন করে সে ঐ বস্তুকে প্রধান-অপ্রধান প্রত্যয়ের পরম্পরা হিসাবে দেখে না ; আস্বাদন বা উপলব্ধির মুহূর্তের আগে কি ঘটেছে সে তার কিছুই জানে না। যেমন বিচারের সময় যে সব ভেদ বা বিভাগ কল্পনা করা হয়, শিল্প বস্তুটির সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই।

'শৈল্পিক ইন্দ্রিয়' মতবাদটিকে অন্য ভাবেও উপস্থাপিত করা হয়েছে—দেখানোর চেষ্টা হয়েছে—শিল্প সৃষ্টির জন্য বিশেষ বিশেষ শারীরিক যন্ত্র—

কর্মেন্দ্রিয়ও আবশ্যক। শারীরিক যন্ত্র, বিশেষ রীতিতে গঠিত এবং বিশেষ প্রবণতাযুক্ত কোষ-গুচ্ছ ছাড়া আর কিছুই নয়। অর্থাৎ নিছক প্রাকৃতিক বস্তু। প্রকাশন শারীর ব্যাপারের কোন খবরই রাখে না। প্রত্যয়ের সীমানা থেকেই প্রকাশন শারীর ক্রিয়া থেকে বিযুক্ত, যে সমস্ত স্নায়ুপথে প্রত্যয়গুলি মনে উপস্থিত হয়েছে তাদের সম্পর্কে সে সম্পূর্ণ উদাসীন। ঘুরে ফিরে সেই একই কথা—প্রত্যয় হ'লেই যথেষ্ট।

এ কথা সত্য যে, বিশেষ ইন্দ্রিয়ের অর্থাৎ স্নায়ুগুচ্ছের অভাবে, বিশেষ বিশেষ প্রত্যয়ের গঠন বাধাপ্রাপ্ত হয় (যদি না সেগুলি পারস্পরিক ক্ষতি-পরিপূরণের প্রক্রিয়ায় অন্যভাবে মনে উপস্থিত না হয়) যে ব্যক্তি জন্মান্ধ সে আলোককে প্রতিভান ও প্রকাশ করতে পারে না। কিন্তু প্রত্যয়সমূহ শুধু ইন্দ্রিয়সাপেক্ষই নয়, যেসব বিষয় (স্টিমুলি) ইন্দ্রিয়কে উত্তেজিত করে, সেই সব বিষয়ের দ্বারাও নিয়ন্ত্রিত।

যাঁদের সমাজের উচ্চস্তরের বা রাজনৈতিক ক্ষেত্রের ধারণা নেই তাঁরা যেমন ঐ দুটোর কোনটাকেই রূপ দিতে পারেন না, তেমনি যে ব্যক্তি কখনও সমুদ্র দেখেননি তিনি সমুদ্রকে রূপায়িত করতে পারবেন না। এতে অবশ্য উদ্দীপক বিষয়ের ইন্দ্রিয়ের উপরে প্রকাশন ব্যাপারের নির্ভরশীলতা প্রমাণ করে না। আমরা আগেই যা জেনে গেছি, সেই জানা কথারই পুনরাবৃত্তি করে—প্রকাশন প্রত্যয়ের অস্তিত্ব সূচিত করে এবং বিশেষ বিশেষ প্রকাশনে বিশেষ বিশেষ প্রত্যয় ব্যক্ত হয়। আর প্রত্যেক প্রত্যয়, প্রাধান্য পাওয়ার মুহূর্তে অন্যান্য প্রত্যয়কে তিরোহিত করে এবং প্রকাশনের পক্ষেই ঐ একই কথা।

***প্রকাশনকে ক্রিয়া হিসাবে গণ্য করার আর একটি অনুসিদ্ধান্ত হচ্ছে—শিল্পবস্তুর অবিভাজ্যতা। প্রত্যেকটি প্রকাশন অখণ্ড প্রকাশন। ক্রিয়া বলতেই প্রত্যয়গুলিকে মিলিয়ে মিশিয়ে একটি জৈবিক ঐক্যে বা সমগ্রতায় পরিণত করা বুঝায়। একে ব্যক্ত করার ইচ্ছা থেকেই, "শিল্পের ঐক্য—বহু—সমবায়ে ঐক্য—থাকা চাই"—এমন কথা বলার প্রেরণা এসেছে। প্রকাশন হচ্ছে একের মধ্যে বহুর সংশ্লেষ।

• আমরা যে শিল্পকর্মকে বিভিন্ন অংশে ভাগ করে থাকি, কাব্যকে দৃশ্যে, কাহিনীতে, উপমায়, বাক্যে অথবা চিত্রকে মূর্তি, বস্তু, পটভূমি, অগ্রভূমি প্রভৃতিতে ভাগ করে থাকি, তা আগের ঐ সিদ্ধান্তের বিরোধী মনে হতে পারে। ঐরূপ বিভাজন শিল্পকে সংহার করে, যেমন হৃৎপিণ্ড, মস্তিষ্ক, স্নায়ু, মাংসপেশী প্রভৃতিতে খণ্ডিত করলে, জীবদেহকে মৃতদেহে পরিণত করা হয়। সত্য বটে যে এমন জীবও আছে যাকে খণ্ডিত করলে অন্য নতুন জীবদেহ সৃষ্ট হয়, কিন্তু সেক্ষেত্রে জীবদেহের সঙ্গে শিল্পকর্মের উপমা বজায় রেখে আমরা এই কথাই বলব যে, ঐসব দেহে একাধিক জীবের জীবাণু অবস্থান করে, যা, এক মুহূর্তে, অখণ্ড এক-একটি জীব রূপে ব্যক্ত হয়।

এমন কথা বলা যেতে পারে যে, কখনও কখনও অন্যান্য প্রকাশন থেকে প্রকাশন উদ্ভূত হয়। সরল এবং যৌগিক দু'রকম প্রকাশন সম্ভব। আর এ কথাও অবশ্য স্বীকার্য যে আবিষ্কারের আনন্দের অভিব্যক্তি হিসাবে আর্কিমিডিসের মুখ থেকে যে 'ইউরেকা' শব্দটি বেরিয়েছিল, এবং একখানি পূর্ণাঙ্গ ট্রাজেডির (পাঁচটি অঙ্ক) প্রকাশ-ব্যাপার—এ দু'য়ের মধ্যে পার্থক্য আছে। না—একটুও নেই, সর্বদাই প্রকাশন প্রত্যয় থেকে উদ্ভূত হয়। যিনি কোন গোটা একখানি ট্র্যাজেডির ধ্যান ধারণা করেন, তিনি অল্প পরিসরে অনেক পরিমাণ প্রত্যয়কে অন্তর্ভুক্ত করেন। অন্য সময়ে-বিধৃত প্রকাশনগুলি নতুনের সঙ্গে মিলে-মিশে একাকার হয়ে যায়, যেমনটি হয় যখন ধাতুগলানো চুল্লিতে ব্রোঞ্জের রূপহীন খণ্ডগুলি এবং সুন্দর সুন্দর মূর্তিগুলি একই সঙ্গে নিক্ষেপ করা হয়। নতুন মূর্তি ঢালাই করার আগে ব্রোঞ্জের রূপহীন খণ্ডগুলি এবং ঐ সুন্দর মূর্তিগুলি একইভাবে গলিয়ে নিতে হবে। তেমনি পুরাতন প্রকাশনগুলিকেও নতুন অখণ্ড প্রকাশনে সংশ্লেষিত হওয়ার জন্য অবশ্যই প্রত্যয়ের স্তরে নেমে যেতে হবে।

***এইবার অধ্যায়ের শেষ আলোচ্য বিষয়ের আলোচনা—শিল্প মানুষকে মুক্তির আনন্দ কিভাবে দেয়, তার আলোচনা। ক্রোচে বলেন—

প্রত্যয়সমূহকে রূপায়িত করে মানুষ তাদের চাপ থেকে নিজেকে মুক্ত করে। তাদের মূর্তি দান করে সে মন থেকে তাদের অপসারিত করে এবং

তাদের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করে। শিল্পের এই মুক্তি দেওয়ার এবং পরিশোধন করার ক্ষমতা, তার ক্রিয়াধর্মিতারই আর একটি আনুষঙ্গিক বৈশিষ্ট্য। ক্রিয়া মুক্তিদাত', কারণ তা জড়তা দূর করে।

এই জন্যই, শিল্পীতে—অপার বেদনা এবং অপার শান্তি আরোপ করা হয়। এই দুই স্বভাব সহাবস্থান করতে পারে, কারণ তারা একই বিষয়ে প্রযুক্ত নয়। অপার বেদনার কারণ—শিল্পীর মনের মধ্যে যে সমস্ত বস্তু গৃহীত হয়েছে সেই সব বস্তুর প্রাচুর্য, আর অপার শান্তির কারণ—সেই রূপগুলি, যা দিয়ে শিল্পী আবেগের ও সংবেদনের বিক্ষোভকে দমিত ও বশীভূত করেন।

তৃতীয় অধ্যায়

শিল্প ও দর্শন

এই অধ্যায়ে ক্রোচের আলোচ্য বিষয় :—

(ক) প্রাতিভানিক জ্ঞানের সঙ্গে বৌদ্ধিক জ্ঞানের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ।

(খ) বাক্‌নিরপেক্ষ চিন্তা সম্ভব—এই মতের খণ্ডন।

(গ) কলা ও বিজ্ঞান।

(ঘ) বিষয়বস্তু ও আকারের ভিন্ন অর্থ—

(ঙ) গদ্য ও পদ্য।

(চ) জ্ঞানের দুয়ের আধিক রূপ সম্ভব কিনা।

(ছ) ইতিহাস কি অতিরিক্ত জ্ঞান ব্যাপার? ইতিহাসের সঙ্গে শিল্পের ঐক্য ও পার্থক্য।

(জ) ঐতিহাসিক সমালোচনা প্রসঙ্গ।

(ঝ) ঐতিহাসিক সন্দেহবাদ (হিস্টোরিকাল স্কেপটিসিজম্)।

(ঞ) দর্শন ও বিজ্ঞান।

(ট) বস্তুজগৎ ও ভাবজগৎ (ফেনোমেনন্ এ্যাণ্ড নোমেনন্)।

"প্রাতিভানিক ও বৌদ্ধিক বা সংজ্ঞারূপী জ্ঞান—এই দুই প্রকার জ্ঞান স্বতন্ত্র বটে কিন্তু পরস্পর ভিন্নমুখী শক্তির মত বিচ্ছিন্ন বা অসংযুক্ত নয়। যদি আমরা এটা প্রমাণ করে থাকি যে প্রাতিভানিক জ্ঞান সম্পূর্ণ বৌদ্ধিক জ্ঞান নিরপেক্ষ তার অস্তিত্বের জন্য অপর কিছুর উপর তাকে নির্ভর করতে হয় না, তবে একথা কিন্তু আমরা বলিনি যে, প্রাতিভানিকজ্ঞান-নিরপেক্ষভাবে বৌদ্ধিক জ্ঞান সম্ভব। উভয়ের স্বাতন্ত্র্যকে পারস্পরিক আখ্যা দিলে সত্য কথা বলা হবে না।

সংজ্ঞাজনিত জ্ঞান কি? বস্তুর পারস্পরিক সম্বন্ধের জ্ঞান। আর ঐ বস্তুগুলি হচ্ছে প্রতিভান। প্রত্যয় ব্যতিরেকে যেমন প্রতিভান সম্ভব নয়,

তেমনি প্রতিভান ব্যতিরেকে সংজ্ঞা সম্ভব নয়। প্রতিভান হচ্ছে—এই বিশেষ নদী, সরোবর, ছোট নদী, বৃষ্টি, এক গ্লাস জল আর সংজ্ঞা হচ্ছে—কোন বিশেষ জল নয়, দেশ-কাল-পাত্র-নির্বিশেষ, অসংখ্য প্রতিভানের উপাদান অখণ্ড জল-সামান্য।

কিন্তু সংজ্ঞা,—সামান্য—এক হিসাবে যদিও প্রতিভান নয়, অন্য হিসাবে প্রতিভান হতে পারে এবং না হয়েই পারে না। যে মানুষ চিন্তা করে, তার মধ্যে প্রত্যয় বা আবেগ থাকে। তার সেই প্রত্যয় ও আবেগ কোন অদার্শনিক মানুষের রাগ-দ্বেষ বা আবেগ নয়, কোন বিশেষ ব্যক্তির বা বস্তুর প্রতি রাগ-দ্বেষ নয়, তার চিন্তারই চেষ্টা এবং তারই আনুষঙ্গিক বেদনা ও আনন্দ, রাগ ও দ্বেষ। এই চেষ্টা চেতনায় আকার নিয়ে ফুটে উঠবার সময় প্রতিভানের রূপ না নিয়েই পারে না। কথা বলা মানেই ন্যায়সঙ্গত চিন্তা করা নয়, কিন্তু ন্যায়সঙ্গত চিন্তা করা মানেই কথা বলা।

বাক্-নিরপেক্ষ চিন্তা সম্ভব নয়—এ সত্য প্রায় সকলেই স্বীকার করে নিয়েছেন। এই সত্য না মানার মূলে বাক্ চাতুরী ও ভুল ধারণা রয়েছে। প্রথম বাক্ চাতুরীটি তাঁদের যাঁরা বলেন—নীরবে উচ্চারিত বা অনুচ্চারিত ভাষা ছাড়াও মানুষ জ্যামিতিক রেখাচিত্র, বীজগণিতের সংখ্যা, ভাবানুলেখক চিহ্ন প্রভৃতির সাহায্যে চিন্তা করতে পারে; যারা বলেন যে, এমন সব ভাষা আছে যাতে লিখিত চিহ্ন বা সংকেত না দেখা পর্যন্ত শব্দ বা ধ্বনি-সংকেত থেকে কিছুই বুঝা যায় না। কিন্তু আমরা যখন 'বলা' শব্দটি ব্যবহার করেছি, তখন 'সিনেকডকি' অলংকার ব্যবহার করেছি—প্রকাশের সাধারণ অর্থেই ব্যবহার করেছি। আগেও বলেছি প্রকাশন বলতে শুধুমাত্র বাচিক প্রকাশই বুঝায় না। শাব্দিক অভিব্যক্তি ছাড়াই কিছু কিছু সংজ্ঞা চিন্তা করা যায়—এ কথা সত্য হতেও পারে, বা নাও হতে পারে, কিন্তু তা প্রমাণ করবার জন্য যেসব উদাহরণ দেওয়া হয়েছে তাতে এও প্রমাণিত হয়েছে যে, প্রকাশন ছাড়া সংজ্ঞা সম্ভব নয়।

অন্যেরা বলেন যে প্রাণীরা বা কোন কোন প্রাণী কথা বলতে না পেরেও চিন্তা ও বিচার করতে পারে। এখন, কোন্ প্রাণী কিভাবে কথা বলে এবং

আদৌ কথা বলে কি না অথবা যারা সভ্য হতে চায় না এমন ধরনের কোন অসভ্য বন্যজাতির মতো আদিম মানুষ কি না, সে প্রশ্ন নিয়ে মাথা ঘামানোর কোন প্রয়োজন নেই। দার্শনিক যখন প্রাণী, পাশবিক, সহজ স্বাভাবিক প্রবৃত্তি প্রভৃতি শব্দ সম্বন্ধে কথা বলেন, তখন কুকুর বা বিড়াল, সিংহ বা পিপীলিকা প্রভৃতির কথা চিন্তা করেন না, মানুষের মধ্যে যে পশুসত্তা বা প্রাণিসত্তা আছে, পশুত্বের অংশ বা ভিত্তি যা আমরা আমাদের মধ্যে উপলব্ধি করি, সেই সত্তার কথাই চিন্তা করেন। যদি কুকুর বা বিড়াল, সিংহ বা পিপঁড়ে এই সব প্রাণীর মধ্যে মনুষ্য স্বভাব কিছু থেকে থাকে, তাদের পক্ষে তা ভালোই, অথবা মন্দই। তার অর্থ এই যে, তাদের সম্বন্ধে আমরা একথা বলব না যে, তাদের সবটুকুই 'প্রকৃতি' (নেচার), বলব তাদের মধ্যে পশু-স্বভাব যেটা আছে, সেটা মানুষের অন্তর্নিহিত পশু-স্বভাব থেকে আরো অধিক ও প্রবল আর একথা যদি আমরা মনেও করি যে, পশুরা চিন্তা করে এবং সামান্যের ধারণা করতে পারে, তাহলে কী সেই অনুমান যার উপরে নির্ভর করে—পশুরা বিনা প্রকাশনেই চিন্তা করে? এই সিদ্ধান্তকে আমরা সমর্থন করতে পারি? বরং মানুষের সঙ্গে তুলনা, আত্মার ধারণা, মানবমনস্তত্ত্ব, প্রাণিমনস্তত্ত্বের সমস্ত তথ্য, আমাদের এই অনুমান করতেই প্ররোচনা দেয় যে, যদি তারা কোন প্রকার চিন্তা করে, তবে তারা কোন-না-কোনভাবে কথাও বলে।

মানবমনস্তত্ত্ব থেকে—বলা যায় সাহিত্যিক মনস্তত্ত্ব থেকে এই মর্মে একটি আপত্তি দেখা দিয়েছে যে বিনা শব্দেই সংজ্ঞা থাকতে পারে, কারণ আমরা এমন বইয়ের কথা জানি যা অতি সুচিন্তিত অথচ অ-সুলিখিত, অর্থাৎ যা'তে চিন্তা প্রকাশকে ছাড়িয়ে অথবা কুপ্রকাশ সত্ত্বেও বিরাজ করে। কিন্তু যখন এরূপ সুচিন্তিত এবং কু-ভাষিত গ্রন্থের কথা আমরা বলি, তখন এই অর্থেই কথাটা বলি যে ঐরূপ গ্রন্থের কোন অংশ প্রষ্টা অধ্যায় বা বাক্য সুচিন্তিত এবং সুভাষিত এবং অন্য অংশ কু-চিন্তিত ও কু-ভাষিত, সুষ্ঠুভাবে চিন্তিত নয় বলেই সুন্দরভাবে প্রকাশিত নয়। যেখানে ভিকোর "সায়েঞ্জা নুয়োভা" (Scienza nuova) বাস্তবিকই কু-লিখিত বুঝতে হবে, সেখানে তা কু-চিন্তিতও বটে। বড় গ্রন্থের কথা ছেড়ে দিয়ে আমরা যদি ছোট একটি

বাক্যের কথা ধরি, তাহ'লে ঐ ধরনের উক্তির অসত্যতা অথবা অযথার্থতা সহজেই চোখে পড়বে। কি করে একটি বাক্য একই সঙ্গে স্পষ্ট চিন্তিত এবং অস্পষ্ট প্রকাশিত হবে?

এইটুকুই শুধু স্বীকার করা যেতে পারে যে অনেক সময় আমাদের মনে এমন চিন্তা (সংজ্ঞা) প্রতিভানের মত উদ্ভাসিত হয়, যা হয়তো খুব সংক্ষিপ্ত বা অদ্ভুত এবং নিজের কাজের জন্য যথেষ্ট, কিন্তু অন্য ব্যক্তির কাছে সহজে ব্যক্ত করবার পক্ষে যথেষ্ট নয়। সুতরাং প্রকাশন ব্যতিরেকেই চিন্তা রয়েছে এমন কথা বলা ঠিক নয় বরং এই কথাই বলা উচিত যে, আমাদের মধ্যে প্রকাশটি এমন রূপ নিয়ে এসেছে যে অন্যের কাছে সহজে তা ব্যক্ত করা যায় না। এ অবশ্য খুবই অনির্ধারিত ও আপেক্ষিক ব্যাপার। এমন লোক অবশ্যই সর্বদাই আছে যাঁরা অল্পতেই ভাবকে ধরে নিতে পারেন, সংক্ষিপ্ত রূপই পছন্দ করেন এবং ভাবের বিস্তার দেখলে বিরক্ত হন। অন্যভাবে বললে —চিন্তাকে নৈর্বক্তিক ও নৈয়ায়িক দৃষ্টিতে দেখতে গেলে একই দাঁড়াবে কিন্তু শৈল্পিক দৃষ্টিতে আমরা দুইটি ভিন্ন প্রতিভান-প্রকাশন নিয়ে কারবার করি এবং তাদের মধ্যে বিভিন্ন মনস্তাত্ত্বিক 'উপাদান' প্রবেশ করে থাকে। বাহ্যিক এবং আভ্যন্তরিক ভাষার মধ্যে যে কৃত্রিম পার্থক্য কল্পনা করা হয় তাকে বিনষ্ট বা ঠিকভাবে ব্যাখ্যা করবার পক্ষে এই একই যুক্তি যথেষ্ট।

* * * এর পর ক্রোচে শিল্প ও বিজ্ঞানের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং বলেছেন—'বৌদ্ধিক জ্ঞানের এবং প্রাতিভানিক জ্ঞানের উত্তুঙ্গ অভিব্যক্তি বা চূড়া—দূর থেকে যা জ্বল্ জ্বল্ করছে—তাদেরই বলা হয় শিল্প এবং বিজ্ঞান। শিল্পকলা এবং বিজ্ঞান ভিন্ন হয়েও সম্পৃক্ত একদিকে—শৈল্পিক দিকে তারা যুক্ত হয়ে আছে। আমাদের মন যখন একাগ্রভাবে বৈজ্ঞানিকের চিন্তা বুঝবার জন্য এবং বিচার করবার জন্য চেষ্টা করে তখন তার শৈল্পিক গুণগুলি আমাদের চোখ এড়িয়ে যেতে পারে বটে কিন্তু, যেই আমরা বুঝবার চেষ্টা থেকে অনুধ্যানে ফিরে যাই, এবং দেখি—ভাব আমাদের চোখের সামনে বিশুদ্ধ, যথাযথ সুন্দর রূপ নিয়ে একটিও অবান্তর ও অসার্থক শব্দ ব্যবহার

না'করে, উপযুক্ত ছন্দ-লয়ে বিকশিত হ'চ্ছে, অথবা অস্পষ্ট, খণ্ডিত বিরক্তিকর পরীক্ষামূলক অভিব্যক্তি লাভ করেছে, তখন তার শৈল্পিকগুণটি আর অলক্ষিত থাকে না। অনেক সময় বড চিন্তাশীলদেরই বড লেখক বলা হয়ে থাকে, আবার একই রকম বড চিন্তাশীল হওয়া সত্ত্বেও, অনেকে বেশী-কম স্বল্পভাষী লেখক হয়েই থাকেন—যদিও তাঁদের ঐ স্বল্প ও সংক্ষিপ্ত রচনায় সুসঙ্গত, সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং সম্পূর্ণ রচনার বৈজ্ঞানিক মূল্য যথেষ্টই থাকে।

দার্শনিকদের এবং বৈজ্ঞানিকদের ভাষাদৈন্য আমরা ক্ষমার চোখেই দেখে থাকি। সমগ্রের বদলে খণ্ড অংশ এবং আভাস পেলেই আমরা সন্তুষ্ট থাকি, কারণ প্রতিভাধরের আবিষ্কারকে উপলব্ধি করার চেয়ে, তাঁর খণ্ডিত রচনা থেকে সুবিন্যস্ত রচনাকে উদ্ধার করা—স্ফুলিঙ্গের অন্তর্নিহিত শিখাকে মুক্ত করে দেওয়া—অনেক সহজ কাজ। কিন্তু শিল্পীর রচনার প্রকাশদৈন্যকে আমরা কি করে ক্ষমা করব? * যে কবির বা চিত্রকরের রূপদক্ষতা নেই তাঁর কিছুই নেই, কারণ তাঁর শিল্পীসত্তাই নেই। কাব্যের সামগ্রী বা উপাদান প্রত্যেকের মনেই আছে, কিন্তু প্রকাশন ক্ষমতাই অর্থাৎ রূপদক্ষতাই কবিকে কবি করে তোলে। বৌদ্ধিক সংজ্ঞাকে বিষয়বস্তু বলে মনে করে যাঁরা বলেন, শিল্পের কোন বিষয়বস্তু নেই তাঁদের ধারণার সত্যতা এখানে পাওয়া যাচ্ছে। এই অর্থে, অর্থাৎ সংজ্ঞাকে যখন বিষয়বস্তু রূপে গণ্য করা হয়—এই কথাই শুধু সত্য নয় যে বিষয়বস্তুর মধ্যে শিল্পত্ব নেই, এ কথাও সত্য যে শিল্পের কোন বিষয়বস্তুই নেই।

* * * শিল্প ও বিজ্ঞানের পার্থক্য যে-ভাবে করা হয়েছে, সে-ভাবে ছাড়া পদ্য ও গদ্যের পার্থক্যও সমর্থন করা চলে না। অতীতেও লক্ষ্য করা হয়েছে যে ছন্দ লয় মাত্রা প্রভৃতি বাহ্যলক্ষণের ভিত্তির উপরে পার্থক্যকে দাঁড় করানো যায় না। আসল পার্থক্য আভ্যন্তরিক। পদ্য হ'চ্ছে অনুভূতির এবং গদ্য হচ্ছে মস্তিষ্কের বা বুদ্ধির ভাষা। কিন্তু যেহেতু বুদ্ধিও অনুভূতিবিশেষ, প্রত্যেক গদ্যেই পদ্যের লক্ষণ আছে।

* * * —প্রাতিভানিক জ্ঞান বা প্রকাশন এবং বৌদ্ধিক জ্ঞান বা সংজ্ঞার মধ্যে, শিল্প ও বিজ্ঞানের মধ্যে, পদ্য ও গদ্যের মধ্যে যে সম্বন্ধ, তাকে দ্বৈমাত্রিক

(ডাবল্ ডিগ্রি) সম্বন্ধ ছাড়া আর কিছু বলে ব্যাখ্যা করা যায় না। প্রথম পর্যায়—প্রকাশন, দ্বিতীয় পর্যায়—সংজ্ঞা। প্রথমটি দ্বিতীয়টিব অপেক্ষা না করেই থাকতে পারে, কিন্তু দ্বিতীয়টি প্রথমকে ছেড়ে দাঁড়াতেই পারে না। গদ্যনিরপেক্ষ পদ্যের অস্তিত্ব আছে, কিন্তু পদ্যনিরপেক্ষ গদ্যের অস্তিত্ব সম্ভব নয়। বস্তুতঃ প্রকাশনই মানবিক ক্রিয়ার প্রথম প্রতিষ্ঠা। পদ্যই হচ্ছে "মনুষ্য-জাতির মাতৃভাষা"। প্রথম মানুষরাই ছিল—"স্বাভাবিক ও সুমহান্ কবি।" এই কথাই আমরা অন্যভাবে ঘুরিয়ে বলি, যখন বলি—প্রাণ থেকে চেতনায়, জৈবিক থেকে মানবিক ক্রিয়ায় অভিযান বা উদ্বর্তন ভাষার সাহায্যেই সম্ভব হয়েছে। সাধারণ প্রতিভান বা প্রকাশন সম্বন্ধেও এই কথা বলা যায়। কিন্তু ভাষাকে বা প্রকাশনকে প্রকৃতিব ও মানবতার মধ্যবর্তী গ্রন্থি, উভয়ের সংমিশ্রণ, বলে মনে করলে আমাদের মনে হয় ঠিক কথা বলা হয় না। যেখানে মানবতাব উদ্ভব, প্রকৃতি আগেই সেখানে অন্তর্হিত। যে মানুষ নিজেকে প্রকাশ করে, সে নিশ্চয়ই প্রকৃতির অবস্থাকে কাটিয়ে উঠে এবং সত্যই সে প্রকৃতির উর্ধ্বে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে। মধ্যবর্তী গ্রন্থি বা সংযোগ বলতে যা বুঝায়,—তেমনি এক পা ভিতরে এক পা বাইরে দিয়ে দাঁড়ায় না।

* * * এখানে ক্রোচে দেখাতে চেয়েছেন—প্রাতিভানিক জ্ঞান এবং বৌদ্ধিক জ্ঞান—জ্ঞানের এই দুই রূপ ছাড়া অন্য কোন রূপ নেই। ঐতিবৃত্তিকতা (হিস্টোরিসিটি) জ্ঞানের তৃতীয় কোন রূপ নয়। তিনি বলেন, "এই দুটি রূপ ছাড়া জ্ঞানের আর কোন রূপ সম্ভব নয়। প্রকাশন এবং সংজ্ঞা—এই দুয়েতেই বৃত্ত সম্পূর্ণ। মানুষের সমগ্র জ্ঞাতৃ-সত্তার আনাগোনা—এই দুই পর্যায়েরই মধ্যে সীমাবদ্ধ।"

ভুল করে, ঐতিবৃত্তিকতাকে (হিস্টোরিসিটি) তৃতীয় জ্ঞান-প্রকার বলা হয়। ঐতিবৃত্তিকতা কোন রূপ নয়,—বিষয়বস্তু এবং রূপ হিসাবে তা' প্রতিভান ছাড়া বা শৈল্পিক ঘটনা ছাড়া আর কিছুই নয়। ইতিবৃত্ত কোন সূত্র আবিষ্কার করতে বা সংজ্ঞা গঠন করতে চেষ্টা করে না। আরোহী অথবা অবরোহী কোন যুক্তিপদ্ধতিই সে ব্যবহার করে না। তার একমাত্র কাজ বর্ণনা—

(এ্যাড্ ন্যারেন্ডাম্, নন এ্যাড্ ডিমোনস্ট্রেন্ডাম্)। সে কোন সামান্য সংজ্ঞা তৈরি করে না, শুধু প্রতিভানকে সাজিয়ে রাখে। 'এই এবং এখানে'—"দি ইণ্ডিভিডিয়াম ওমনিমোড ডিটারমিনেতুম"—এটাই হ'চ্ছে তার উপস্থাপ্য বা রাজ্য। শিল্পেরও ঐ একই উপস্থাপ্য বা রাজ্য। সুতরাং ইতিবৃত্ত, শিল্পের মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত।

তৃতীয় প্রকার জ্ঞানের ধারণা অসম্ভব এই কথা মনে রেখে, এই মতবাদের বিরুদ্ধে যে আপত্তি উত্থাপিত হ'য়েছে তাতে ইতিবৃত্তকে বৌদ্ধিক বা বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত করতে হয়।

এই আপত্তির অনেকগুলিই এসেছে এই কুসংস্কার থেকে যে ইতিবৃত্তকে বৌদ্ধিক জ্ঞানের মর্যাদা না দেওয়ায় তার মূল্য ও গৌরব অনেক পরিমাণে ক্ষুণ্ণ করা হয়েছে। শিল্পের স্বরূপ সম্বন্ধে ভুল ধারণা থাকার জন্যই—শিল্পকে জ্ঞান-ব্যাপার না মনে করে আমোদ, বাড়তি ব্যাপার, লঘু ব্যাপার বলে মনে করার জন্যই ঐরূপ ধারণা জন্মেছে। এ বিষয়ে দীর্ঘ বিতর্কে প্রবেশ না করে,—আমাদের দিক থেকে এ বিতর্ক শেষ বারের মতো বন্ধ করা হয়েছে—এখানে শুধু, যে যুক্তিটি বেশী করে দেওয়া হয়েছে এবং এখনও ব্যাপকভাবে যার পুনরাবৃত্তি করা হয়ে থাকে সেইটিরই উল্লেখ করব। ঐ যুক্তিটির উদ্দেশ্য ইতিবৃত্তের বৈজ্ঞানিক ও নৈয়ায়িক প্রকৃতিটি প্রমাণ করা। এর প্রতিস্থাপ্য এই যে ঐতিহাসিক জ্ঞানের বিষয় হ'চ্ছে—বিশেষ ব্যক্তি, কোন রূপের উপস্থাপন নয়। আরো এর সঙ্গে যোগ করা হয়—বরং ব্যক্তির সামান্য জ্ঞান। এর থেকেই সিদ্ধান্ত করা হয় যে ইতিহাসও নৈয়ায়িক বা বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের মতো জ্ঞান। বাস্তবিকই এই কথা মনে করা হয় যে ইতিহাস শার্লামেন বা নেপোলিয়নের মতো কোন ব্যক্তির, রেনেসাঁস বা রিফর্মেশান প্রভৃতি যুগের, ফরাসী বিপ্লব ও ইতালীর ঐক্য প্রভৃতি ঘটনার সংজ্ঞা ও স্বরূপ আবিষ্কার করতে চেষ্টা করে এবং জ্যামিতি যে ভাবে দৈশিক রূপের সংজ্ঞা বিষয়ে, অথবা শিল্পতত্ত্ব যে ভাবে প্রকাশনের সংজ্ঞা নিয়ে আলোচনা করে তেমনি ভাবেই করে। এ সম্পূর্ণ মিথ্যা ধারণা।

ইতিহাস, শার্লামেন বা নেপোলিয়নকে, রেনেসাঁস ও রিফর্মেশানকে,

ফরাসী বিপ্লব ও ইতালীয় একীকরণকে বিশেষ বিশেষ ঘটনা হিসাবে উপস্থাপন করা ছাড়া আর কিছুই করতে পারে না। যখন নৈয়ায়িকরা বলেন—বিশেষের সংজ্ঞা হতে পারে না, হ'তে পারে শুধু উপস্থাপন (রিপ্রেজেণ্টেশান) তখন উপস্থাপন শব্দটি নৈয়ায়িকরা যে অর্থে ব্যবহার করেন সেই অর্থেই এখানে ব্যবহার করা হ'য়েছে। বিশেষের তথাকথিত সংজ্ঞা সর্বদাই একটি সামান্য সংজ্ঞা—বিশেষত্বে পূর্ণ—পরিপূর্ণ বল্‌লেও চলে, কিন্তু যতই পূর্ণ হোক, প্রাতিভানিক জ্ঞান হিসাবে ঐতিহাসিক জ্ঞান যেরূপ বিশেষত্বের পর্যায়ে পৌছতে পারে, সেই পর্যায়ে সে পৌছতে পারে না।

ইতিহাসের বিষয়বস্তু শিল্পের বিষয়বস্তু থেকে কোন্ অর্থে পৃথক তা দেখানোর জন্য আমরা প্রতিভানের বা প্রথম প্রতীতির প্রকৃতিটি—যাতে সবই বাস্তব, সুতরাং বাস্তব বলে বিশেষ কিছু নেই—সেই আদর্শ প্রকৃতি সম্বন্ধে যা' বলেছি তাই স্মরণ করব। প্রতীতির পরবর্তী পর্যায়েই মনে বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক কি ঘটেছে এবং কি চাওয়া হয়েছে, কর্ম, কর্তা প্রভৃতি বিচার এসে থাকে। এই পরবর্তী পর্যায়েই কোন্‌টি ঐতিহাসিক, কোন্‌টি অনৈতিহাসিক, কোন্‌টি বাস্তব, কোন্‌টি অবাস্তব, কোন্‌টি বাস্তব কল্পনা, কোনটি বিশুদ্ধ কল্পনা—এই সব বিচার করা হয়ে থাকে। এমন কি আভ্যন্তরীণ ঘটনা-রাজি—যা কামনা করা হয়, কল্পনা করা হয়—শূন্যে সৌধ, কোকেন-খোরদের রাজ্য—সব কিছুরই বাস্তবতা আছে। আত্মারও ইতিহাস আছে যে!

আত্মার ভ্রান্তিগুলিও প্রত্যেকটি ব্যক্তির জীবনচরিতের অংশ। কিন্তু বিশেষ ব্যক্তির ইতিহাস—ইতিহাস, কারণ তার মধ্যে বাস্তব-অবাস্তবের পার্থক্য বিচার সব সময়ে সক্রিয়—এমন কি যখন ভ্রান্তিগুলি বাস্তব হয়ে উঠে তখনও কিন্তু এই সব বিলক্ষণ সংজ্ঞাগুলি, বিজ্ঞানের সংজ্ঞাগুলি যেভাবে উপস্থিত হয় সে-ভাবে ইতিহাসে উপস্থিত হয় না, বরং শৈল্পিক প্রতিভানে সংজ্ঞাগুলি যে ভাবে গলিত ও মিশ্রিত হয়ে যেয়ে ব্যক্ত হয়, সেই ভাবেই হয়ে থাকে। যদিও ইতিহাসে তারা একটি স্বকীয় বৈশিষ্ট্য নিয়েই থাকে। ইতিহাস বাস্তবের বা অবাস্তবের কোন সংজ্ঞা তৈরি করে না, তাদের ব্যবহার করে মাত্র। বস্তুতঃ ইতিহাস ইতিহাসের তত্ত্ব নয়। কোন ঘটনা জীবনে বাস্তব বা

কাল্পনিক ছিল—এ নির্ধারণ করতে বৌদ্ধিক বিশ্লেষণ কোন কাজেই লাগে না। প্রতিভানগুলি যখন প্রথম সৃষ্ট হয়েছিল, ঠিক সেই রূপেই আমরা মনের মধ্যে পুনরুদ্বোধিত করব। ঐতিহাসিকতাকে বিশুদ্ধ কল্পনা থেকে বস্তুতঃ সেই ভাবেই পৃথক করা যায়, যে-ভাবে একটি প্রতিভানকে অন্যান্য—প্রতিভান থেকে পৃথক করা যায়—অর্থাৎ স্মৃতিতেই।

* * * যেখানে এ সম্ভব হয় না, যেখানে বাস্তব ও কাল্পনিক প্রতিভানের ভিতরকার সূক্ষ্ম ও পরিবর্তমান ব্যবধান এতই অল্প যে একটি অপরটির সঙ্গে মিশে থাকে, সেখানে হয় আমরা ঐ সময়ের জন্য বাস্তব ঘটনার জ্ঞান বিসর্জন দেব, অথবা অনুমান, যাথাযথ্য এবং সম্ভাব্যতার শরণাপন্ন হব; যাথাযথ্য এবং সম্ভাব্যতার হিসাব, ঐতিহাসিক সমালোচনার প্রধান লক্ষণ।

কোন্ সূত্র থেকে পাওয়া গেছে, কার কথাকে প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে—এর পরীক্ষাই বড় প্রমাণ রূপে স্থান দেওয়া হয়। আর, যারা নিজ চোখে দেখেছে, অর্থাৎ যারা সব চেয়ে বেশী মনে করে রেখেছে এবং মিথ্যা বলতে চায় না, বা মিথ্যা ব'লে কোন স্বার্থসিদ্ধি করতে চায় না, তারা ছাড়া আর কারা সবচেয়ে বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ হবে?

এর থেকেই এ কথা আসে যে বুদ্ধিবাদী সন্দেহবাদ অতি সহজেই ঐতিহাসিক জ্ঞানের নিশ্চয়তা অস্বীকার করে; কারণ, ইতিহাস যে নিশ্চিত জ্ঞান দেয়, তা' থেকে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ভিন্ন। ইতিহাসের—নিশ্চিততা হচ্ছে স্মৃতির ও প্রামাণিকদের নিশ্চিততা—বিশ্লেষণ ও প্রমাণের নিশ্চিততা নয়। ঐতিহাসিক আরোহী-সিদ্ধান্ত বা পরীক্ষণ এ সব কথা বলার মানেই ঐ সব শব্দের আরোপিত ব্যবহার করা। বিজ্ঞানে তারা যে অর্থে ব্যবহৃত হয়, ইতিহাসে সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। ঐতিহাসিকের দৃঢ় বিশ্বাস সেই রকম কোন জুরিরই দৃঢ় বিশ্বাস—যে জুরি সাক্ষীদের কথা শুনেছে, মনোযোগ দিয়ে ঘটনাবলী শুনেছে এবং প্রেরণা পাওয়ার জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানিয়েছে। নিঃসন্দেহ কোন কোন সময় সে ভুল করে বটে, কিন্তু যতগুলি ক্ষেত্রে সে সত্যকে ধরতে পারে তার তুলনায় ঐ ভুলের সংখ্যা খুবই নগণ্য। সেই কারণে যাঁরা বুদ্ধিবাদীদের মতের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে ইতিহাসকে 'মেনে-নেওয়া গল্প' মনে না

করে ব্যক্তির বা মানবজাতির অতীতবিষয়ক স্মৃতি বা বিবরণ বলে মনে করেন তাঁরা ঠিকই করেন। ঐ বিবরণকেই, যা' কোন কোন স্থলে অস্পষ্ট কোন কোন স্থলে স্পষ্ট, আমরা বিস্তারিত করতে এবং যথাসম্ভব সুনির্দিষ্ট করতে চেষ্টা করে থাকি। একে বাদ দিয়ে আমাদের চলে না, এর মধ্যে অনেক সত্য নিহিত থাকে। কুতর্কের খাতিরে ছাড়া আর কোন ভাবেই এ সব কথা অস্বীকার করা যায় না যে, গ্রীস বা রোম বলে কিছু ছিল, আলেকজাণ্ডার বা সিজার বলে কেউ ছিলেন—কতকগুলি বিপ্লব দ্বারা সামন্ততান্ত্রিক ইয়োরোপ পরিবর্তিত হয়েছিল, ১৫১৭ খ্রীস্টাব্দের ১লা নভেম্বর লুথারের ঘোষণা বিটেম-বার্গের গীর্জার দুয়ারে লাগিয়ে দেওয়া হয়েছিল, অথবা ১৭৮৯ খ্রীস্টাব্দে ১৪ই জুলাই প্যারিসের জনগণ বাস্তিল দুর্গ অধিকার করেছিল। কুতার্কিক প্রশ্ন করতে পারে—এর কি প্রমাণ তোমার আছে? মানবজাতি বলে—আমি স্মরণ করে রেখেছি।

* * ঘটনার জগৎ, বস্তুর জগৎ, ঐতিহাসিক ঘটনার জগৎ—এদেরই সমষ্টি হচ্ছে বাস্তব ও প্রাকৃত জগৎ। এরই মধ্যে প্রাকৃতিক সত্তা (রিয়েলিটি) এবং আধ্যাত্মিক ও মানবিক সত্তা অন্তর্ভুক্ত। এই সমগ্র জগৎটিই প্রতিভান। যথাযথ ভাবে দেখালে ঐতিহাসিক প্রতিভান, আর সম্ভাব্য বা কল্পনার রূপে দেখালে কাল্পনিক বা শৈল্পিক প্রতিভান।

বিজ্ঞান—খাঁটি বিজ্ঞান—যা প্রতিভান নয় সংজ্ঞা, বিশেষ নয় সামান্য—'আত্মার বিজ্ঞান' না হয়েই পারে না, অর্থাৎ তা হচ্ছে সামান্যের জ্ঞান—দর্শন। দর্শন থেকে পৃথক করে, বিজ্ঞানের কথা যদি বলতে হয়, তা' হ'লে আমরা এই বলব যে—এইগুলি পূর্ণাঙ্গ বিজ্ঞান নয়। তারা এমন কতকগুলি জ্ঞানের সমষ্টি. যা' অযুক্তিযুক্তভাবে সিদ্ধান্তিত ও নির্ধারিত। তথাকথিত প্রাকৃত বিজ্ঞান-গুলি অবশ্য স্বীকার করে যে তারা সীমাবদ্ধ এবং ঐতিহাসিক ও প্রাতিভানিক বিষয়ই সেই সীমা। তারা গণনা করে, পরিমাপ করে, ধর্ম নিরূপণ করে, সাদৃশ্য আবিষ্কার করে, শ্রেণীবিভাগ এবং জাতি বিভাগ করে, নিয়ম বা সূত্র নির্ধারণ করে, কি করে এক ঘটনা থেকে অন্য ঘটনার উদ্ভব হয় তার কারণ নির্দেশ করে এবং এই সব করার সময় তারা অবিরাম প্রতিভানলব্ধ ও ইতিহাস-

লব্ধ বিষয়ে যেয়ে হাজির হয়। এমন কি জ্যামিতিও আজকাল স্বীকার করে যে ধরে-নেওয়া প্রকল্পের (হাইপোথিসিস্) উপরেই সে সম্পূর্ণ দাঁড়িয়ে আছে। কারণ, ইউক্লিডের ত্রিমানবিশিষ্ট দেশ, দেশের অন্যতম সম্ভাব্য অবস্থামাত্র এবং ঐ ভাবে বুঝতে সুবিধা হবে বলেই ঐ ভাবে কল্পনা করা হয়েছে। প্রাকৃত বিজ্ঞানের মধ্যে যা' সত্য তা' হয় দর্শন, না হয় ঐতিহাসিক ঘটনা। ঠিক প্রাকৃতিক বলতে যেটুকু সেটুকু হ'চ্ছে নির্বিশেষীকরণ ও কৌশল। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানগুলি যদি পূর্ণাঙ্গ বিজ্ঞান হয়ে উঠতে চায় তা' হ'লে তাদের নিজেদের বৃত্ত অতিক্রম করে দর্শনের বৃত্তে প্রবেশ করতেই হবে। এ কাজ তারা করে এবং করে তখনই যখন প্রাকৃত সংজ্ঞা ছাড়া অন্য যে-কোন রূপ সংজ্ঞা সৃষ্টি করতে চেষ্টা করে, যেমন অব্যাপ্ত পরমাণু, ঈথর স্পন্দন, প্রাণশক্তি, অপ্রতিভেয় দেশ প্রভৃতি। এগুলি যদি নিরর্থক শব্দমাত্র না হয়, তা' হ'লে প্রকৃত দর্শনে পৌঁছানোরই চেষ্টা বলতে হবে। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের সংজ্ঞাগুলি, নিঃসন্দেহে, প্রয়োজনীয় ; কিন্তু তাদের কাছ থেকে তেমনি কোন চিন্তাতন্ত্র পাওয়া যায় না যা একমাত্র আত্মাতেই সম্ভব।

বিজ্ঞান থেকে ঐতিহাসিক এবং প্রাতিভানিক তথ্য বাদ দেওয়া চলে না— তা' শুধু যে, কি করে জ্ঞান বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে একদা-সত্য-বলে-স্বীকৃত বিশ্বাস্-গুলি ক্রমশঃ পৌরাণিক বিশ্বাসের স্তরে—উৎকল্পনাময় ভ্রান্তির স্তরে—নেমে যায় তাকেই ব্যাখ্যা করে তা' নয়, কেমন করে বৈজ্ঞানিকদের মধ্যেও অনেকে তাঁদের শাস্ত্রের অনেক কিছুকেই পৌরাণিক ঘটনা, বাচনিক সুবিধা বা প্রথা বলে থাকেন তাকেও ব্যাখ্যা করে। বৈজ্ঞানিক এবং গণিত শাস্ত্রকারগণ যখন অপ্রস্তুত ভাবে আত্মার বৃত্তি বা শক্তি পর্যালোচনা করতে অগ্রসর হন তখন সেখানেও তাঁরা তাঁদের মানসিক অভ্যাসসহ প্রবেশ করেন এবং প্রচলিত বাক্-প্রথায় দর্শন আলোচনা করেন।

তাঁরা সত্য ও নীতি বিষয়ে প্রথা সৃষ্টি করেন, আত্মা সম্বন্ধেও চূড়ান্ত প্রথা সৃষ্টি করে থাকেন। কিন্তু প্রথা যদি থাকেই, তবে এমন কিছু থাকা চাই যা প্রথা নয়, যা' নিজেই প্রথার জনক। সে হ'চ্ছে মানুষের আত্মিক ক্রিয়া। প্রকৃতি-বিজ্ঞানের সীমাবদ্ধতা, দর্শনের অসীমাবদ্ধতাকেই প্রতিষ্ঠিত করে।

এই সব ব্যাখ্যা দ্বারা দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এই—জ্ঞানের মৌলিক বা বিশুদ্ধ রূপ দু'টি—প্রতিভান এবং সংজ্ঞা—শিল্প এবং বিজ্ঞান বা দর্শন। এদের সঙ্গে ইতিহাসকে যুক্ত করতে হবে এবং ইতিহাস যেন সংজ্ঞার সঙ্গে সংযুক্ত প্রতিভানের ফল—বিশেষ মূর্তিতে থেকেও দর্শনের মর্যাদায় উন্নীত শিল্প। অন্যান্য রূপ (প্রকৃতি-বিজ্ঞান ও গণিত) অবিশুদ্ধ, কারণ নানারকম বাহ্যিক উপাদানের সঙ্গে মিশ্রিত। প্রতিভান দেয় জগতের পরিচয়—'ফেনোমেনন', সংজ্ঞা দেয় অরূপ চৈতন্যের পরিচয়—'নোমেনন'।

চতুর্থ অধ্যায়

শিল্পতত্ত্বে ইতিহাসবাদিতা ও বুদ্ধিবাদিতা

প্রাতিভানিক বা শৈল্পিক জ্ঞানের সঙ্গে জ্ঞানের অন্যান্য মৌলিক ও ব্যুৎপন্ন রূপের সম্পর্ক সুনির্দিষ্ট ভাবে নির্ধারণ করার পরে এবার আমরা শিল্পতত্ত্বের কতকগুলি প্রচলিত মতবাদের ভুল দেখিয়ে দিতে চেষ্টা করতে পারি।

শিল্পের চাহিদা এবং ইতিহাসের চাহিদাকে এক করে ফেলায়, শিল্পের বিষয়বস্তু হচ্ছে "সম্ভাব্য" (probable) এই মতবাদটি (একদা খুব প্রবল ছিল, আজকাল তেমন আদর নেই) দেখা দিয়েছে। ভুল সিদ্ধান্তের যে সাধারণ দশা তা' এখানেও ঘটেছে। সম্ভাব্যের ধারণাটিকে যাঁরা প্রয়োগ করেছিলেন এবং করেন তাঁদের গৃহীত তাৎপর্যটি ঐ শব্দটির নিরূপিত সংজ্ঞার চেয়ে অনেক যুক্তিযুক্ত। সম্ভাব্যতা বলতে বাস্তবিক উপস্থাপনার শৈল্পিক সঙ্গতি (Coherence) অর্থাৎ তার সম্পূর্ণতা এবং আবেদনক্ষমতা বুঝায়। 'সম্ভাব্য'কে যদি—'সঙ্গত' বলে অনুবাদ করা হয় তা' হ'লে সমালোচকদের আলোচনার উদাহরণে এবং সিদ্ধান্তে শব্দটির খাঁটি অর্থ পাওয়া যেতে পারে। কোন অসম্ভব চরিত্র, কমেডির অসম্ভব উপসংহার হ'চ্ছে, সেই চরিত্র যা অতি মন্দরূপে চিত্রিত চরিত্র এবং মন্দ ভাবে বিন্যস্ত উপসংহার—উদ্দেশ্যহীন ঘটনার বিন্যাস। এমন কি পরী বা ভূত-প্রেতেরও সম্ভাব্যতা থাকা চাই—অর্থাৎ যথাযথ পরী ও ভূতপ্রেত হওয়া চাই—সুসমঞ্জস শৈল্পিক প্রতিভান হওয়া চাই—এ কথার মধ্যে বেশ যুক্তি রয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে—সম্ভাব্যের (প্রোবেবল্) পরিবর্তে সম্ভব (পসিবল্) শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। প্রসঙ্গত আগেই এ কথা বলা হয়েছে যে 'সম্ভব' (পসিবল) শব্দটি এবং 'কল্পনীয়' বা প্রতিভানযোগ্য শব্দটি সমার্থক। যা' সত্যরূপে অর্থাৎ সুসঙ্গতরূপে কল্পিত, তাই সম্ভব। অন্যপক্ষে বেশ কিছু সংখ্যক সমালোচক এবং তত্ত্ববিদ সম্ভাব্য বলতে বুঝেছেন—যা' ইতিহাস হিসাবে

বিশ্বাসযোগ্য বা সেই ঐতিহাসিক সত্য যা' প্রমাণযোগ্য নয় অনুমানযোগ্য, সত্য নয় সম্ভাব্য। এই সব মতবাদীরা শিল্পের উপর এই ধর্ম আরোপ করতে চেষ্টা করেছেন। সাহিত্যের ইতিহাসে সম্ভাব্য-সূত্র-ভিত্তিক সমালোচনা একদিন কতখানি অংশ গ্রহণ করেছিল, সে কথা কে না মনে রেখেছে? কে না মনে রেখেছে—ধর্মযুদ্ধের ইতিহাসের উপর ভিত্তি-করে, "জেরুজালেম ডেলিভার্ড" কাব্যের নিন্দা? এবং রাজাদের ও সম্রাটদের আচার-আচরণের সম্ভাব্য রূপের উপর নির্ভর করে—হোমারের কাব্যের সমালোচনা? কোন কোন সময়ে আবার, ঐতিহাসিক বাস্তব ঘটনার শৈল্পিক পুনরুপস্থাপনার দায়িত্ব শিল্পের ঘাড়ে চাপানো হয়েছে। "প্রকৃতির অনুকরণ"-মতবাদের যে ভুল, এই ভুল তারই আর একটি রূপ। পরীক্ষামূলক নাটক বা উপন্যাস রচনার চেষ্টা করতে যেয়ে যথাস্থিতবাদ (ভেরিজিম) এবং প্রাকৃতবাদও (নেচারালিজিম) শৈল্পিক ব্যাপারের সঙ্গে প্রকৃতি-বিজ্ঞানের প্রক্রিয়াকে গুলিয়ে ফেলেছে। শিল্পের প্রক্রিয়ার সঙ্গে দর্শন-বিজ্ঞানের প্রক্রিয়াকে গুলিয়ে ফেলা হয় প্রায়ই। তাই এ কথা প্রায়ই বলা হয় যে শিল্পের উদ্দেশ্য হচ্ছে সংজ্ঞাকে নিদর্শনান্বিত করা, বুদ্ধিলভ্যকে ইন্দ্রিয়ভোগ্যের সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়া, সামান্য ধারণাকে বা ভাবকে রূপায়িত করা। এবং ঐ কথা বলে, শিল্পকে বিজ্ঞানের স্থানে বসানো হয়—শিল্পসৃষ্টি ব্যাপারটিকে শৈল্পিক-নৈয়ায়িক একটি বিশেষ ব্যাপারের সঙ্গে এক করে ফেলা হয়।

শিল্প কোন প্রতিপাদ্যের প্রতিপাদন, শিল্প বিশেষাশ্রিত উপস্থাপনার দ্বারা বৈজ্ঞানিক সূত্রের দৃষ্টান্ত রচনা—এই মতবাদকেও ঐ একই ভাবে মিথ্যা প্রমাণ করা চলে। দৃষ্টান্ত, দৃষ্টান্তরূপে প্রদর্শিতব্য বস্তুরই প্রতিনিধি, সুতরাং সামান্য ধারণারই ব্যাখ্যান—অর্থাৎ বিজ্ঞানেরই সাধারণবোধ্য বা হেয় রূপ।

যখন 'জাতি' বলতে বুঝায় নির্বিষয়তা বা সংজ্ঞা এবং বলা হয়—শিল্পের উদ্দেশ্য বিশেষ ব্যক্তির মধ্যে প্রজাতিকে ব্যক্ত করা, তখন শিল্প জাতিব্যঞ্জক (টিপিকাল) এই মতবাদের বিরুদ্ধেও ঐ একই কথা বলা চলে। আর যদি 'টিপিকাল' বলতে ব্যক্তিবিশেষ বুঝায়, তা'হ'লে এ কেবল কথার প্যাঁচ

ছাড়া আর কিছুই নয়। 'টিপিফাই' (জাতিবৈশিষ্ট্য ব্যক্ত করা) বলতে বুঝাবে ব্যক্তি-বিশেষত্ব বা চরিত্র সৃষ্টি করা (ক্যারেকটারাইজ) অর্থাৎ ব্যক্তিত্বকে নির্ধারণ ও উপস্থাপন করা। ডন্ কুইক্জোট্ একটি জাতি (টাইপ), কিন্তু যত ডন কুইক্জোট আছে তাদের ছাড়া আর কাদের জাতি? বলতে গেলে নিজেরই জাতি। নিশ্চয়ই, সে, বাস্তবজ্ঞানহীনতা কীর্তিপ্রিয়তা প্রভৃতি নির্বিশেষ সংজ্ঞার 'জাতি' নয়। ডন্ কুইক্জোট নয় এমন অসংখ্য লোককে ঐ সব সংজ্ঞার অধীনে স্থান দেওয়া যেতে পারে। অন্যভাবে বলা যায়—কবির প্রকাশনে আমরা আমাদেরই প্রত্যয়গুলি সম্পূর্ণরূপে নির্ধারিত এবং রূপায়িত দেখতে পাই। সেই প্রকাশনকেই আমরা জাতিব্যঞ্জক (টিপিকাল) বলি যাকে আমরা শুধু শৈল্পিক বলতে পারতাম। কাব্যিক বা শৈল্পিক সামান্য সম্বন্ধে এমনি সব কথা বলা হয়েছে এবং তা'তে এইটিই প্রমাণিত হয়েছে যে শৈল্পিক সৃষ্টি সম্পূর্ণ আত্মিক ব্যাপার—রূপের পরাদর্শ সৃষ্টির ব্যাপার বা সামান্যধর্মী (আইডিয়াল)।

এই ভুলগুলি সংশোধন করতে যেয়ে বা ভুল বুঝাবুঝি পরিষ্কার করতে, এ কথাও আমরা বলব যে—সংকেতকে (সিম্বল্) কোন কোন সময় শিল্পের আত্মা (এসেন্স্) বলা হয়েছে। এখন, সংকেতকে যদি শৈল্পিক প্রতিভানের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য বলে মনে করা হয়, তা' হ'লে তা' প্রতিভানেরই সমার্থক, যেহেতু প্রত্যেক প্রতিভানেরই একটা পরা রূপ আছে। শিল্পের জামায় দুটি বোতাম নেই, আছে একটি মাত্রই। শিল্পে সবই সাংকেতিক, কারণ সবই সামান্যধর্মী।

কিন্তু সংকেতকে যদি বিচ্ছেদ্য বলে ধরা হয়—যদি এমন হয় যে সংকেতকে রাখা গেল একদিকে এবং সংকেতিত বস্তুটিকে রাখা গেল অন্য আর এক দিকে, তা' হ'লে আবার আমরা বুদ্ধিবাদীদের ভ্রমে পতিত হব। তথাকথিত সংকেত, নৈর্ব্যক্তিক সংজ্ঞার ব্যাখ্যান হয়ে দাঁড়াবে—'রূপক' হবে। তা' বিজ্ঞানই বা শিল্পের-মুখোস-পরা বিজ্ঞান। অবশ্য রূপক রচনার প্রতি অবিচার করলে চলবে না। কোন কোন ক্ষেত্রে রূপক-রচনা সম্পূর্ণ অক্ষতিকারক। "জেরুজালেমি লিবারেতা' সৃষ্টি হওয়ার পরে তবে রূপক কল্পনা করা হয়েছিল;

মেরিনোর 'এডোনি' রচিত হওয়ার পরে কবি মন্তব্য জুড়ে দিয়েছিলেন—"অসংযমের শোচনীয় পরিণাম দেখানোর উদ্দেশ্যেই গ্রন্থখানি রচিত।" সুন্দরী একটি নারীর মূর্তি গঠন করবার পরে, ভাস্কর ঐ মূর্তিটির গায়ে লিখে রাখতে পারেন—"ক্ষমাশীলতা" বা "সততা"।

এই রূপক, যা সুসম্পন্ন শিল্পকর্মের সঙ্গে পরে জুড়ে দেওয়া হয়, শিল্পকর্মের স্বরূপ বদলে দেয় না। তা' হ'লে একে কি বলব? এ একটি প্রকাশন যা অন্য প্রকাশনের সঙ্গে বহিরঙ্গযোগে যুক্ত। ছোট এক পৃষ্ঠা গদ্য—জেরুজালেমের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া—কবির অন্য একটি ভাবের দ্যোতক। একটি শ্লোক বা একটি স্তবক, 'এডোনি'র সঙ্গে জুড়ে দেওয়া—কবি সামাজিকদের যা বিশ্বাস করাতে চান তারই প্রকাশ। মূর্তির সঙ্গে জুড়ে দেওয়া একটিমাত্র শব্দ 'ক্ষমাশীলতা' বা 'সততা'।

কিন্তু, বুদ্ধিবাদী-ভুলের সবচেয়ে বড় জয় রয়েছে—শিল্পের শ্রেণী বিষয়ক ধারণার মধ্যে—যে ধারণা শিল্পশাস্ত্রে আজও স্থান পেয়ে থাকে এবং সমালোচক-দের ও শিল্পের ইতিহাস লেখকদের বিভ্রান্ত করে থাকে। কি করে এই ধারণার জন্ম হয়েছে তা' দেখা যাক।

মানুষের মন শৈল্পিক স্তর থেকে নৈয়ায়িক স্তরে যেতে পারে এই কারণেই যে প্রথমটি দ্বিতীয়টির তুলনায়, প্রথম ধাপ। সামান্যের চিন্তা দ্বারা সে প্রকাশনকে—বিশেষের চিন্তাকে—নষ্ট করেও দিতে পারে।

কতকগুলি প্রকাশধর্মী ঘটনাকে সে নৈয়ায়িক সম্বন্ধে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখতে পারে। এর আগেই আমরা দেখেছি যে, প্রকাশনে এই ব্যাপারটিই ঘটে থাকে, তবে তার অর্থ এ নয় যে প্রথম প্রকাশনগুলি অবিকৃতভাবেই থাকে। তারা নতুন শৈল্পিক-নৈয়ায়িক প্রক্রিয়ার কাছে আত্মসমর্পণ করে। যখন আমরা দ্বিতীয় ধাপে উঠি, তখন প্রথমকে বর্জন করেই উঠি।

যখন কেউ ছবির গ্যালারিতে প্রবেশ করে বা কতকগুলি কবিতা পাঠ করে তখন ছবি দেখার এবং কবিতাপাঠের পর্যায় অতিক্রম করে সে আরো এগিয়ে যেতে পারে, সে খুঁজে দেখতে পারে কোন্ বস্তুকে এবং কিভাবে প্রকাশ করা হয়েছে। তখন ঐ ছবিগুলি এবং রচনাগুলি, যার প্রত্যেকটিই নিজ নিজ

বিশেষত্বে বিশিষ্ট এবং নৈয়ায়িক ভাষায় অপ্রকাশ্য, ক্রমশঃ কতকগুলি সামান্য বচনের আওতায় আসতে থাকে—যেমন, পরিচ্ছদ, প্রাকৃতিক দৃশ্য, মূর্তি, গার্হস্থ্য জীবন, যুদ্ধ, প্রাণী, ফুল, ফল, সমুদ্রের দৃশ্য, সরোবর, মরুভূমি, ট্রাজিক, হাস্যোদ্দীপক, করুণ, নিষ্ঠুর, নীতিধর্মী, মহাকাব্য, নাট্য, বীররসাত্মক, গ্রাম্য এমনি আরো সব। আবার পরিমাণের ভিত্তিতেও নানা নামে অভিহিত হয়ে থাকে—যেমন ক্ষুদ্রাকৃতি, ছবি, মূর্তি, গুচ্ছ, চরণগাথা, গাথা, সনেট, সনেটগুচ্ছ, কবিতা, কাব্য, কাহিনী, রোমাঞ্চ প্রভৃতি।

যখন আমরা ঐ 'গার্হস্থ্যজীবন' বা বীররসাত্মক বা গ্রাম্য ছড়া বা নিষ্ঠুরতা বা উল্লিখিত পরিমাণবোধক কোন সামান্য বচনের কথা ভাবি, তখন আমরা মূল শিল্পকর্ম থেকে অনেক দূরে সরে যাই। শিল্পরসিক থেকে আমরা নৈয়ায়িকে পরিণত হয়ে যাই, শিল্পের সহৃদয় বোদ্ধা থেকে তার্কিকে পরিণত হই। নিশ্চয়ই, এই হওয়া নিয়ে কোন আপত্তি উঠতে পারবে না। এ ছাড়া আর কোন্ উপায়েই বা বিজ্ঞান শৈল্পিক প্রকাশনকে আত্মসাৎ করে নিয়ে অথচ তাকে ছাড়িয়ে যেয়ে তার উদ্দেশ্য সিদ্ধি করতে এগিয়ে যাবে ? নৈয়ায়িক বা বৈজ্ঞানিক রূপটি শৈল্পিক রূপকে পরিহার করেই সম্ভব হয়। যিনি বৈজ্ঞানিকের মতো চিন্তা করতে আরম্ভ করেছেন, বুঝতে হবে তিনি আগেই শিল্পীর মতো ধ্যান করা থেকে সরে এসেছেন—যদিও তাঁর চিন্তা শৈল্পিক রূপ পরিগ্রহ করতে না পারে এমন নয়। এ সম্বন্ধে আগেই আলোচনা করা হয়েছে এবং এখানে সে সম্বন্ধে আবার কিছু বলা বাহুল্য।

ভুল আরম্ভ হয় তখনই যখন আমরা সংজ্ঞা থেকে প্রকাশনের উৎপত্তি প্রতিপাদন করতে চেষ্টা করি এবং যে রূপটি তৈরী হয় তার মধ্যে,যে বস্তু থেকে ঐ রূপের সৃষ্টি তার নিয়মকানুন খুঁজতে চেষ্টা করি, যখন দ্বিতীয় পর্যায় ও প্রথম পর্যায়ের পার্থক্য লক্ষ্য করা হয়নি এবং যখন তারই ফলে, আমরা দ্বিতীয় পর্যায়ে দাঁড়িয়ে থাকা সত্ত্বেও প্রথম পর্যায়ে দাঁড়িয়ে আছি বলে ঘোষণা করি। এই ভুলটি—'শৈল্পিক ও সাহিত্যিক শ্রেণীকল্পনাবাদ' (থিওরি অফ আর্টিস্টিক এ্যাণ্ড লিটারারি কাইন্‌ড্‌স্) নামে পরিচিত।

গার্হস্থ্যজীবন, শিভালরি, গ্রাম্য ছড়া, নিষ্ঠুরতা প্রভৃতির শৈল্পিক রূপটি কি? এই বস্তুগুলি কি করে রূপান্বিত করা যেতে পারে?—এমনি একটা মিথ্যা সমস্যা শৈল্পিক ও সাহিত্যিক শ্রেণীকল্পনা-মতবাদের মধ্যে অন্তর্নিহিত রয়েছে। বিভিন্ন শ্রেণীর রচনার সূত্র ও নিয়ম খোঁজার চেষ্টা এরই প্রেরণা থেকে এসেছে। গার্হস্থ্যজীবন, শিভালরি, গ্রাম্যগীতি, নিষ্ঠুরতা প্রভৃতি প্রত্যয়জাতীয় কিছু নয়, তারা হ'চ্ছে—সংজ্ঞা, তারা বিষয়বস্তু বা আধেয় নয়, নৈয়ায়িক-শৈল্পিক আধার বা রূপ যা নিজেই' রূপ তাকে প্রকাশ করতে পারে না, কারণ তা' আগেই প্রকাশিত। নিষ্ঠুরতা, গ্রাম্যগীতি, শিভালরি, গার্হস্থ্যজীবন প্রভৃতি শব্দগুলি, ঐ সব সংজ্ঞার প্রকাশ ছাড়া আর কি?

এমন কি অতিসূক্ষ্ম ভেদকল্পনাও, আপাতদৃষ্টিতে দেখতে যা সবচেয়ে দার্শনিক, সমালোচনার অতীত নয়। যেমন শিল্পকর্মকে যখন আত্মবিষয়ী এবং বস্তুবিষয়ী, গীতিধর্মী ও কাহিনীধর্মী, রস-প্রধান ও অলঙ্কার-প্রধান এমনি ভাগে ভাগ করা হয়। শৈল্পিক বিশ্লেষণে. বস্তুবিষয়ী থেকে আত্মবিষয়ীকে, কাহিনীধর্মী থেকে গীতিধর্মীকে, বস্তুর রূপ থেকে ভাবের রূপকে, পৃথক করা সম্ভব নয়।

"* * * 'শৈল্পিক ও সাহিত্যিক শ্রেণীকল্পনা-মতবাদ' থেকে বিচারের ও সমালোচনার ভুল পদ্ধতির উৎপত্তি হয়। ধন্য এই সমালোচনা! শিল্পকর্ম—সুপ্রকাশিত কি না এবং কি প্রকাশ করেছে, যা' বলতে চায় তা' ঠিক বলতে পেরেছে কিনা, না তোতলার মতো তো-তো করছে বা সম্পূর্ণ মূক হয়ে আছে এসব প্রশ্ন না করে তারা প্রশ্ন করে—মহাকাব্যের সূত্র মেনেছে কি না, ঐতিহাসিক চিত্রের বা ট্রাজেডির বা প্রাকৃতিক দৃশ্যের নিয়ম মেনেছে কিনা।

মুখে স্বীকার করার ভান করেও, কপট আনুগত্য দেখিয়েও, শিল্পীরা অবশ্য, সর্বদাই ঐ সব সূত্র উপেক্ষা করে আসছেন। প্রত্যেক মৌলিক রচনাই প্রতিষ্ঠিত নিয়ম ভেঙেছে এবং সমালোচকদের ধারণা বদলে দিয়েছে। যার ফলে তাঁরা সূত্র বড়ো করতে বাধ্য হয়েছেন এবং শেষ পর্যন্ত আরো নতুন শিল্পের আগমনে সেই বড়ো সূত্রও ছোট হয়ে গেছে। আর স্বাভাবিক

ভাবেই নতুন নতুন সূত্র, নতুন বিহ্বলতা এবং নতুন সম্প্রসারণ দেখা দিয়েছে।

ঐ একই মতবাদ থেকে আরো অনেক কুসংস্কার জন্মেছে—যার জন্য একদিন (আজও কি সেদিন গেছে?) লোকে আক্ষেপ করেছে—ইতালীর কোন ট্রাজেডি নেই। (তারপর একজন এলেন, এসে, গৌরব মাল্যটি পরিয়ে দিয়ে গৌরব সম্পূর্ণ করলেন), ফ্রান্সের কোন মহাকাব্য নেই—(হেনরিয়াদ এসে সমালোচকদের তৃষ্ণার্ত কণ্ঠ সিক্ত করল)। নতুন শ্রেণীর উদ্ভাবককে যে প্রশস্তি দেওয়া হয়েছে তার মূলে আছে এই কুসংস্কার। এই সংস্কার এত প্রবল যে সপ্তদশ শতাব্দীতে ব্যঙ্গ মহাকাব্যের উদ্‌ভাবনকে—একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বলে মনে করা হয়েছিল এবং তার মর্যাদা নিয়ে অনেক প্রশ্ন উঠেছিল—যেন ঘটনাটি আমেরিকা-আবিষ্কার বিশেষ। কিন্তু ঐ নামাঙ্কিত রচনাগুলি (Secchia rapita and the Scherno degli Dei) ছিল অকালজাত, কারণ তাদের রচয়িতাদের নতুন বা মৌলিক বক্তব্য কিছুই ছিল না। অল্পশক্তির দল কৃত্রিম ভাবে নতুন রীতির আবিষ্কারের জন্য উঠেপড়ে লেগেছিল। গ্রাম্যগীতিকার সঙ্গে মৈনিকগীতি (পিস্‌কেটোরিয়াল) এবং তারপর সমরগীতি যুক্ত হল।

'আমিন্তা'কে (Aminta) চুবিয়ে 'আলসিও' (Alceo) করা হল। তারপর, শিল্প-সাহিত্যের ঐতিহাসিকরা এই শ্রেণীকল্পনার ধারণায় এতই মুগ্ধ যে তাঁরা বিশেষ বিশেষ শিল্পকর্মের ইতিহাস লেখার পরিবর্তে ঐ সব ফাঁকা ছায়ামূর্তির—বিভিন্ন শ্রেণীর ইতিহাস রচনায় নিযুক্ত হলেন। তাঁরা শৈল্পিক প্রতিভার ক্রমবিকাশের চিত্র না এঁকে নানা শ্রেণীর ক্রমবিকাশ আঁকতে চেষ্টা করলেন। শৈল্পিক ও সাহিত্যিক শ্রেণীবিভাগের দার্শনিক নিন্দা পাওয়া যায়—শৈল্পিক ক্রিয়া যা সর্বদাই করে এসেছে এবং সুরুচির কাছে যে সর্বদাই ধরা পড়েছে তারই সৃজনের ও প্রতিপাদনের মধ্যে। যদি সুরুচির সঙ্গে সূত্রনিষ্ঠ রচনার বিরোধ হয়, আমরা তা' হ'লে কি করব?

* * *—ট্রাজেডি, কমেডি, ড্রামা, রোমান্স, দৈনন্দিন জীবনের চিত্র, যুদ্ধ বর্ণনা, প্রাকৃতিক দৃশ্য, সমুদ্রদৃশ্য, কবিতা, গীতিকবিতা প্রভৃতি—যদি শুধু বস্তুগুলি

বুঝাবার উদ্দেশ্যেই এবং কতকগুলি বিশেষ জাতীয় রচনার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্য ব্যবহৃত হয়, তা' হ'লে ঐগুলি বলা, বৈজ্ঞানিক বিচারের দিক দিয়ে, মিথ্যা কিছু নয়। শব্দ বা বাক্যাংশ ব্যবহার করা মানেই সূত্র বা সংজ্ঞা নির্ধারণ করা নয়। ভুল করা হয় তখনই যখন ঐ শব্দকে বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞার গুরুত্ব দেওয়া হয়, যখন আমরা ঐ সব পরিভাষার জালে নিজেদের জড়িয়ে ফেলি। অনুগ্রহ করে একটি উপমা দেওয়ার অনুমতি দিন। গ্রন্থাগারে গ্রন্থগুলি এক ভাবে,কি অন্য ভাবে সাজাতেই হবে। সাধারণতঃ এই কাজ করা হয়—বিষয়ের ভিত্তিতে শ্রেণীবিভাগ করে (অবশ্য তার মধ্যে 'বিবিধ' ব'লেও একটি বিভাগ থাকে), তা সাজানো হয়—আকার অনুসারে বা প্রকাশক অনুসারে। এইরূপ সাজানোর আবশ্যকতা ও উপযোগিতা কে অস্বীকার করবে ? কিন্তু কেউ যদি ঐ 'বিবিধ'-বিভাগের এলডাইনস (Aldines) এবং বোদোনিসের (Bodonis), 'এ' শেল্‌ফের বা 'বি' শেলফের অর্থাৎ কাজের সুবিধার জন্য যে সব মোটামুটি বিভাগ করা হয়েছে তাদের সাহিত্যিক নিয়ম খুঁজতে চেষ্টা করে, তা'হ'লে আমাদের কি বলা উচিত ? তবু কেউ যদি তা' করতে যায় তবে সে, যারা শ্রেণী-বিভাগের শৈল্পিক সূত্র আবিষ্কার করতে চেষ্টা করে তাদের চেয়ে একটুও কম বা বেশী কিছু করে না।

পঞ্চম অধ্যায়

ইতিহাস-তত্ত্বে এবং ন্যায়শাস্ত্রে সদৃশ ভুল

এই অধ্যায়ে ক্রোচে নিম্নলিখিত বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন :—

(ক) 'ইতিহাসের দর্শন' কথাটির সমালোচনা।

(খ) ন্যায়শাস্ত্রে শিল্পতত্ত্বের অনুপ্রবেশ।

(গ) ন্যায়শাস্ত্রের স্বধর্ম।

(ঘ) নৈয়ায়িক ও অনৈয়ায়িক সিদ্ধান্তের পার্থক্য।

(ঙ) যুক্তিন্যাস (সিলোজিস্টিক)।

(চ) নৈয়ায়িক মিথ্যা ও শৈল্পিক সত্য।

(ছ) ন্যায়ের নবসংস্করণ।

*   *   *

এই সব সমালোচনাকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন করবার পক্ষে, শিল্পের স্বরূপ এবং ইতিহাসের ও বিজ্ঞানের সঙ্গে তার সম্বন্ধ না জানা থেকে যে সব সজাতীয় ও বিজাতীয় ভুল জন্মেছে তাদের দিকে একবার দ্রুত দৃকপাত করা খুব কাজের কাজ হবে। এই ভুলগুলি ইতিহাসের ও বিজ্ঞানের তত্ত্বের, ইতিহাস-তত্ত্বের ও ন্যায়শাস্ত্রের সমান মাত্রায় ক্ষতিসাধন করেছে।

ইতিহাসের ক্ষেত্রে বুদ্ধিবাদ প্রতিষ্ঠিত হওয়ায়, বিগত দুই শতাব্দী ধরে এবং আজও পর্যন্ত, ইতিহাসের দর্শন, আদর্শ ইতিহাস, সমাজ বিজ্ঞান, ঐতিহাসিক মনস্তত্ত্ব, অথবা ইতিহাস থেকে সংজ্ঞা ও সার্বভৌম নিয়ম সংগ্রহ করবার চেষ্টাকে যে বিজ্ঞানই বলা হোক না কেন সেই রকম কোন বিজ্ঞান, আবিষ্কার করার চেষ্টা চলছে। এই সূত্র বা সার্বজনীন নিয়ম কি হবে? ঐতিহাসিক নিয়ম এবং ঐতিহাসিক সংজ্ঞা? তা' হ'লে জ্ঞানতত্ত্বের সঙ্গে অতি প্রাথমিক পরিচয় ঘটলেই—ঐ চেষ্টার মিথ্যাত্ব পরিষ্কার বুঝা যাবে। 'ঐতিহাসিক সূত্র', 'ঐতিহাসিক সংজ্ঞা' এই কথাগুলি যদি নিছক রূপক প্রয়োগ

না হয়, তা' হ'লে তারা প্রকৃত স্বতোবিরুদ্ধ শব্দ। বিশেষণটি ঐ বিশেষ্যে ঠিক তেমনি অনুপযোগী যেমন অনুপযোগী—'গুণধর্মী সংখ্যা' বা 'বহুত্বধর্মী অদ্বৈতবাদ' প্রভৃতি কথায়। ইতিহাস বললেই বুঝায়—বিশেষত্ব ও ব্যক্তিত্ব আর সূত্র বা সংজ্ঞা বলতে বুঝায় নৈর্ব্যক্তিকতা ও সার্বজনীনতা বা সামান্যত্ব। অবশ্য ইতিহাস থেকে ঐতিহাসিক সাধারণসূত্র ও সংজ্ঞা বের করবার চেষ্টা যদি বাদ দেওয়া হয় এবং তার পরিবর্তে শুধু কিছু সূত্র বা সংজ্ঞা নির্ধারণ করার ইচ্ছা পোষণ করা হয়, তা' হ'লে সেই চেষ্টা নিশ্চয়ই হাস্যাস্পদ নয়। কিন্তু তা' থেকে যে বিজ্ঞান পাওয়া যাবে, তা' ইতিহাসের দর্শন হবে না, তা' হবে, অবস্থা বিশেষে—নীতিশাস্ত্র, ন্যায়শাস্ত্র প্রভৃতি দর্শনের বিভিন্ন অঙ্গ, অথবা অসংখ্য বিভাগ-উপবিভাগ সমন্বিত প্রাকৃতিক বিজ্ঞান। বস্তুতঃ এই অনুসন্ধান হয় সেই সব দার্শনিক সংজ্ঞার অনুসন্ধান—যারা, আগেই বলা হয়েছে, প্রত্যেক ঐতিহাসিক রচনার ভিত্তি, এবং যারা প্রতিভান থেকে প্রতীতিকে, বিশুদ্ধ প্রতিভান থেকে ঐতিহাসিক প্রতিভানকে, শিল্প থেকে ইতিহাসকে পৃথক করে, অথবা সেই সব পূর্বনির্বাপিত ঐতিহাসিক প্রতিভানগুলির সন্ধান যারা প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের পদ্ধতি অনুসারে বিভিন্ন বিভাগে এবং জাতিতে সংগৃহীত ও সজ্জিত হয়েছে। অনেক সময় বড বড চিন্তাশীল ব্যক্তিরাও ইতিহাস-দর্শনের বেমানান পরিচ্ছদটি পরিধান করেছেন এবং আবরণ সত্ত্বেও, তাঁরা উচ্চাঙ্গের দার্শনিক সত্য লাভ করেছেন। বহিরাবরণ পরিত্যক্ত হ'লে, সত্য বিরাজ করেছে। আধুনিক সমাজ-বিজ্ঞানীরা সমাজবিজ্ঞান নামক অসম্ভব বিজ্ঞানের কথা বলে যে ভ্রান্তির মধ্যে জডিয়ে পডেন তার জন্য তাঁদের অতটা দোষ দেওয়া যায় না যতটা দেওয়া যায় ঐ ভ্রান্তিজনিত অনুর্বরতার জন্য। শিল্পতত্ত্বকে সমাজ-বৈজ্ঞানিক শিল্পতত্ত্ব বলা বা ন্যায়শাস্ত্রকে 'সমাজবৈজ্ঞানিক ন্যায়শাস্ত্র' বলা—বলা না-বলা সমান কথা। কিন্তু বড় বিপদ হচ্ছে এই যে ঐরূপ শিল্পতত্ত্ব (চমকদারী 'সেন্‌সেশানালিজিম্'-এরই) পুরোনো কথা এবং ঐরূপ ন্যায়শাস্ত্র খাপছাড়া বচনবিন্যাস ছাড়া আর কিছুই নয়। তবে যে দার্শনিক আন্দোলনের উল্লেখ আমরা করেছি, তা ইতিহাসের ক্ষেত্রে দু'টি ভাল ফল সৃষ্টি করেছে। প্রথমতঃ ইতিহাসের

তত্ত্ব জানার জন্য অর্থাৎ ইতিহাসের স্বরূপ এবং সীমা জানার জন্য ঐকান্তিক কামনা জাগিয়েছে। জাগিয়েছে এমন একটি তত্ত্বজিজ্ঞাসা যা, পূর্বের বিশ্লেষণের সঙ্গে সঙ্গতি রাখতে যেয়ে, প্রতিভানের সাধারণ বিজ্ঞানে অর্থাৎ ইতিহাসতত্ত্ব যার একটি বিশেষ অধ্যায় সেই শিল্পতত্ত্বে না পৌঁছে শান্তি পায় না। দ্বিতীয়তঃ, ঐতিহাসিক ঘটনা সম্বন্ধে যথার্থ সত্যকে ইতিহাস-দর্শনের মিথ্যা আবরণের আচ্ছাদনে ব্যক্ত করা হয়েছে। এমন নিয়ম এবং সতর্কবাণী তৈরী করা হয়েছে, যা শুধু প্রত্যক্ষেরই উপর ভিত্তি করে করা বটে, কিন্তু শিক্ষার্থী ও সমালোচকের কাছে অপ্রয়োজনীয় নয়। এমন কি অতি-আধুনিক ইতিহাস-দর্শন যা ঐতিহাসিক বস্তুবাদ নামে পরিচিত, যা সমাজজীবনের বিভিন্ন দিকের উপর—যে দিকগুলি আগে উপেক্ষিত বা ভুল বুঝা হয়েছে তাদের উপর—স্পষ্ট আলো নিক্ষেপ করেছে।

* * পূর্বাচার্য-আনুগত্যের নিদর্শন—বিজ্ঞানের এবং দর্শনের ক্ষেত্রে ইতিহাসের অনুপ্রবেশ। সব সম্প্রদায়েরই উপরে এর কর্তৃত্ব রয়েছে এবং পরিচিন্তন এবং দার্শনিক বিশ্লেষণের স্থলে এ ইতিহাসের মতো এর-ওর সাক্ষ্য, প্রমাণ, এবং প্রামাণিক সিদ্ধান্ত হাজির করে। কিন্তু যে ন্যায়শাস্ত্রকে—চিন্তার এবং বৌদ্ধিক জ্ঞানের বিজ্ঞান বলে তাকেই—শৈল্পিক ব্যাপারের স্বরূপ জ্ঞানের অসম্পূর্ণতার জন্য সব চেয়ে গুরুতর এবং মারাত্মক বাধায় এবং ভুলে ভুগতে হয়েছে। আর যখন নৈয়ায়িক ব্যাপার শৈল্পিক ব্যাপারের পরবর্তী পর্যায় এবং শৈল্পিক ব্যাপার-সাপেক্ষ, তখন তা' হবেই বা না কেন ?

শিল্পতত্ত্ব খাঁটি না হ'লে, ন্যায়শাস্ত্রও খাঁটি থাকতে পারে না।

'এরিস্টটলের অর্গানোন্' থেকে আরম্ভ করে আধুনিক যুগের ন্যায়শাস্ত্রের গ্রন্থ পর্যন্ত যত ন্যায়শাস্ত্র লেখা হয়েছে, তাদের যে কোন একখানা খুললেই, স্বীকার করতে হবে যে, সবগুলিতেই বাক্‌বিধান (verbal facts) ও চিন্তাবিধানের (facts of thought) ব্যাকরণের রূপের এবং বৌদ্ধিক জ্ঞানের, শিল্পতত্ত্বের এবং ন্যায়শাস্ত্রের খিঁচুড়ি পাকানো হয়েছে। বাক্‌বিধির ক্ষেত্র ছেড়ে চিন্তার স্বরূপ ধরবার চেষ্টা যে একেবারেই হয়নি এমন নয়। এরিষ্টটলের ন্যায়শাস্ত্র ও বিনা দ্বিধায় যুক্তিসর্বস্ব ও বাক্‌সর্বস্ব হ'তে পারেনি।

মধ্যযুগের নামবাদী (নোমিনালিস্ট), বাস্তববাদী (রিয়েলিস্ট) এবং সংজ্ঞাবাদীরা (কনসেপ্‌চুয়ালিস্ট) যখন বাগ্‌বিতণ্ডা করেছেন, তখনও মাঝে মাঝে ন্যায়শাস্ত্রের আসল সমস্যাটিকে স্পর্শ করেছেন। গ্যালিলিও এবং বেকন, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান আলোচনায় আরোহী যুক্তিন্যাসকে সম্মানের আসন দিয়েছেন। ভিকো উদ্‌ভাবনী পদ্ধতির (inventive methods) পক্ষ নিয়ে, যুক্তিসর্বস্ব ও গাণিতিক ন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন। কাণ্ট পূর্বতঃসিদ্ধ সংশ্লেষের (আপ্রিয়োরি সিন্‌থেসিস্) দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। পরা ভাববাদ (এবসোলিয়ুট আইডিয়ালিজিম্) এরিস্টটলপন্থী ন্যায়শাস্ত্রের নিন্দা করেছে। হার্বার্টের অনুগামীরা এখনও এরিস্টটলের অনুগত থাকলেও, অন্যান্য নৈয়ায়িক সিদ্ধান্ত থেকে সম্পূর্ণ পৃথক যে বর্ণনাত্মক সিদ্ধান্ত তারই উপরে বেশী জোর দিয়েছেন। শেষ পর্যন্ত, ভাষাতত্ত্ববিদরা সংজ্ঞা-বিষয়ে শব্দটির অযুক্তিযুক্ততা দেখাতে চেয়েছেন।

কিন্তু সংস্কারের সচেতন সুনিশ্চিত,এবং মৌলিক আন্দোলন,—শিল্প বিজ্ঞানে ছাড়া আর কোন কিছুতেই তার ভিত্তি বা পার্থক্য বিন্দু খুঁজে পাবে না।

* * * ন্যায়শাস্ত্রের স্বরূপ-সম্বন্ধ আলোচনা করতে যেয়ে ক্রোচে বলেছেন—এই ভিত্তিতে সংস্কৃত যে ন্যাযশাস্ত্র, তাতে এই সত্যই প্রথম এবং প্রধান ভাবে ঘোষণা করতে হবে এবং তা থেকে যে অনুসিদ্ধান্ত স্বাভাবিক তা' টানতে হবে যে,—নৈয়ায়িক ব্যাপারের—একমাত্র নৈয়ায়িক ব্যাপারেরই ফল হচ্ছে—সংজ্ঞা—সামান্য জ্ঞান, আত্মা যা গঠন করে এবং যেহেতু আত্মার সৃষ্টি—সামান্য জ্ঞান। আরোহী ন্যায় বলতে যদি এই বুঝা হয়—যেমন অনেক সময় বুঝা হয়েছে,—সামান্য জ্ঞানের গঠন এবং অবরোহী ন্যায় বলতে বুঝায় তাদের বাচনিক পরিণতি, তা' হ'লে, এ অতি খাঁটি কথা যে খাঁটি ন্যায়শাস্ত্র আরোহী ন্যায়শাস্ত্র ছাড়া অন্য কিছুই হতে পারে না। কিন্তু যেহেতু অবরোহ-ন্যায় বলতে প্রায়ই গণিতের ক্রিয়াপ্রক্রিয়া এবং আরোহ-ন্যায় বলতে প্রকৃতি-বিজ্ঞানের ক্রিয়াপ্রক্রিয়া বুঝায়, সেইহেতু উভয় শব্দকেই পরিহার করা ভাল এবং বলা উচিত—খাঁটি ন্যায়শাস্ত্র হচ্ছে—সংজ্ঞার ন্যায়শাস্ত্র। সংজ্ঞার ন্যায়শাস্ত্র অবরোহ এবং আরোহ উভয় ক্রিয়াপ্রক্রিয়াকে প্রয়োগ করে বলে, কোনটিকেই

একমাত্র করে তোলে না ; অর্থাৎ সে ন্যায়ের যা স্বধর্ম সেই জল্পনা প্রক্রিয়াকেই প্রয়োগ করে। সংজ্ঞা বা সামান্য জ্ঞান—তার নৈর্ব্যক্তিক স্বরূপে অপ্রকাশ্য। কোনও শব্দ দিয়েই তাকে প্রকাশ করা যায় না এটা এতো সত্য যে, নৈয়ায়িক সংজ্ঞা, বাচনিক রূপের বৈচিত্র্য সত্ত্বেও, সর্বদা একই থেকে যায়। সংজ্ঞার ক্ষেত্রে প্রকাশন হচ্ছে নিছক চিহ্ন বা সংকেত। প্রকাশ থাকবেই, না থেকেই পারে না। কিন্তু সেটা কি হবে, এই হবে কি ঐ হবে, বক্তা ব্যক্তির ঐতিহাসিক ও মনস্তাত্ত্বিক অবস্থা দ্বারা তা' নিরূপিত হয়ে থাকে। সংজ্ঞার প্রকৃতি থেকে প্রকাশের বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করা চলে না। শব্দের যথার্থ (নৈয়ায়িক) অর্থ বলে কোন জিনিস নেই ; শব্দের যথার্থ অর্থ হচ্ছে সেই অর্থ যা ব্যক্তি সংজ্ঞা গঠনের সময় প্রতিবারে আরোপ করে।

এরূপ অবস্থায় খাঁটি নৈয়ায়িক (শৈল্পিক-নৈয়ায়িক) বাক্য—ঐকান্তিক নৈয়ায়িক সিদ্ধান্ত হচ্ছে সেইগুলি যাদের প্রধান এবং একমাত্র উদ্দেশ্য—সংজ্ঞা নির্ধারণ। এই বাক্য বা সিদ্ধান্তগুলি—লক্ষণ (ডেফিনিশানস্)। বিজ্ঞান নিজেই একটি চূড়ান্ত লক্ষণের সঙ্গে অন্বিত কতকগুলি লক্ষণের সমষ্টি—অর্থাৎ সংজ্ঞাতন্ত্র ছাড়া আর কিছুই নয়।

অতএব, যে সব বাক্য সামান্যকে প্রতিষ্ঠিত করে না, ন্যায়শাস্ত্র থেকে তাদের (প্রাথমিক কর্তব্য হিসাবে) বাদ দেওয়া উচিত। বর্ণনাত্মক সিদ্ধান্ত এবং এরিস্টটল-কথিত অসংজ্ঞাবাচী সিদ্ধান্ত—যেমন, বাসনার প্রকাশ প্রভৃতি যথার্থ নৈয়ায়িক সিদ্ধান্ত নয়। তারা বিশুদ্ধ শৈল্পিক বাক্য অথবা ঐতিহাসিক বাক্য—এই দুয়ের একটি।

পেটার যাচ্ছে, আজ বৃষ্টি হবে, আমার ঘুম আসছে, আমি পড়তে চাই,—এই সব এবং এই ধরনের অসংখ্য বাক্য, পেটারের গমন, বৃষ্টির পতন, দেহের নিদ্রাবেশ, পড়ার ইচ্ছা প্রভৃতি ঘটনার প্রত্যয়কে, শব্দের পরিচ্ছদ পরিয়ে ব্যক্ত করা ছাড়া অথবা ঐসব ঘটনার অস্তিত্ব বিষয়ে স্বীকারোক্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। তারা বাস্তবের অথবা অবাস্তবের প্রকাশ ; ঐতিহাসিক-কাল্পনিক অথবা বিশুদ্ধ কাল্পনিক ; নিশ্চয়ই তারা সামান্যের সংজ্ঞা নয়।

এগুলি বাদ দেওয়া তেমন কঠিন কাজ নয়। সকলেই এর প্রয়োজনীয়তা

স্বীকার করেছেন। এখন যা দরকার সে হচ্ছে বর্জন-ব্যাপারটিকে কার্যে পরিণত করা। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে মানুষের চিন্তার যে অংশ 'সিলোজিস্টিক' নামে পরিচিত, যা সংজ্ঞার উপর নির্ভর করে যুক্তিবিন্যাস ও সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর চেষ্টা, তার সম্বন্ধে কি করা যাবে ? 'সিলোজিস্টিক' কাকে বলে ? 'স্কোলাস্টিসিজিম'-এর প্রতিক্রিয়ায় মানবতাবাদীরা(হিউম্যানিস্ট) বিজ্ঞানবাদীরা এবং প্রকৃতিবিজ্ঞানের পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা পদ্ধতির প্রতি বিস্মিত শ্রদ্ধায় আধুনিক যুগ যে ভাবে বাদবিতণ্ডাকে হেয় মনে করেছে, সেভাবে হেয় মনে করতে হবে কি ?

সিলোজিস্টিক—বা পদ্ধতি অনুসারে যুক্তিবিন্যাস—সত্যের আবিষ্কার নয়, এ হচ্ছে প্রতিপাদন করার, বিতর্ক করার, নিজের বা অপরের সঙ্গে তর্ক করার কৌশল। পূর্ব-নিরূপিত সংজ্ঞা থেকে পূর্ব-পর্যবেক্ষিত ঘটনা থেকে অগ্রসর হয়ে, সত্যের সঙ্গে বা চিন্তার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে (আইডেণ্টিটি বা সাদৃশ্যের এবং কনট্রাডিক্শান বা বিরোধের সূত্র বলতেও তাই বুঝায়) সে ঐসব তথ্যের উপর নির্ভর করে অনুমান করে অর্থাৎ যা আবিষ্কৃত হয়েছে তাকেই পুনরায় ব্যক্ত করে। অতএব আবিষ্কারের দিক থেকে এ যদি হয় "আইডেম্ পার আইডেম"—তবে শিক্ষাদান ব্যাপারে এবং ব্যাখ্যান ব্যাপারে এ খুবই উপকারী। বক্তব্যকে যুক্তিতন্ত্রে পরিণত করতে পারা নিজের চিন্তাকে নিয়ন্ত্রিত করবার এবং অন্যের চিন্তাকে সমালোচনা করবার উপায়। তার্কিকদের নিয়ে উপহাস করা সহজ, কিন্তু যুক্তিতর্কের যদি জন্ম হয়ে থাকে এবং আজও যদি সে টিকে থেকে থাকে তা' হ'লে বুঝতে হবে তার থাকার যথেষ্ট কারণ আছে বলেই আছে। উপহাস করতে গেলে, উপহাস করা যেতে পারে এর আতিশয্যকে বা বিকৃতিকে ; যেমন'সিদ্ধ ·ঘটনাকে বা প্রত্যক্ষকে বা প্রতিভানকে যুক্তিতর্ক দিয়ে প্রমাণ করার চেষ্টা, যুক্তির বাতিকে গভীর ধ্যান এবং সংস্কারমুক্ত মনে সমস্যার অনুসন্ধান উপেক্ষা করার চেষ্টা। যদি তথাকথিত গাণিতিক ন্যায় আমাদের অনায়াস স্মরণে, আমাদের চিন্তাকে দ্রুত সংযমনে সাহায্য করে, তা' হ'লে এই যুক্তি-রীতিকে আমরা স্বাগত জানাতে পারি। লাইবনিৎসের মধ্যে এর প্রথম আভাস পাওয়া

গেছে, এবং আমাদের যুগের কেউ কেউ এই রীতি অনুসরণের চেষ্টা করেছেন।

কিন্তু যেহেতু যুক্তিন্যাসরীতি (সিলোজিস্টিক) ব্যাখ্যান এবং বিতর্কের কৌশল সেইহেতু এর তত্ত্ববিচার দার্শনিক ন্যায়শাস্ত্রের মুখ্য বিষয়বস্তু হতে পারে না। যে সংজ্ঞাতন্ত্র প্রধান ও কেন্দ্রীয় তত্ত্ব, যাতে সিলোজিস্টিকের মধ্যে যা' কিছু নৈয়ায়িক আছে তাকে নিঃশেষে পর্যবসিত করা যায় (সংজ্ঞার সম্বন্ধ, অধীনীকরণ, সমানুশাসন, একীকরণ প্রভৃতি), সেই সংজ্ঞাতত্ত্বের অধিকার দাবি করতে পারে না। আর এ কথাও ভুলে গেলে চলবে না যে সংজ্ঞা এবং (নৈয়ায়িক) সিদ্ধান্ত এবং যুক্তিবিন্যাস সমপংক্তিক নয়। একমাত্র প্রথমটিই নৈয়ায়িক ব্যাপার, দ্বিতীয়টি এবং তৃতীয়টি হচ্ছে প্রথমটিরই অভি-ব্যক্তির উপায়। রূপ বলেই এগুলি শিল্পতত্ত্বানুসারে (ব্যাকরণানুসারে) বিচার্য এবং নৈয়ায়িক আধেয় আছে বলেই রূপ উপেক্ষা করেই এবং সংজ্ঞাতত্ত্বে উপনীত হয়েই বিচার্য।

* * * নৈয়ায়িক মিথ্যা এবং শৈল্পিক সত্য সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে ক্রোচে বলছেন—"সাধারণভাবে যে বলা হয়—যে ভালো যুক্তি দিতে পারে না, সে ভালো বলতে ও লিখতে পারে না—বলা হয়, যে নৈয়ায়িক বিশ্লেষণের সৌষ্ঠবই সুপ্রকাশের ভিত্তি—সেই কথাটির সত্যতাই এতে সমর্থিত হয়। এ সত্য অনাবশ্যক পুনরুক্তিমাত্র, কারণ সুষ্ঠু যুক্তি দিতে পারা মানেই সুষ্ঠুভাবে নিজেকে ব্যক্ত করতে পারা; কারণ প্রকাশ করা হচ্ছে নিজেরই নৈয়ায়িক চিন্তাকে নির্বিকল্পকভাবে লাভ করা।"

বৈপরীত্য-বিধি (প্রিন্‌সিপল্ অফ কণ্ট্রাডিকশান) মূলতঃ শৈল্পিক সঙ্গতি-বিধি ছাড়া আর কিছুই নয়। বলা যেতে পারে যে—ভুল ধারণা থেকে সুরু করেও যেমন সুন্দর লেখা এবং বলা যায়, তেমনি সুন্দর যুক্তিবিন্যাসও করা যায়। বলা যেতে পারে যে, এমন অনেকে আছেন যাঁদের বড় আবিষ্কারকের দৃষ্টি-তীক্ষ্ণতা নেই বটে, কিন্তু তবু তাঁরা খুব সরল ভাষায় লিখতে পারেন। কারণ ভালো লেখা নির্ভর করে নিজের চিন্তার—সে চিন্তা ভুল হলেও তার—স্পষ্ট প্রতিভানের উপরে; বৈজ্ঞানিক সত্যের নয়, শৈল্পিক সত্যেরই

স্পষ্ট প্রতিভানের উপরে, আর তারই নাম ভালো লেখা। শোপেনহাউয়ারের মতো কোন দার্শনিক মনে করতে পারেন—শিল্প হচ্ছে "প্লেটোনিক আইডিয়া"র উপস্থাপনা। এই সিদ্ধান্ত বৈজ্ঞানিক চিন্তা হিসাবে মিথ্যা, তবু তিনি এই মিথ্যা জ্ঞানকে অতিসুচারু গদ্যে শৈল্পিক সত্য রূপে বিস্তার করতে পারেন। এই আপত্তির উত্তর আগেই এবং তখনই দেওয়া হয়েছে, যখন এ কথা বলা হয়েছে যে, যেখানে বক্তা বা লেখক কুচিন্তিত সংজ্ঞা ব্যক্ত করেন সেই নির্দিষ্ট স্থলে তিনি যুগপৎ মন্দ বক্তা এবং মন্দ লেখক—যদিও তিনি চিন্তার অন্যান্য অংশে অর্থাৎ যে অংশে, পূর্ববর্তী ভুলের সঙ্গে যার সম্বন্ধ নেই এমন সত্য চিন্তা রয়েছে—নিজেকে শুধরে নিতে পারেন। অতএব অস্পষ্ট প্রকাশের পর স্পষ্ট প্রকাশ থাকতে পারে।

সুতরাং,সিদ্ধান্তের বিভিন্ন রূপ নিয়ে, যুক্তিবিন্যাসরীতি সম্বন্ধে,তাদের বিভিন্ন সম্বন্ধ সম্বন্ধে যে সমস্ত গবেষণা আজও ন্যায়শাস্ত্রের গ্রন্থকে ভাবাক্রান্ত করে রেখেছে, তা' কমতে, অন্য কিছুতে পরিবর্তিত হতে বাধ্য। সংজ্ঞাতত্ত্ব, সংজ্ঞার গঠন, লক্ষণ-নিরূপণ, তন্ত্র, দর্শন এবং বিভিন্ন বিজ্ঞান প্রভৃতি স্থান অধিকার করবে এবং একমাত্র তারাই হবে খাঁটি ন্যায়শাস্ত্রের আলোচ্য বিষয়বস্তু।

" শিল্পতত্ত্ব ও ন্যায়শাস্ত্রের মধ্যে অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ আছে এ যাঁরা প্রথম সন্দেহ করেছিলেন এবং শিল্পতত্ত্বকে 'ইন্দ্রিয়-জ্ঞানের ন্যায়শাস্ত্র' ('লজিক অফ সেন্‌সিবল নলেজ') বলে ধারণা করেছিলেন, তাঁরা ন্যায়ের পরিভাষাকে নতুন জ্ঞানে প্রয়োগ করতে অদ্ভুত আসক্তি দেখিয়েছিলেন ; তারই নমুনা—"শৈল্পিক সংজ্ঞা", "শৈল্পিক সিদ্ধান্ত", "শৈল্পিক যুক্তিবিন্যাস" প্রভৃতি। আমরা, যারা প্রাচীন ও প্রচলিত ন্যায়শাস্ত্রের সনাতনত্ব সম্বন্ধে কম কুসংস্কারাচ্ছন্ন এবং শিল্পতত্ত্বের স্বরূপ সম্বন্ধে অধিকতর সুবিদিত, ন্যায়সূত্রকে শিল্পশাস্ত্রে প্রয়োগ করতে বলিনে, শৈল্পিক রূপ থেকে ন্যায়শাস্ত্রকে মুক্ত হতে বলি। এর ফলে, সম্পূর্ণ মনগড়া এবং অবিবেচিত ভেদ কল্পনা স্বীকার করায়, ন্যায়শাস্ত্রের কতকগুলি অস্তিত্ববিহীন রূপ বা প্রকার দেখা দিয়েছে।

ন্যায়শাস্ত্রের যত সংস্কারই করা হোক,—ন্যায়শাস্ত্র রূপধর্মী (ফর্মাল) ন্যায়-

শাস্ত্রই থাকবে। বিশেষ্যাশ্রিত সংজ্ঞাকে বাদ দিয়ে চিন্তার যথার্থ রূপ ও প্রক্রিয়া, সংজ্ঞা নিয়েই সে আলোচনা করবে; প্রাচীন ন্যায়বিধিকে ভুল করে রূপধর্মী বলা হয়, তাকে 'ফর্মাল' না বলে, বাচনিক বা তর্কপ্রাণ (ভার্বাল অর ফর্মালিস্টিক) বলাই ভাল। রূপধর্মী ন্যায়শাস্ত্র, তর্কধর্মী ন্যায়শাস্ত্রকে বিতাড়িত করবে। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে, বাস্তব বা বস্তুবিচারী ন্যায়শাস্ত্রের শরণাপন্ন হওয়ার কোন প্রয়োজন নেই, কারণ বস্তুবিচারী ন্যায় কোন চিন্তা-বিজ্ঞান নয়, চিন্তারই ক্রিয়া মূর্তি—শুধু মাত্র ন্যায়শাস্ত্র নয়, সমগ্র দর্শন,—যার মধ্যে ন্যায়শাস্ত্রও অন্তর্ভুক্ত। চিন্তার বিজ্ঞান (ন্যায়শাস্ত্র) হচ্ছে সংজ্ঞার বিজ্ঞান, যেমন কল্পনাবিজ্ঞান (শিল্পশাস্ত্র) হচ্ছে প্রকাশন-বিজ্ঞান। উভয় বিজ্ঞানের শ্রীবৃদ্ধি নির্ভর করছে উভয়ের পার্থক্যকে সবিশেষ নির্ধারণ করার উপরে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

জ্ঞানাত্মিকা ক্রিয়া এবং কর্মাত্মিকা ক্রিয়া

এই অধ্যায়ে ক্রোচে নিম্নলিখিত বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন :—

(ক) কর্মবৃত্তি (উইল)

(খ) জ্ঞানবৃত্তির সঙ্গে কর্মবৃত্তির যোগ।

(গ) 'কর্মাত্মক সিদ্ধান্ত' বা 'মূল্যবিষয়ক সিদ্ধান্ত'-এর সমালোচনা।

(ঘ) শৈল্পিক ক্রিয়া ও কর্মবৃত্তি।

(ঙ) শিল্পের উদ্দেশ্য ও বিষয় নির্বাচন।

(চ) শিল্পের কর্মনিরপেক্ষত্ব।

(ছ) শিল্পের নিরপেক্ষত্ব।

(জ) 'স্টাইল ইজ দি ম্যান' উক্তিটির সমালোচনা।

(ঝ). শিল্পের আন্তরিকতা।

* * * * প্রাতিভানিক এবং বৌদ্ধিক রূপ নিয়েই আত্মার জ্ঞানবৃত্তির বৃত্ত সম্পূর্ণ। কিন্তু, জ্ঞানবৃত্তির সঙ্গে কর্মবৃত্তির সম্পর্ক স্পষ্টরূপে নির্ধারণ করতে না পারা পর্যন্ত, জ্ঞানের রূপ দু'টিকে সম্পূর্ণরূপে জানা এবং অন্য কতকগুলি ভুল মতবাদকে সমালোচনা করা, সম্ভব হবে না।

কর্মাত্মিকা ক্রিয়াই হচ্ছে—বাসনা (উইল)। কোন কোন দর্শনে 'উইল' শব্দটিকে বিশ্বের ভিত্তি—সমস্ত বস্তুর ও বাস্তব সত্তার মূল কারণ হিসাবে গণ্য করা হয়েছে ; আমরা সেই অর্থে শব্দটি এখানে ব্যবহার করছিনে অথবা অন্যান্য দর্শন উইল বলতে যে 'আত্মার শক্তি' 'শক্তি বা ক্রিয়া সাধারণ' বোঝে এবং আত্মার প্রত্যেকটি ব্যাপারকে (বাসনার) 'উইলে'র ক্রিয়া বলে মনে করে, সেই অর্থেও শব্দটি আমরা প্রয়োগ করছিনে। পারাতাত্ত্বিক বা রূপক দুয়ের কোন অর্থই আমাদের অর্থ নয়। আমাদের কাছে বাসনা (উইল) আত্মার সেই ক্রিয়া যা বস্তুর নিছক ধ্যান ধারণা থেকে পৃথক এবং যা, জ্ঞানের

নয়, কর্মের সৃষ্টি করে। ক্রিয়া ক্রিয়াই এবং স্বেচ্ছায় ক্রিয়া। এ কথা উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই যে 'করার ইচ্ছার' মধ্যে আমরা বৈজ্ঞানিক অর্থে 'না করার ইচ্ছা'কেও অন্তর্ভুক্ত করছি। বাধা দেওয়ার ইচ্ছা, প্রত্যাখ্যান করার ইচ্ছা প্রমিথিয়ুসের ইচ্ছাও ক্রিয়াবিশেষ।

জ্ঞানবৃত্তির দ্বারা মানুষ বস্তুকে জানে, কর্মবৃত্তির দ্বারা সে তাদের পরিবর্তিত করে। একের দ্বারা সে বিশ্বকে আত্মসাৎ করে, অন্যের দ্বারা সে বিশ্বকে সৃষ্টি করে। কিন্তু প্রথমটি দ্বিতীয়টির ভিত্তি। শৈল্পিক ক্রিয়া এবং নৈয়ায়িক ক্রিয়ার সম্পর্কের মধ্যে আমরা আগেই দ্বিতীয় মাত্রার যে সম্বন্ধ কল্পনা করেছি, সেই সম্বন্ধটি এখানে আরো অধিক মাত্রায় বিরাজ করছে। কর্মনিরপেক্ষ জ্ঞান কোন প্রকারে চিন্তনীয়, কিন্তু জ্ঞাননিরপেক্ষ কর্ম অচিন্তনীয়। অন্ধ কামনা কামনাই নয়, প্রকৃত কামনার চোখ আছে।

বস্তুর প্রতিভান (প্রতীতি) এবং বস্তুসম্বন্ধের (নৈয়ায়িক) জ্ঞান, যা বস্তুস্বরূপটিকে দেখিয়ে দেয়,—না থাকলে, আমরা কিভাবে বাসনা বা কাজ করতে পারি? যে জগৎ আমাদের ঘিরে আছে তাকে না জানলে, বা কি করে কর্মের দ্বারা জগতকে পরিবর্তিত করা যায় তা' না জানলে আমরা কর্মে প্রবৃত্ত হই কি করে?

আপত্তি তুলে বলা হয়েছে যে যারা কাজের লোক, আদর্শ কর্মযোগী—তারা চিন্তা ও তত্ত্বের জন্য সব চেয়ে কম প্রবণান্বিত। চিন্তা করতে যেয়ে তারা শক্তিক্ষয় করে না, শক্তিকে সোজা কর্মে নিয়োগ করে। এরই উলটো কথা—চিন্তাশীল ব্যক্তিরা—দার্শনিকরা, কর্মের ক্ষেত্রে অতি নগণ্য, দুর্বলচিত্ত, সুতরাং অবহেলিত এবং জীবন সংগ্রামে কোণঠাসা। সহজেই দেখা যায়, এই পার্থক্য-কল্পনা নিছক অভিজ্ঞতানির্ভর এবং গণনানির্ভর। এ কথা ঠিকই যে কর্মী মানুষের কর্ম করবার জন্য কোন দার্শনিক তন্ত্রের প্রয়োজন নেই, কিন্তু যে ক্ষেত্রে সে কাজ করে, সেখানে সে সুস্পষ্ট প্রতিভান এবং সংজ্ঞা থেকেই আরম্ভ করে। অন্যথা অতি সামান্য কর্মও ইচ্ছা করা সম্ভব হতো না। দৃষ্টান্ত দিয়ে বলা যাক—খাদ্যের জ্ঞান এবং বিশেষ বিশেষ গতিবিধির সঙ্গে বিশেষ বিশেষ পরিতৃপ্তির কার্যকারণ যোগ আছে এ জ্ঞান না থাকলে, নিজেকে খাওয়ানোর

বাসনা জাগা সম্ভব নয়। আরো জটিল কর্মের স্তরেও—যেমন ধরা যাক—রাজনৈতিক কর্মের স্তরে, সমাজের বাস্তব অবস্থা, তথা যে যে উপায় ও কৌশল অবলম্বন করা উচিত তা না জেনে, কি করে আমরা ভালো বা মন্দ রাজনৈতিক কাজ করতে পারি? কর্মী যখন এদের কোন এক বা একাধিক বিষয়ে বিমূঢ় হয়ে পড়েন, অথবা সন্দেহগ্রস্ত হন তখন হয় কর্ম আরব্ধই হয় না, না-হয় একেবারেই বন্ধ হয়ে যায়। তখন, জ্ঞানক্রিয়ার যে মুহূর্তগুলি, কর্মের দ্রুত পারম্পর্যের মধ্যে অলক্ষিত এবং দ্রুত বিস্মৃত হয় সেইগুলি প্রধান হয়ে উঠে এবং অনেকক্ষণ চেতনাকে অধিকার করে থাকে। এই কালব্যাপ্তি আরো বাড়লে কর্মী ব্যক্তি তখন হ্যামলেটে পরিণত হন—একদিকে কর্মের ইচ্ছা অন্যদিকে পরিস্থিতি এবং উপায় সম্বন্ধে স্পষ্ট চিন্তার দৈন্য—এই দোটানায় পড়ে খণ্ডিত হয়ে যান। যদি তাঁর মধ্যে চিন্তার এবং আবিষ্কারের প্রবৃত্তি বৃদ্ধি পায় এবং যদি তিনি অন্যের উপরে কাজের ভার ছেড়ে দিয়ে বসেন, তাহলে তাঁর মধ্যে শিল্পীর, বৈজ্ঞানিকের অথবা নীতিহীন ও কর্মবিমুখ দার্শনিকের প্রশান্ত মানসিক অবস্থা দেখা দেয়। এই সব কথা খুবই স্পষ্ট এবং তাদের যাথাযথ্যও অস্বীকার্য নয়। কিন্তু আমরা আগে যা বলেছি সেই কথাই বলব—বলব যে, এই পার্থক্যকল্পনা পরিমাণের ভিত্তিতেই করা হয়েছে এবং তা' এই কথাটিকেই প্রমাণিত করে যে কর্ম যত তুচ্ছই হোক না কেন, কিছুতেই খাঁটি কর্মে অথাৎ সংকল্পিত কর্মে পরিণত হয় না, যদি না তার পিছনে কোন জ্ঞানের অস্তিত্ব থাকে।

* * * কোন কোন মনস্তত্ত্ববিদ্ কর্মের প্রাক্‌ভাবী হিসাবে, সম্পূর্ণ ভিন্ন এক শ্রেণীর বোধের কথা বলে থাকেন এবং তাদের তাঁরা বলেন—কর্মবোধ বা মূল্যবোধ। তাঁরা বলেন যে কোন কাজ করার সংকল্প করার আগে—নিশ্চয়ই এই মর্মে একটি বিচার জাগে—"এই কাজে উপকার হবে, এই কাজ ভাল।" আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে—এর পক্ষে চেতনার সমর্থন বা সাক্ষ্য রয়েছে। কিন্তু আরো একটু তলিয়ে দেখলে এবং আরো সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে ঐরূপ বিকল্পনা—ইচ্ছাক্রিয়ার আগে না এসে পরেই এসে থাকে এবং যে ইচ্ছাকে আগেই প্রয়োগ করা হয়েছে তারই অভিব্যক্তি। ভালো বা

প্রয়োজনীয় কাজ হচ্ছে সেই কাজ যা ইষ্ট বা সংকল্পিত বস্তুর স্বরূপ বিচার থেকে ভালোত্বের বা প্রয়োজনীয়ত্বের একবিন্দুও পরিস্রুত করা সম্ভব নয়। বস্তুকে ভালো বা প্রয়োজনীয় বলে জানি বলেই আমরা বস্তুকে কামনা করিনে, কামনা করি বলেই ভালো বা মন্দ বলে জানতে পারি। এখানেও, যে দ্রুততা নিয়ে মানসিক ব্যাপারগুলি একের পর এক ঘটে যায়, তা থেকে একটা ভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে। কর্মের আগে জ্ঞান থাকে বটে, কিন্তু কোন কর্মাত্মক জ্ঞান বা কর্মের জ্ঞান থাকেনা। তা পেতে গেলে আগে কর্ম করতে হবে। অতএব কর্মবোধের বা মূল্যবোধের ঐ তৃতীয় মুহূর্তটি সম্পূর্ণ কাল্পনিক। জ্ঞানের মুহূর্ত এবং কর্মের মুহূর্ত—এই দুই মুহূর্তের মধ্যে তার কোন স্থান নেই। তার পর সাধারণ নীতিবিজ্ঞান সম্বন্ধে বলা যায়—নীতিবিজ্ঞান বলে কিছু নেই অর্থাৎ যে বিজ্ঞান কর্মের মূল্য আবিষ্কার ও নির্ধারণ করে, যা কর্মের বিধি-নিষেধ নিরূপণ করে তার অস্তিত্ব নেই। বাস্তবিক, কর্মের উপরে কোন বিজ্ঞানের অস্তিত্ব নির্ভর করে না, কারণ প্রত্যেক বিজ্ঞানেরই মধ্যে সেই কাম্য ও করণীয় কাজের কথা অন্তর্নিহিত থাকে যাকে সে পরে বিষয়স্বরূপে গ্রহণ করে।

এই পার্থক্য প্রতিষ্ঠিত করার পরে, যে সমস্ত মতবাদ শৈল্পিক ব্যাপারকে কর্মাত্মিকা ক্রিয়ার সঙ্গে জুড়ে দেয় অথবা দ্বিতীয় ক্ষেত্রের নিয়মকে প্রথমক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে চায়,তাদের প্রত্যেককেই আমরা ভুল বলে নিন্দা করব। বিজ্ঞান তত্ত্ব এবং শিল্প হচ্ছে কর্ম বা প্রয়োগ— বহুবার এ কথা বলা হয়েছে। যাঁরা এরূপ মন্তব্য করেন এবং শৈল্পিক ব্যাপারকে কর্মের ব্যাপার—বলে মনে করেন —তাঁরা খামখেয়ালী করে অথবা শূন্যে হাতড়ে বেড়ান বলেই করেন না। করেন এই কারণেই যে তাঁরা এমন কিছুর উপরে তাঁদের দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছেন যা আসলেই কর্মাত্মক। কিন্তু যে কর্মের দিকে তাঁরা লক্ষ্য রাখেন তা' শৈল্পিক নয়, বা শৈল্পিকের গণ্ডীর মধ্যেও পড়ে না—তা' শৈল্পিকের বাইরের এবং অতিরিক্ত কিছু। যদিও অনেক সময় তাদের একত্র দেখা যায়, তবুও তারা স্বভাবতঃ এক নয়, প্রকৃতি সাম্যসূত্রের বন্ধনে আবদ্ধ নয়।

প্রত্যয়রাজির প্রকাশাত্মক বিস্তারেই শৈল্পিক ব্যাপার সম্পূর্ণ সম্পন্ন। যখন আমরা মনের মধ্যে কোন শব্দকে পেয়ে যাই, নির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট আকারে কোন

মূর্তি ধারণা করি অথবা কোন সুর পেয়ে যাই, তখনই প্রকাশনের জন্ম হয়, প্রকাশন সম্পূর্ণ হয়। আর কিছুর দরকার নেই। এর পর যদি আমরা মুখ খুলি—শব্দটি বলার জন্য খুলি এবং গানের জন্য গলা খুলি অর্থাৎ যে কথা আমরা মনে মনে বলেছি, যে গান আমরা মনে মনে করেছি, সেই কথা ও গান মুখের কথায় এবং সুরে উচ্চারণ করি অথবা যদি পিয়ানোর পর্দা স্পর্শ করবার জন্য হাত বাড়াই বা বাড়াবার সংকল্প করি, বা তুলি বা বাটালি গ্রহণ করি, তথা যে কাজ আগেই অল্পাকারে এবং দ্রুতভাবে করা হয়েছে তাকেই বৃহদাকারে কোন বস্তুমাধ্যমে নিষ্পন্ন তথা স্থায়ী করতে চেষ্টা করি—এ সমস্তই বাড়তি ব্যাপার এবং এমন ব্যাপার যার নিয়ম আগের ব্যাপারের নিয়ম থেকে ভিন্ন এবং তার সম্বন্ধে এই মুহূর্তেই কোন আলোচনা না করলেও এইটুকু এখনই বলা যেতে পারে যে এই দ্বিতীয় ব্যাপারটি বস্তুনির্মাণের ব্যাপার, একটি কর্মাত্মক ব্যাপার—বাসনার বা সংকল্পের ব্যাপার। শিল্পের বাহ্যিক এবং আভ্যন্তরিক ব্যাপারেব মধ্যে পার্থক্যকল্পনার রেওয়াজ আছে। ঐ পরিভাষা আমাদেব মনঃপূত নয়। কারণ, শিল্পকর্ম (শৈল্পিক ব্যাপার) সর্বদাই আভ্যন্তরিক। কেউ কেউ 'শৈল্পিক ব্যাপার' এবং নির্মাণ-ব্যাপারের মধ্যে ভেদ কল্পনা কবেন এবং নির্মাণ কৌশল বলতে বাহ্যিক বা প্রয়োগের পর্যায়টি ধরে থাকেন—যা প্রথম পর্যায়ের পরে আসতে পারে এবং সাধারণতঃ এসেও থাকে। কিন্তু এক্ষেত্রে এ শুধু বাক্‌ব্যবহার রীতির প্রশ্ন, ঐ ভেদকল্পনা নিঃসন্দেহে করা যায় বটে কিন্তু করা সমীচীন নয়।

সেই একই কারণে—শিল্পকে শিল্পের স্বরূপে দেখতে গেলে—শিল্পের উদ্দেশ্য খোঁজার চেষ্টা হাস্যকর ব্যাপার। এবং যেহেতু উদ্দেশ্য স্থির করার অর্থই হলো, নির্বাচন করা, আর একটি ভুল হলো এই কথা বলা যে শিল্পের বিষয়বস্তু নির্বাচিত করতেই হবে। প্রত্যয়ের এবং সংবেদনের নির্বাচন মানেই প্রকাশন, তা' না হ'লে অনির্দিষ্ট ও অবিচ্ছিন্নের ভিতর থেকে নির্বাচন কি করে হবে? নির্বাচন করা মানেই সংকল্প করা—এটা করার এবং ওটা না-করার সংকল্প করা এবং সেই এটা ও ওটা নিশ্চয়ই আমাদের সম্মুখে থাকবে—প্রকাশিত রূপেই থাকবে। প্রয়োগ তত্ত্বজ্ঞানের পরবর্তী ব্যাপার; প্রকাশন মুক্ত প্রেরণা।

বস্তুতঃ, প্রকৃত শিল্পীর মনে বিষয়বস্তু মাতৃগর্ভের ভ্রূণের মতো আকারপ্রাপ্ত হয়। কি করে হয় তা তিনি জানেন না। তিনি বুঝতে পারেন—প্রসবকাল আসন্ন, কিন্তু ইচ্ছা করে যেমন তিনি প্রসব করতে পারেন না, তেমনি অনিচ্ছার দ্বারা ঠেকিয়েও রাখতে পারেন না। তাঁর প্রেরণার বিরুদ্ধে তাঁকে যদি কাজ করবার সংকল্প করতে হয়, যদি বিপরীত কিছু করবার জন্য প্রস্তুত হতে হয়, যদি এনাক্রিয়োন হয়ে, এত্রিয়ুসের এবং এলসাইডিসের সম্বন্ধে গান করতে হয়, তা' হ'লে তাঁর বীণাযন্ত্রই তাঁকে তাঁর ভুল ধরিয়ে দেবে, তাঁর চেষ্টা সত্ত্বেও, ভেনাসের এবং প্রেমের গানই তাতে বাজবে।

অতএব বিষয়বস্তুকে বা আধেয়কে যোগ্যতার বা নৈতিক উপযোগিতার দিক দিয়ে প্রশংসা বা নিন্দা করবার কিছু নেই। শিল্প-সমালোচকরা যখন মন্তব্য করেন যে বিষয়বস্তুটির নির্বাচন সুষ্ঠু হয়নি সেই সব ক্ষেত্রে—ঐরূপ মন্তব্যের যথার্থ ভিত্তি থাকলে—বুঝতে হবে—ঐ নিন্দা বিষয়বস্তু নির্বাচনের নিন্দা নয় (তা' হতেই পারে না), যে রীতিতে শিল্পী বস্তুকে উপস্থাপিত করেছেন তার নিন্দা, প্রকাশনের মধ্যে অন্তর্বিরোধের জন্য যে অসাফল্য দেখা দিয়েছে,—সেই অসাফল্যের নিন্দা। এবং সমালোচকরা যখন শিল্পকর্মের রূপটিকে সুসম্পূর্ণ বা নির্দোষ বলে ঘোষণা করেন অথচ ঐ শিল্পের বিষয়-বস্তুটিকে অযোগ্য এবং নিন্দনীয় বলে আপত্তি করেন, তখনও ভুল করেন; কারণ, যদি ঐ প্রকাশনগুলি বাস্তবিকই সুসম্পূর্ণ হয়ে থাকে তা' হ'লে শিল্পীদের শান্তিতে থাকতে দেওয়ার জন্য সমালোচকদের উপদেশ দেওয়া ছাড়া আর কিছুই করবার নেই। কারণ শিল্পীরা প্রেরণা পেতে পারেন শুধু তা' থেকেই যা তাঁদের আত্মাকে আন্দোলিত করেছে। বরং, যাতে আর ঐ ধরনের প্রত্যয় বা মানসিক ভাব না জাগতে পারে, সেইজন্য পরিবেশে ও সমাজে পরিবর্তন ঘটানোর দিকে তাঁদের মনোযোগকে চালনা করা উচিত। যদি পৃথিবী থেকে কুৎসিত লুপ্ত হয়ে যায়, যদি সকল লোকের মধ্যে ন্যায় ও সত্যের প্রতিষ্ঠা ঘটে, তা' হ'লে শিল্পীরা আর বিকৃতিকে বা নৈরাশ্যকে রূপ দেবেন না, শুধু শান্ত, সুন্দর এবং আনন্দকেই ব্যক্ত করবেন—প্রকৃত আর্কেডিয়ার অধিবাসী হবেন। কিন্তু যে পর্যন্ত প্রকৃতিতে কুৎসিত ও বিকৃতি বিক্ষোভ আছে

এবং কবির মনে তাদের ছাপ পড়ছে, সে পর্যন্ত ঐগুলির প্রকাশন বন্ধ করা সম্ভব নয় (when it has arisen "factum infectum fiere nequit")। আমরা এখানে সম্পূর্ণ শৈল্পিক দৃষ্টিকোণ থেকে বলছি এবং শিল্পের বিশুদ্ধ সমালোচনার কথা বলছি।

"নির্বাচন"-মূলক সমালোচনা (criticism of "choice") শিল্পীদের মধ্যে কুসংস্কার সৃষ্টির দ্বারা এবং শৈল্পিক প্রেরণা ও সমালোচক-চাহিদার মধ্যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টির দ্বারা শিল্পকর্মের যে ক্ষতিসাধন করে, তা' আমাদের আলোচ্য নয়। এ কথা সত্য, শিল্পীদের আত্ম-আবিষ্কারে অর্থাৎ নিজের অন্তর্নিহিত প্রত্যয় ও প্রেরণা বুঝতে সাহায্য করে এবং সমকালীন ইতিহাসেব ও ব্যক্তিগত রুচির চাহিদা বিষয়ে অবহিত করে, অনেক সময় এ বেশ উপকারই করে। এই সমস্ত ক্ষেত্রে "নির্বাচন"-মূলক সমালোচনা, যদিও সে মনে করে যে সেই প্রকাশনকে সৃষ্টি কবছে, আসলে প্রকাশনকে শুধু প্রত্যভিজ্ঞান করে এবং সাহায্যই করে। সে নিজেকে জননী বলে মনে করলেও, বড জোর সে একটি ধাত্রী মাত্র।

* * * বিষয়বস্তুর অনির্বাচ্যতা শিল্পের স্বাধীনতার প্রতিপাদ্যকে সম্পূর্ণতা দান করে এবং 'শিল্পের জন্যই শিল্প' এই কথাটিব একমাত্র যথার্থ অর্থ। শিল্প বিজ্ঞাননিরপেক্ষ, উপযোগনিরপেক্ষ, নীতিনিরপেক্ষ। তুচ্ছ বা 'নীরস' শিল্পকে সমর্থন না করলে ভয়ের কোন কারণ নেই; কারণ প্রকৃত তুচ্ছ বা নীরস হওয়ার একমাত্র কারণ এই যে তা' প্রকাশনের স্তরে পৌঁছায়নি। অন্যভাবে বললে, তুচ্ছতা ও নীরসতা সর্বদাই শৈল্পিক সৃষ্টি-প্রক্রিয়ার প্রকৃতি থেকে আসে; বিষয়বস্তুর বস্তু-প্রকৃতি থেকে নয়, বিষয়বস্তুর প্রকৃতিকে না ধরতে পারা থেকেই আসে।

* * * তারপর রীতির মধ্যেই মানুষটি ধরা পড়ে (স্টাইল ইজ দি ম্যান)—এই উক্তিটিকে ও সম্পূর্ণভাবে সমালোচনা করা যাবে না, যদি না জ্ঞানাত্মিকা ও কর্মাত্মিকা ক্রিয়ার পার্থক্য এবং শৈল্পিক ক্রিয়ার জ্ঞানাত্মিকতা স্বীকার করে নেওয়া হয়। মানুষ শুধু জ্ঞানে ও ধ্যানে গড়া নয়; তার ইচ্ছাবৃত্তিও রয়েছে এবং তার ইচ্ছার মধ্যে জ্ঞানের মুহূর্তগুলিও অন্তর্ভুক্ত

সুতরাং উক্তিটি যখন এই অর্থে ব্যবহৃত হয় যে—স্টাইল ইজ দি ম্যান 'কোয়া' স্টাইল—ইজ দি ম্যান, অর্থাৎ সে হচ্ছে প্রকাশধর্মী—তখন সম্পূর্ণ শূন্যগর্ভ; অথবা অভিজ্ঞতা ও অভিব্যক্তি থেকে মানুষ যা' সৃষ্টি করে বা সংকল্প করে তাকেই বুঝাতে যখন ব্যবহার করা হয়, তথা ইচ্ছাবৃত্তি ও জ্ঞানবৃত্তির মধ্যে কার্যকারণ-যোগ প্রতিষ্ঠিত করা হয় তখন উক্তিটি মিথ্যাপূর্ণ। এই ভুল সংযোগস্থাপনা থেকেই, শিল্পীদের জীবনচরিতে অনেক গল্প গজিয়েছে। কারণ, যিনি উচ্চভাবের কথা প্রকাশ করেছেন, তিনি ব্যবহারিক জীবনে মহান এবং উচ্চভাবসম্পন্ন ব্যক্তি হবেন না, অথবা যে নাট্যকারের নাটক খুন-জখমের ঘটনায় পরিপূর্ণ, তিনি ব্যবহারিক জীবনে দু'একটা খুন জখম করেননি—এ সম্ভব বলে মনে হয়নি, শিল্পীরা বৃথাই প্রতিবাদ করে বলেন—'Lasciva est nobis, vita proba'। উলটে তাদের ভণ্ড ও মিথ্যাবাদী বলে ভর্ৎসনা করা হয়। ভেরোনার নারীগণ! তখন কত বুদ্ধিমত্তারই পরিচয় না তোমরা দিয়েছো যখন তোমরা বলেছিলে—দান্তে ভূত হয়ে নরকে নেমে গিয়েছিলেন। তোমাদের ঐ অনুমানটি ঐতিহাসিক অনুমানই বটে!

* * * পরিশেষে, 'আন্তরিকতা'র—প্রশ্নটি যা' শিল্পীর ঘাড়ে দায় হিসাবে চাপানো হয়, অন্য একটি দ্ব্যর্থকতার উপরে দাঁড়িয়ে আছে। প্রথমতঃ আন্তরিকতা বা নিষ্ঠা (সিনসিয়ারিটি) বলতে বুঝায়, প্রতিবেশীর সঙ্গে প্রতারণা না করার নৈতিক কর্তব্য এবং সেই অর্থে শিল্পীর সঙ্গে তার কোন, সম্পর্ক নেই। তিনি কারো সঙ্গেই প্রতারণা করেন না, কারণ তিনি তাঁর অন্তর্নিহিত বিষয়কে রূপ দিয়ে থাকেন। তখনই তিনি প্রতারক হন যখন তিনি শিল্পীর যা আসল কর্তব্য সেই প্রকাশন কার্যটিকেই সুষ্ঠু ও সম্পূর্ণভাবে সম্পন্ন করতে পারেন না। তাঁর অন্তরে মিথ্যা ও প্রবঞ্চনা থাকলেও, তিনি যখন রূপায়িত করেন তখন আর তা প্রবঞ্চনা বা মিথ্যা নয়—বিশেষতঃ তখন তা শৈল্পিক। শিল্পী যদি প্রতারক, মিথ্যাবাদী বা দুর্বৃত্তও হন, শিল্পরূপ সৃষ্টি করতে যেয়ে তিনি তাঁর অন্য সত্তাকে পরিশোধিত করেন। দ্বিতীয়তঃ নিষ্ঠা বলতে যদি প্রকাশনের সম্পূর্ণতা ও সত্যতা বুঝায় তা'হ'লে এ খুবই স্পষ্ট যে দ্বিতীয় অর্থের সঙ্গে নীতিসূত্রের কোন যোগ নেই। নৈতিক সূত্র এবং শৈল্পিক সূত্র বলে যে সূত্র আছে এখানে তার ব্যবহার—নীতিশাস্ত্র এবং শিল্পশাস্ত্র—দুই শাস্ত্রই একটি শব্দ ব্যবহার করেছে—এইমাত্র।

সপ্তম অধ্যায়

জ্ঞানাত্মিকা ক্রিয়ার সঙ্গে কর্মাত্মিকা ক্রিয়ার সাদৃশ্য

এই অধ্যায়ে ক্রোচে নিম্নলিখিত বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন :—

(ক) কর্মাত্মিকা ক্রিয়ার দুই রূপ

(খ) অর্থনৈতিক উপযোগিতা

(গ) প্রয়োজনীয় ও প্রয়োগবিধির পার্থক্য

(ঘ) প্রয়োজনীয় ও অনৈতিকের পার্থক্য

(চ) অর্থকামী ইচ্ছা ও নীতিকামী ইচ্ছা

(ছ) বিশুদ্ধ অর্থকামিতা

(জ) নীতির অর্থনৈতিক দিক—

(ঝ) নিছক অর্থকামিতা এবং নীতি-ঔদাসীন্যের ভুল

(ঞ) উপযোগবাদিতার সমালোচনা এবং নীতিশাস্ত্রের ও অর্থশাস্ত্রের সংস্কার।

(ট) কর্মাত্মিকা ক্রিয়ায়——বস্তু ও অবস্তু (আত্মা)

জ্ঞানাত্মিকা ক্রিয়ার যেমন শৈল্পিক ও নৈয়ায়িক এই দুটি পর্যায়, তেমনি কর্মাত্মিকা ক্রিয়ারও দুটি সদৃশ পর্যায় আছে। সে সম্বন্ধে এখনো কোন আলোচনা হয়নি। কর্মাত্মিকা ক্রিয়াও দুই পর্যায়ে বিভক্ত,—প্রথম ও দ্বিতীয়, দ্বিতয়টি প্রথমটি-সাপেক্ষ। কর্মাত্মিকা ক্রিয়ার প্রথম পর্যায় হচ্ছে—প্রয়োজনমূলক বা অর্থনৈতিক ব্যাপার, দ্বিতীয়টি নৈতিক ব্যাপার। অর্থনীতি যেন কর্মাত্মক জীবনের শৈল্পিক ব্যাপার এবং নীতি তার নৈয়ায়িক ব্যাপার।

দার্শনিকরা যদি স্পষ্টভাবে এটা না দেখে থাকেন, যদি 'আত্মা'র-দর্শনের (ফিলোসফি অফ দি স্পিরিট) মধ্যে অর্থনৈতিক ক্রিয়ার ঠিক স্থান নির্দেশ করা না হয়ে থাকে, যদি 'রাজনৈতিক অর্থনীতি' গ্রন্থের অবতরণিকায় অতি সামান্য ভাবে এবং প্রায়শঃ অস্ফুট আকারে,উল্লেখ করা হয়ে থাকে, তার প্রধান

কারণ এই যে ঔপযৌগিক বা আর্থনৈতিককে, কখনো কখনো 'প্রয়োগ-কলা'র (টেকনিকাল) সঙ্গে, কখনো, কখনো, ব্যক্তি-স্বার্থপরায়ণতার (ইগোয়িস্টিকাল) সঙ্গে গুলিয়ে ফেলা হয়েছে।

প্রয়োগ-কলা (টেকনিক) আত্মার বিশেষ কোন ক্রিয়া নয়, জ্ঞানবিশেষ। বরং বলা যেতে পারে—সাধারণ জ্ঞানই যখন কর্মের ভিত্তি হিসাবে কাজ করে তখন ঐ নাম গ্রহণ করে। যে জ্ঞান কর্মের দ্বারা অনুসৃত হয় না বা সহজ-অনুসার্য বলে মনে হয় না, তাকেই বলে "বিশুদ্ধ" জ্ঞান। সেই একই জ্ঞান যদি সফলভাবে কর্মের দ্বারা অনুসৃত বা প্রযুক্ত হয়, "প্রযুক্ত" (এ্যাপ্‌প্লায়েড্‌) আখ্যা লাভ করে, যদি মনে করা হয় যে ঐ জ্ঞানকে সহজেই কর্মে প্রযুক্ত করা সম্ভব, তা'হ'লে তাকে বলা হয়—'প্রযোজ্য' (এ্যাপ্লিকেবেল) বা প্রায়োগিক বা 'কারণিক' (টেকনিকাল)। তা'হ'লে এই শব্দটি এমন একটি পরিস্থিতিকে বুঝায় যাতে জ্ঞান, বিশেষ রূপের জ্ঞান হয় না বা হতে পারে না। এ এতো সত্য যে কোন জ্ঞান স্বরূপতঃ বিশুদ্ধ বা প্রযুক্ত তা' প্রমাণ করা সম্ভব নয়। জ্ঞানকে যত নির্বিষয় ও দার্শনিক বলেই মনে করা যাক্, ব্যবহারিক ক্ষেত্রে তা' কর্মসহায়ক হতে পারে। নীতিশাস্ত্রের মূলসূত্রের কোন তত্ত্বগত ভুল ব্যবহারিক জীবনে প্রতিফলিত হতে পারে এবং এভাবে-ওভাবে হয়েও থাকে। সুতরাং কোন সত্যকে বিশুদ্ধ, এবং কোন সত্যকে প্রযুক্ত বলে নির্দেশ করা, অতি মোটামুটিভাবে এবং অজ্ঞোনিকভাবেই করা যেতে পারে।

যে জ্ঞানকে প্রায়োগিক বা 'টেকনিকাল' বলা হয়, সেই একই জ্ঞানকে—'প্রয়োজনীয়' বলাও চলে। কিন্তু ঐ 'প্রয়োজনীয়' শব্দটি, উল্লিখিত মূল্য বিচারের সমালোচনার সঙ্গে সঙ্গতি রাখতে গেলে, আভিধানিক বা রূপক অর্থেই প্রয়োগ করা হয়েছে বলে ধরতে হবে। আমরা যখন বলি আগুন নিবাতে জল খুব 'প্রয়োজনীয়', তখন "প্রয়োজনীয়" শব্দটি অবৈজ্ঞানিক অর্থে ব্যবহৃত হয়। আগুনের উপরে জল ঢেলে দিলে আগুন নিবে যায়—এই জ্ঞানটুকুই আগুন যারা নেবায় তাদের কর্মের ভিত্তি। এদের মধ্যে যে যোগসূত্র তা' প্রাকৃতিক অর্থাৎ প্রকৃতির-দেওয়া নয়, তা যে ব্যক্তি আগুন নেবায় তার উপকারী কাজের এবং ঐ জ্ঞানের মধ্যে পৌর্বাপৌর্যের যোগ। জলের

ক্রিয়াকারিত্বের ধারণাই হচ্ছে—সেই জ্ঞানাত্মিকা ক্রিয়া বা' কাজের পিছনে কারণরূপে থাকে। একমাত্র 'প্রয়োজনীয়' বস্তু হচ্ছে—যে আগুন নেবায় সেই ব্যক্তির কাজটি।

কোন কোন অর্থনীতিবিদ্ উপযোগিতাকে (ইউটিলিটি)—অর্থাৎ নিছক আর্থনৈতিক ক্রিয়াকে বা ইচ্ছাকে, 'ইগোয়িস্টিকের—অর্থাৎ যা কেবলমাত্র ব্যক্তিস্বার্থেরই পরিপোষক এবং যা নীতির ধার ধারে না বা সম্পূর্ণ নীতিবিপরীত কাজ করে—তার সঙ্গে এক করে দেখেছেন। ইগোয়িস্টিক নীতিবিহীন—এরূপ হ'লে অর্থনীতি অতিবিচিত্র বিজ্ঞান হয়ে দাঁড়াবে। নীতিশাস্ত্রের পক্ষে নয় একেবারে বিপরীত কোটিতে গিয়ে দাঁড়াবে, যেমন শয়তান দাঁড়িয়ে আছে ভগবানের মুখোমুখি। এরূপ ধারণা অনুচিত। দুর্নীতি-বিজ্ঞান নীতিবিজ্ঞানেরই মধ্যে অন্তর্ভুক্ত, যেমন অন্তর্ভুক্ত মিথ্যা-জ্ঞান ন্যায়শাস্ত্রের বা সত্য-বিজ্ঞানের মধ্যে,অস্ফুটপ্রকাশ-বিজ্ঞান শিল্পতত্ত্বের বা সার্থক-প্রকাশ বিজ্ঞানের মধ্যে। অর্থনীতিশাস্ত্র যদি স্বার্থচিন্তারই বৈজ্ঞানিক বিচার হয়, তা'হ'লে তা' নীতিশাস্ত্রেরই অন্যতম অধ্যায়ে পরিণত হতো—নীতিশাস্ত্রই হতো, কারণ প্রত্যেক নৈতিক বিধির মধ্যে তার বিপরীতের নিষেধ নিহিত থাকে।

তারপর, নিজেদের বিবেক থেকেও বুঝতে পারি—অর্থপরায়ণ হওয়ার অর্থ ই স্বার্থৈকপ্রাণ হওয়া নয়, এমন কি যে অতি নীতিনিষ্ঠ ব্যক্তি তাকেও, হঠকারিতা করতে না হ'লে, নীতিবিগর্হিত কাজ করতে না হ'লে, প্রয়োজনীয় হওয়ার দিকে লক্ষ্য রেখে চলতে হয়। উপযোগিতা ও স্বার্থৈকপ্রাণতা যদি একই হবে, তবে, স্বার্থৈকপ্রাণদের মতো আচরণ করা পরার্থপর ব্যক্তিদের কর্তব্য হবে কি করে?

আমাদের যদি ভুল না হয়ে থাকে, তবে যেভাবে প্রকাশন ও সংজ্ঞায়, শিল্পতত্ত্বের ও ন্যায়শাস্ত্রের পারস্পরিক সম্বন্ধের সমস্যাটির সমাধান করা হয়েছে সেই একইভাবে এই সমস্যারও সমাধান করা হয়েছে। অর্থনীতিগত ইচ্ছা কোন লক্ষ্যে পৌছানোর ইচ্ছা, নীতিগত ইচ্ছা কোন সুবিবেচিত লক্ষ্যে পৌছানোর ইচ্ছা। কিন্তু যে নীতিগতভাবে ইচ্ছা ও কাজ করে, সে উপযোগের

হিসাব করে (অর্থনীতিগতভাবে) ইচ্ছা ও কাজ না করেই পারে না। কি করে সে সুবিবেচিত লক্ষ্যে পৌঁছানোর ইচ্ছা করবে—যদি না সে তাকে নিজের কাম্য লক্ষ্য হিসাবে ইচ্ছা করে?

তেমনি এর বিপরীত সিদ্ধান্ত কিন্তু ঠিক নয়, যেমন শিল্প-বিজ্ঞানে এ কথা ঠিক নয় যে প্রকাশন-ব্যাপারকে নৈয়ায়িক ব্যাপারসাপেক্ষ হতেই হবে। নীতিগতভাবে ইচ্ছা না করেও অর্থনীতিগতভাবে ইচ্ছা করা সম্ভব; এবং কোন একটি নীতিবিহীন লক্ষ্য অথবা এমন কোন লক্ষ্য যা উচ্চতর চেতনার স্তর থেকে দেখতে ঐরূপ মনে হয়, তা অনুসরণ করতে যেয়ে পরিপূর্ণ আর্থনৈতিক সঙ্গতির সঙ্গে নিজেকে চালনা করা সম্ভব।

নীতিশূন্য আর্থনৈতিকের দৃষ্টান্ত—মেকিয়াভেলির নায়ক সিজার বোর্গিয়া, অথবা শেক্সপীয়রের 'আয়াগো'। তাদের সমস্ত কাজ নিছক আর্থনৈতিক এবং নীতিবিপরীত হওয়া সত্ত্বেও কে তাদের ইচ্ছাশক্তির দৃঢ়তার প্রশংসা করবে না? কে প্রশংসা না করে পারবে—বোকাচিয়োর 'শের সিয়াপ্‌পিল্‌লেত্তো'কে (Ser Ciappellatto) যে এমন কি তার মৃত্যুশয্যাতেও সিদ্ধ শয়তানের আদর্শকে অনুসরণ ও চরিতার্থ করতে ইতস্ততঃ করে না—তার কপট স্বীকারোক্তির সময় ছিঁচকে ও ভীরু চোরদের দিয়ে ঘোষণা করায়—"কী অদ্ভুতস্বভাব এই মানুষটি যার বিকৃতিকে, জরা বা ব্যাধি, আসন্ন মৃত্যুর ভয় বা ঈশ্বরের বিচারাসনের সামনে এখুনই যেয়ে তাকে দাঁড়াতে হবে তার ভয়—কোন কিছুতেই দূর করতে পারেনি, অথবা যেভাবে সে জীবন যাপন করে এসেছে তার চেয়ে ভিন্ন ভাবে মরবার ইচ্ছা তার মনে জাগাতে পারেনি"?

*** নীতিনিষ্ঠ মানুষের মধ্যে, সিজার বোর্গিয়া, আয়াগো বা শের সিয়াপ্‌পিলোত্তোর নির্ভীকতা ও অদম্যতার সঙ্গে সাধুসন্তের বা বীরের সদিচ্ছার মিলন ঘটে। যদি সদিচ্ছার 'সৎ' গুণটির সঙ্গে 'ইচ্ছা' গুণটিও না থাকতো তা'হ'লে সদিচ্ছা 'ইচ্ছা'ই হতো না, সুতরাং সৎও হতো না। তেমনি কোন নৈয়ায়িক চিন্তা যদি নিজেকে ঠিক ভাবে ব্যক্ত করতেই না পারে তবে তা' চিন্তাই নয়—চিন্তার অস্পষ্ট আভাস মাত্র।

সুতরাং অ-নৈতিক মানুষকে অন্‌-আর্থনৈতিক মানুষ মনে করা বা

নীতিকে ব্যবহারিক জীবনের তথা আর্থনৈতিক জীবনের সঙ্গতির উপাদান হিসাবে দেখা, ঠিক নয়। নীতিবিবেকশূন্য কোন মানুষের ধারণা করার পথে বাধা কিছুই নেই। (এ ধারণার অবকাশ জীবনের সব সময়ে না ঘটলেও কোন কোন সময়ে ঘটে থাকে।) ঐরূপ চরিত্রের মানুষের কাছে আমরা যাকে দুর্নীতি বলি তা' দুর্নীতি নয়, কারণ দুর্নীতির ধারণাই তার মধ্যে নেই।

তার মধ্যে প্রবৃত্তির ও নিবৃত্তির দ্বন্দ্বের চেতনাই নেই। এই দ্বন্দ্ব বা বিরোধ অর্থনীতিসেবিতার পরিপন্থী। নীতিভ্রষ্ট আচরণ অর্থকামনা-বিরোধী হয় শুধু তারই মধ্যে যার নীতিবোধ বা বিবেক আছে। নৈতিক অনুতাপ— যা বিবেকের অস্তিত্বের নিদর্শন—আর্থনৈতিক অনুতাপও বটে, অর্থাৎ পূর্ণরূপে ইচ্ছাকে ব্যক্ত করতে না জানার দুঃখ—আবেগ দ্বারা বিপথগামী না হয়ে নৈতিক লক্ষ্যে পৌছানোর যে সংকল্প করা হয়েছে, সেই সংকল্প সিদ্ধ না করতে পারার দুঃখ। 'Video meliora proboque, deteriora Sequor.' 'Video' এবং 'probo' এখানে প্রাথমিক 'volo' যা' তৎক্ষণাৎ বিরোধ-ব্যাহত ও উচ্ছিন্ন হয়ে যায়। নীতিজ্ঞানশূন্য মানুষের মধ্যে এমন অনুতাপ সম্ভব যা' শুধুমাত্র আর্থনৈতিক ; যেমন, কোন চোরের বা হত্যাকারীর অনুতাপ যে চুরি করতে বা হত্যা করতে যেয়েও, মানসিক পরিবর্তনের জন্য নয়, দুর্বলতার জন্য অথবা ক্ষণিকের জন্য বিবেকের জাগরণের ফলে, কাজ করতে বিরত হয়। ঐ চোর বা হত্যাকারী যখন প্রকৃতিস্থ হয় তখন অনুতপ্ত হয় এবং তার আচরণের অসঙ্গতির কথা ভেবে লজ্জিত হয়। পাপ করেছে বলেই সে অনুতপ্ত তা' নয়, তার অনুতাপ পাপ না-করতে পারার জন্য। সুতরাং এ অনুতাপ আর্থনৈতিক, নৈতিক নয়। কারণ আমাদের প্রকল্প বা প্রস্তাব অনুসারে 'নৈতিক' 'আর্থনৈতিক' বৃত্তের বহির্ভূত। কিন্তু, যেহেতু অধিকাংশ লোকের মধ্যে সতেজ নৈতিক চেতনা দেখা যায়, এবং তার সম্পূর্ণ অভাব খুবই দুর্লভ—সম্ভবতঃ অস্তিত্বহীন বীভৎসতা, সেই হেতু এ কথা স্বীকার করা যেতে পারে যে ব্যবহারিক জীবনযাপনে নীতি সাধারণতঃ অর্থনীতির সঙ্গে পাশাপাশি হয়েই চলে থাকে।

• *** যে সাদৃশ্যকে (প্যারালাললেজিম্) আমরা সমর্থন করি, তা' যদি এই বিজ্ঞানে নতুন করে 'নীতি-উদাসীনতা'র প্রস্তাবকে (ক্যাটিগোরি অফ মরালি ইণ্ডিফারেণ্ট) যা' যথার্থ ক্রিয়া বা ইচ্ছা হওয়া সত্ত্বেও সুনীতি বা দুর্নীতি কোনটিরই অন্তর্গত নয় তেমন কোন বস্তুকে প্রবেশ না করায়।

যদি বৈধতার ও ঔচিত্যের হিসাব—প্রবেশ না করায়, তা' হ'লে ভয়ের কোন কারণ নেই। এ অতি সত্য কথা যে উদাসীন নৈতিক ক্রিয়া বলে কিছু থাকতে পারে না, কারণ নৈতিক ক্রিয়া মানুষের ঐচ্ছিক ক্রিয়ার সমগ্র ক্ষেত্রেই পরিব্যাপ্ত। কিন্তু প্রতিষ্ঠিত সাদৃশ্যকে এ বিপর্যস্ত তো করেই না, বরং সমর্থনই করে। এমন কোন প্রতিভান থাকতে পারে কি যা' বিজ্ঞান ও বুদ্ধির গণ্ডীর বাইরে, যাকে বিজ্ঞান ও বুদ্ধি বিশ্লেষণ করতে পারে না? যাকে সামান্য সংজ্ঞায় বা ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তে পরিণত করতে পারে না? আমরা আগেই দেখেছি যে প্রকৃত বিজ্ঞানের এবং দর্শনেরও তথাকথিত প্রকৃতি-বিজ্ঞানের মতো কোন বাহ্য সীমার প্রতিবন্ধকতা নেই। বিজ্ঞানের ও নীতির সর্বব্যাপী অধিকার। একের অধিকার শৈল্পিক প্রতিভানের উপরে, অন্যের অধিকার মানুষের আর্থনৈতিক ইচ্ছার উপরে—অবশ্য কোনটিই স্বরূপ নিয়ে উপস্থিত থাকতে পারে না—প্রথমটিকে থাকতে হয় প্রাতিভানিক রূপে, দ্বিতীয়টিকে থাকতে হয় আর্থনৈতিক রূপে।

প্রয়োজনীয় ও নৈতিকের, আর্থনৈতিক ও নৈতিকের এই সাদৃশ্য ও পার্থক্য, নীতিশাস্ত্রোক্ত উপযোগ-মতবাদের সাফল্যের কারণটি—(যে সাফল্য আগেও ছিল এবং এখনও আছে) ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিচ্ছে। বাস্তবিকই প্রত্যেক নৈয়ায়িক বাক্যে যেমন একটি শৈল্পিক দিক দেখানো যায়, তেমনি প্রত্যেক নৈতিক ক্রিয়ার মধ্যে উপযোগের দিক আবিষ্কার ও প্রদর্শন করা যায়। এই সত্যকে অস্বীকার করে এবং অপ্রয়োজনীয় নৈতিক ক্রিয়ার মিথ্যা ও অসৎ দৃষ্টান্ত খুঁজে বের করে—নীতিশাস্ত্রের উপযোগবাদের সমালোচনা শুরু হতে পারে না। উপযোগের দিকটি অবশ্যই একে স্বীকার করতে হবে, এবং নীতিরই একটি বাস্তবিক রূপ হিসাবে তা' ব্যাখ্যা করতে হবে। নীতিরই বাস্তবিক রূপ হবে এই কারণে যে তা' নীতির ভিতরে অন্তর্ভুক্ত।

উপযোগবাদীরা এই ভিতরের দিকে দৃষ্টিপাত করেন না। এই সব বিষয়ের সবিস্তার আলোচনার অবকাশ এখানে নেই। নীতিশাস্ত্র এবং অর্থনীতিশাস্ত্র, তাদের পারস্পরিক সম্বন্ধের যথার্থ রূপটি নিরূপণ করতে পারলে, লাভবানই হবে। অর্থনীতিশাস্ত্র, যত গাণিতিক পর্যায় থেকে—যার সঙ্গে এখনও সে জড়িয়ে আছে—যে পর্যায় একদা ঐতিহাসিকত্বকে, ঐতিহাসিকের সঙ্গে জ্ঞানাত্মিককে এক করে ফেলার ভুলকে, অতিক্রম করেছিল বলে এবং কতকগুলি খাম-খেয়ালী ভেদকল্পনা ও মিথ্যা আর্থনৈতিক মতবাদকে নস্যাৎ করেছিল বলে, প্রগতি বলে গণ্য হয়েছিল—সেই গাণিতিক পর্যায় থেকে—দূরে সরে যাচ্ছে—তত উপযোগীর অর্থক্রিয়াকারিত্বের ধারণায় (এ্যাকটিভিটিকাল কনসেপ্ট অফ দি ইয়ুসফুল) পৌঁছানোর চেষ্টা করছে। এই ধারণা নিয়ে একদিকে তথাকথিত বিশুদ্ধ অর্থনীতির অর্ধদার্শনিক সিদ্ধান্তগুলি পরীক্ষা করা এবং অঙ্গীকার করে নেওয়া সহজ হবে, অন্যদিকে অধিকতর জটিলতার ও সংযোজনার দ্বারা দার্শনিক পদ্ধতি থেকে প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে পরিবর্তন সংঘটিত করা তথা তথাকথিত রাজনৈতিক বা জাতীয় অর্থনীতির বিভিন্ন মতবাদগুলিকে সমন্বিত করা সহজ কাজ হবে।

যেমন, শৈল্পিক প্রতিভান জানে বস্তুবিশ্বকে বা প্রকৃতিকে, এবং দার্শনিক সংজ্ঞা জানে অরূপতত্ত্বকে—আত্মাকে, তেমনি আর্থনৈতিক ক্রিয়া চায়—বস্তুজগতকে এবং নৈতিক ক্রিয়া চায়—অরূপতত্ত্বকে, আত্মাকে। আত্মা যখন নিজেকেই চায়, তার স্বরূপকেই চায় তখন সীমার মধ্যে যে অসীম 'সামান্য' রয়েছে তাকেই চায়—এই সূত্রই, সম্ভবতঃ নীতির স্বধর্মকে সব চেয়ে কম অসঙ্গতির সঙ্গে নিরূপণ করে থাকে। সত্য স্বরূপকে পাওয়ার ইচ্ছাই—পরম মুক্তি।

অষ্টম অধ্যায়

আত্মার অন্যবিধ রূপের সম্ভাবনা অস্বীকার

এই অধ্যায়ে ক্রোচে নিম্নলিখিত বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন।

(ক) আত্মার বিভিন্ন বৃত্তি বা তন্ত্র।

(খ) প্রতিভার প্রকার।

(গ) পঞ্চম বৃত্তি বা ক্রিয়ার অনস্তিত্ব—আইন কানুন—সামাজিকতা।

(ঘ) ধর্ম।

(ঙ) পরাতত্ত্ব।

(চ) মানসিক কল্পনা ও প্রাতিভানিক বুদ্ধি।

(ছ) রহস্যবাদী শিল্পতত্ত্ব।

(জ) শিল্পের নশ্বরতা-অবিনশ্বরতা

** 'আত্মার দর্শন' (ফিলোসফি অফ দি স্পিরিট) এবং তার মূল বৃত্তি সম্বন্ধে যে সংক্ষিপ্ত পরিচয় আমরা দিয়েছি তাতে আত্মাকে চার বৃত্তিসম্পন্ন সত্তা বলে ধারণা করা হয়েছে এবং দেখানো হয়েছে—জ্ঞানাত্মিকা ক্রিয়ার সঙ্গে কর্মাত্মিকা ক্রিয়ার সেই একই সম্পর্ক যে সম্পর্ক আছে জ্ঞানাত্মিকা ক্রিয়ার প্রথম পর্যায়ের সঙ্গে দ্বিতীয় পর্যায়ের, কর্মাত্মিকার প্রথম পর্যায়ের সঙ্গে দ্বিতীয় পর্যায়ের।

এই চারটি মুহূর্ত পরস্পর অনুলোম সম্পর্কে সম্পর্কিত। সংজ্ঞা প্রকাশ ছাড়া থাকতে পারে না, প্রয়োজনীয় প্রকাশনও সংজ্ঞা ছাড়া থাকতে পারে না এবং নীতি প্রয়োজন, প্রকাশন ও সংজ্ঞা—এই তিনটি ছেড়ে থাকতে পারে না। যদি শৈল্পিক ব্যাপারটিই সবচেয়ে স্বাধীন হয় এবং অন্যান্য ব্যাপার কম-বেশী পরাধীন হয়, তবে নৈয়ায়িক হচ্ছে সব চেয়ে কম পরাধীন এবং নৈতিক হচ্ছে সব চেয়ে বেশী পরাধীন। জ্ঞানবৃত্তির ভিত্তির উপরেই নৈতিক বৃত্তি দাঁড়িয়ে আছে, জ্ঞাননিরপেক্ষ হয়ে নৈতিক বৃত্তি

থাকতে পারে না ; অবশ্য আমরা যদি, জেসুইটরা যাকে 'অভিপ্রায়ের অভিমুখ' (ডিরেকশান অফ ইণ্টেন্‌শান) বলেছেন এবং যাতে মানুষ ভালো করে জানা সত্ত্বেও না জানার ভান করে—সেই মিথ্যা প্রক্রিয়াকে মেনে নি, তবে ভিন্ন কথা।

(খ) * * মানুষের কর্মের রূপ যদি হয় সংখ্যায় চার তা' হ'লে প্রতিভার রূপের সংখ্যাও চার। শিল্পপ্রতিভা বিজ্ঞানপ্রতিভা নীতিনিষ্ঠা প্রতিভা বা বীরত্ব সর্বদাই স্বীকৃত-সমাদৃত হয়েছে বটে, কিন্তু বিশুদ্ধ অর্থকাম-প্রতিভাকে মানুষ ঘৃণাই করে এসেছে। শয়তানি প্রতিভা বলে যে একটি শ্রেণী কল্পনা করা হয়েছে তা একেবারে অকারণ নয়। যে কর্মপ্রবৃত্তি শুধুই আর্থনৈতিক প্রতিভা—সুবিবেচিত লক্ষ্যের দিকে যার কোন আভিমুখ্য নেই, সে শংকা-মিশ্রিত বিস্ময় না জাগিয়ে পারে না। 'প্রতিভা' শব্দটি শুধু শিল্প-স্রষ্টার, বৈজ্ঞানিক গবেষকের এবং কর্মীর ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হবে কিনা, এ নিয়ে বাদ বিসম্বাদ করা শুধু কথার পিঠে কথা বাড়ানো মাত্র। অন্যপক্ষে—প্রতিভা, সে যে কোন রকমের প্রতিভাই হোক না কেন,—সর্বদাই পরিমাণমূলক ধারণা এবং বস্তুগত বৈলক্ষণ্য—একথা বলা, শৈল্পিক প্রতিভা সম্বন্ধে যে ব্যাখ্যা করা হয়েছে তারই পুনরাবৃত্তি করা।

(গ) * * পঞ্চম প্রকার আত্মিক ক্রিয়া বলে কোন ক্রিয়ার অস্তিত্ব নেই। এ প্রমাণ করা খুবই সহজ যে অন্যপ্রকার ক্রিয়াগুলিতে হয় ক্রিয়ার ধর্মই নেই, না হয় তারা পূর্ব-পরীক্ষিত ক্রিয়াগুলিরই ভিন্ন ভিন্ন পরিভাষা বা যৌগিক ও ব্যুৎপন্ন রূপ—যাতে একাধিক ক্রিয়ার মিশ্রণ ঘটেছে, এবং বিশেষ বিশেষ বিষয়গুলি স্থানলাভ করেছে।

যেমন ধরা যাক—বিধান-প্রণয়ন (জুরিডিকাল ফ্যাক্ট)। বিধান প্রণয়ন বলতে আইন-কানুন বুঝায় এবং তা আর্থনৈতিক এবং নৈয়ায়িক ক্রিয়া থেকে ব্যুৎপন্ন। বিধান হচ্ছে নিয়ম-সূত্র (লিখিত বা মৌখিক এখানে সে বিচার নিষ্প্রয়োজন) যাতে ব্যক্তি-অভিপ্রেত বা সমাজ-অভিপ্রেত আর্থনৈতিক সম্বন্ধ নির্ধারিত হয় এবং এই আর্থনৈতিক দিকটি যুগপৎ তাকে নৈতিক ক্রিয়ার সঙ্গে এক এবং নৈতিক ক্রিয়া থেকে পৃথক করে। আর একটি দৃষ্টান্ত নেওয়া-

যাক। সমাজ-বিজ্ঞান (বহু অর্থে আজ কাল ব্যবহৃত) বলতে কখনো কখনো-সামাজিকতা (সোসিয়েবিলিটি) নামক মৌলিক কোন বিষয়ের আলোচনা, বুঝায়। কিন্তু সামাজিকতা অর্থাৎ যে সম্বন্ধগুলি মানুষের গোষ্ঠীর মধ্যে গড়ে ওঠে, মনুষ্যেতর প্রাণীদের মধ্যে গড়ে ওঠে না, যদি - মানুষেরই—বিভিন্ন আত্মিক ক্রিয়া না হয়—

যে ক্রিয়া মনুষ্যেতর প্রাণীর মধ্যে দেখা যায় না বা গেলেও অতি স্বল্প মাত্রায় দেখা যায়, সেই ক্রিয়া না হয়—তা'হলে আর কি বৈশিষ্ট্য তার থাকতে পারে? সুতরাং সামাজিকতা কোন মৌলিক, সরল, অব্যুৎপাদ্য ধারণা নয়, অতি জটিল ও যৌগিক ধারণা। এর অন্যতম প্রমাণ এই যে, এমন কোন একটি সূত্র তৈরি করা সম্ভব নয়, যাকে একমাত্র সমাজ-বিজ্ঞানেরই সূত্র বলা যেতে পারে। সমাজ-বিজ্ঞানের সূত্র বলে যেসব তথাকল্পিত সূত্র প্রচলিত, তারা হয় ভূয়োদর্শনলব্ধ ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত অথবা আত্মিক বিধি-বিধান, অর্থাৎ সেই সব সিদ্ধান্ত যাতে আত্মিক ক্রিয়ার ধারণাগুলিকে অনূদিত করা হয়েছে—এবং যা' তথাকথিত বিবর্তন-সূত্রের মতো শুধু শূন্যগর্ভ অনির্দিষ্ট সামান্য বচন মাত্র নয়। কখনও কখনও 'সামাজিকতা' বলতে সামাজিক নিয়ম তথা বিধিবিধান ছাড়া আর কিছুই বুঝায় না, ফলে সমাজ-বিজ্ঞান—বিধি বিজ্ঞানের সঙ্গে একাকার হয়ে গেছে। বিধি-বিধান, সামাজিকতা এবং অনুরূপ সংজ্ঞাগুলির আলোচনায় সেই পদ্ধতিই অবলম্বন করতে হবে যা ঐতিহাসিকতা ও ক্রিয়া-প্রকরণ (টেকনিক) বিশ্লেষণ ও বিচার করার সময় আমরা অবলম্বন করেছি।

(ঘ) * * * এ কথা মনে হতে পারে—ধর্মনৈতিক (রিলিজিয়ন) ক্রিয়াকে স্বতন্ত্রভাবে বিচার করা উচিত। কিন্তু ধর্ম জ্ঞান ছাড়া আর কিছুই নয় এবং জ্ঞানের রূপ ও উপরূপ থেকে পৃথক কিছু নয়।

আসলে হয় এ কর্মের আকাঙ্ক্ষার ও আদর্শের (ধর্মীয় আদর্শের) অভিব্যক্তি, না-হয় ঐতিহাসিক বর্ণনার (পৌরাণিক বার্তা), নতুবা বৌদ্ধিক বিজ্ঞানের (মতবাদ বা ডগ্‌মা) অভিব্যক্তি। অতএব জ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে ধর্মের মৃত্যু ঘটে, অথবা মানুষের সমাজে ধর্ম সব সময়েই থাকে—এই দুটো উক্তির প্রত্যেকটিই সমান সত্য। আদিম মানুষের ধর্ম ছিল তাদের সমস্ত মানসিক

উত্তরাধিকার বা সম্পত্তি। আমাদের ধর্ম আমাদের বৌদ্ধিক সম্পদ। এর ভিতর-কার বস্তু পরিবর্তিত,উন্নততর এবং সূক্ষ্মতর হয়েছে,ভবিষ্যতে আরো পরিবর্তিত, উন্নততর ও সূক্ষ্মতর হবে, কিন্তু এর রূপ বা আকার সর্বকালেই একরকমই। যারা ধর্মকে মানুষের জ্ঞানাত্মিকা ক্রিয়ার—তার শিল্পের সমালোচনার ও দর্শনের পাশে সুরক্ষিত করে রাখতে চায়, জানিনে,—ধর্ম দিয়ে তাদের কোন্ কাজ হবে। যে জ্ঞান এসে ধর্মকে অতিক্রম করে গেছে এবং অসত্য বলে প্রমাণ করেছে তারই পাশাপাশি রেখে ধর্মের মতো হেয় ও অসত্য জ্ঞানকে রক্ষা করা কিছুতেই সম্ভব নয়। ক্যাথলিক ধর্ম, তার মত ও নীতিবিরুদ্ধ বিজ্ঞান-ইতিহাস-নীতিকে কিছুতেই সহ্য করবে না এবং ঐ বিষয়ে তাদের আচরণ সর্বদাই সঙ্গতিপূর্ণ। যুক্তিবাদীদের সঙ্গতি একটু কম। তাদের সমগ্র জ্ঞানরাজ্যের সঙ্গে বিরোধের সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও, তারা তাদের মনের মধ্যে ধর্মের জন্য সামান্য একটু স্থান ছেড়ে দিতে রাজি।

আমাদের সমসাময়িক যুক্তিবাদীদের মধ্যে যে ধর্মভান ও দুর্বলতা দেখা যায়, তার মূল কারণ নিহিত রয়েছে—প্রকৃতিবিজ্ঞানের নির্বিচার ও অন্ধ উপাসনার কুসংস্কারের মধ্যে। আমরা নিজেরাও জানি এবং তাঁদের প্রধান প্রতিনিধিরাও স্বীকার করেন—এই সব বিজ্ঞান সীমাবদ্ধ। প্রকৃতিবিজ্ঞানের সঙ্গে বিজ্ঞানকে ভুল করে এক মনে করায়, এ খুবই স্বাভাবিক যে ধর্মের মধ্যেই মানুষের অবশিষ্ট কাম্যকে—অনুসন্ধান করা হবে। আজকে যে নতুন করে এই অস্বাস্থ্যকর ধর্মোন্মাদনা দেখা দিয়েছে—যে উন্মাদনা রাজনীতিজীবিদের কাজে না লাগলে, ব্যাধি হিসাবে হাসপাতালেই চিকিৎসিত হওয়া উচিত, তারজন্য আমরা বস্তুবাদ (মেটিরিয়ালিজম), প্রত্যক্ষৈকপ্রমাণবাদ (পজিটিভিজিম্) এবং প্রাকৃতবাদের (নেচারালিজিম্) কাছে ঋণী।

(ঙ) * * * দর্শন, ধর্মের অস্তিত্বের সমস্ত কারণকে উৎখাত করে; কারণ ধর্মের স্থান সে নিজেই গ্রহণ করে। আত্মার বিজ্ঞান হিসাবে এ ধর্মকে ঘটনারূপে—অস্থায়ী ঐতিহাসিক ঘটনা, অতিক্রমণীয় মানসিক অবস্থারূপে গণ্য করে। দর্শনও প্রকৃতিবিজ্ঞানের ইতিহাসের এবং শিল্পের সঙ্গে জ্ঞানরাজ্যের অংশীদার। প্রথমটির উপর পরিসংখ্যান, পরিমাপ এবং শ্রেণীবিভাগের ভার,

দ্বিতীয়টির উপরে—যে যে বিশেষ ঘটনা ঘটেছে তাদের বিবরণ দেওয়ার ভার এবং তৃতীয়টির উপর, সম্ভাব্য বিশেষের ভার ন্যস্ত। ধর্মের উপরে ন্যস্ত করার মতো কোন কিছুই অবশিষ্ট নেই। এই একই কারণে, দর্শন আত্মার বিজ্ঞান স্বরূপে, প্রাতিভানিক তথ্যের দর্শন বা ইতিহাসের দর্শন বা প্রকৃতির দর্শন হতে পারে না। সুতরাং এমন দর্শন সম্ভব নয় যা' রূপের বা সামান্যের দর্শন নয়, বস্তুবিশেষের দর্শন। এ কথা বলার তাৎপর্য এই যে পরাদর্শন (মেটাফিজিক) বলে কিছু থাকা সম্ভব নয়।

'ইতিহাসেব দর্শন' এর স্থানে বসেছে—ইতিহাসেব যুক্তিরীতি বা পদ্ধতি-বিদ্যা; 'প্রকৃতির দর্শন'-এর স্থান অধিকার করেছে, প্রকৃতিবিজ্ঞানে-ব্যবহৃত সংজ্ঞাগুলির জ্ঞানতত্ত্ব (এপিস্টেমোলজি)। ইতিহাসের যেটুকু দর্শনের আলোচ্য সে হচ্ছে তার গঠন-রীতি (প্রতিভান, প্রতীতি, তথ্য, সম্ভাব্যতা প্রভৃতি)। প্রকৃতিবিজ্ঞানের যেটুকু সে হচ্ছে—সংজ্ঞার রূপগুলি (দেশ, কাল, গতি, সংখ্যা, জাতি, শ্রেণী ইত্যাদি)। দর্শন বলতে যদি পরাদর্শন এবং যে অর্থে শব্দটি আগে আলোচিত হয়েছে সেই অর্থ, বুঝায়, তা'হ'লে দর্শন ইতিহাসের এবং প্রকৃতিবিজ্ঞানের প্রতিযোগী হয়ে পড়বে, যে ক্ষেত্রে ইতিহাসের ও প্রকৃতি বিজ্ঞানের প্রকৃত অধিকাব, সেই ক্ষেত্রে প্রবেশ করবে। এরূপ প্রতিযোগিতায় যারা দর্শনকে প্রতিযোগী করেছেন, তাদের অপটুতা ছাড়া আর কিছুই ব্যক্ত কবতে পারে না। এই হিসাবে আমরা পরাতত্ত্ববাদীব বিপক্ষে। কিন্তু যখন শব্দটিতে প্রকৃতি-বিজ্ঞানের ভূয়োদর্শনের ও শ্রেণী-বিভাজনের ব্যাপার না বুঝিয়ে দর্শনকে 'আত্মার আত্ম-চৈতন্য' বলে স্বীকৃতি দেবে, তখন আমরা অতিপরাতত্ত্ববাদী বলেই নিজেদের ঘোষণা করব।

(চ) * * * আত্মার বিজ্ঞানগুলির পাশে নিজের প্রতিষ্ঠা অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য পরাদর্শন বিলক্ষণ একটি আত্মিক ক্রিয়ার অস্তিত্ব স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে। এই ক্রিয়াটি, অতীতে 'মানসিক বা উন্নত কল্পনা' নামে এবং বর্তমান কালে—'প্রাতিভানিক বুদ্ধি' বা 'বৌদ্ধিক প্রতিভান' নামে প্রায়শঃ অভিহিত এবং ক্রিয়াটিতে কল্পনার এবং বুদ্ধিব ধর্মের সহযোগে এক অপূর্ব রূপ ব্যক্ত হয়েছে। এ আমাদের অসীম থেকে সীমায়, রূপ থেকে বস্তুতে, সংজ্ঞা থেকে

প্রতিভানে, বিজ্ঞান থেকে ইতিহাসে অবরোহ-ন্যায়ে পৌঁছানোর উপায় যুগিয়ে দিয়েছে এবং এ এমন একটি প্রক্রিয়া যা সামান্য ও বিশেষ, অবস্তু ও বস্তু, প্রতিভান ও বুদ্ধি উভয়ের মধ্যে প্রবেশ করে আছে। বাস্তবিকই এ অতি অদ্ভুত বৃত্তি এবং অতি মূল্যবান সম্পদ বটে, কিন্তু যাদের এই বৃত্তি বা শক্তি নেই, সেই আমরা এর অস্তিত্বকে কোন উপায়েই প্রমাণ করতে পারিনে।

(ছ) * * * বৌদ্ধিক প্রতিভানকে কখনো কখনো, প্রকৃত শৈল্পিক ক্রিয়া বলে মনে করা হয়েছে। আবার কোন কোন সময়, অনুরূপ একটি অদ্ভুত শৈল্পিক ক্রিয়াকে—সরল প্রতিভান থেকে সম্পূর্ণ পৃথক একটি ব্যাপারকে এরই পাশে, নীচে বা উপরে স্থান দেওয়া হয়। এই বৃত্তিটির মহিমাকে উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করা হয়েছে এবং এরই সৃষ্টি হিসাবে কতকগুলি শিল্পকে খামখেয়ালী ভাবে নির্বাচিত করা হয়েছে। শিল্প, ধর্ম এবং দর্শন সব একাকার হয়ে গেছে বা আত্মার তিনটি স্বতন্ত্র বৃত্তিতে পরিণত হয়েছে, কখনো একটি, কখনো অন্যটি গৌরবে সর্বপ্রধান হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এই রহস্যবাদী (মিস্টিকাল) শিল্পতত্ত্বের ধারণা, যত রূপ নিয়েছে এবং যত রূপ নিতে পারে তার পরিসংখ্যা করা সম্ভব নয়। এখানে আমরা কল্পনা বিজ্ঞানের রাজ্যে থাকি না। আবেগ ও প্রত্যয় থেকে বিচিত্র উপাদান নিয়ে যা' নিজের জগৎ তৈরি করে সেই স্বয়ং-কল্পনারই রাজ্যে থাকি। উল্লেখ করলেই যথেষ্ট হবে যে এই রহস্যময় বৃত্তি,'কখনো কর্মাত্মিকা রূপে, কখনো কর্মাত্মিকা ও জ্ঞানাত্মিকার সংযোগ রূপে, কখনো দর্শনের ও ধর্মের পার্শ্ববর্তী জ্ঞানাত্মিকা ক্রিয়ারূপে অবধৃত হয়েছে।

(জ) * * * এই শেষোক্ত ধারণা থেকে কখনো কখনো অবিনশ্বরতা অনুসিদ্ধান্তিত হয়েছে—তার সহোদরাদের মতো শিল্পকেও পরাচৈতন্য লোকের অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করা হয়েছে। আবার কখনো কখনো যখন ধর্মকে নশ্বর বলে এবং দর্শনের মধ্যে অবলুপ্ত বলে মনে করা হয়েছে, তখন, শিল্পের নশ্বরতা—এমন কি আসন্ন বা আগত মৃত্যুর কথাও ঘোষণা করা হয়েছে। আমাদের কাছে এই প্রশ্নের কোন অর্থ নেই—কারণ শিল্প যখন আত্মারই অন্যতম বৃত্তির ব্যাপার তখন শিল্পকে উৎপাটিত করা যাবে কিনা এ

প্রশ্ন করা আর সংবেদন বা বুদ্ধিকে বাদ দেওয়া যাবে কিনা, এই প্রশ্ন করা একই কথা। উল্লিখিত অর্থে পরাদর্শন, নিজেকে এক কল্পলোকের অধিবাসী করে তুলেছে। তার বিশেষ বিশেষ রূপকে সমালোচনা করা চলে না, যেমন আমরা সমালোচনা করতে পারিনে—আলসিনা-উদ্যানের উদ্ভিদ-বিদ্যাকে বা এ্যাস্টোলফোর সমুদ্রযাত্রার নৌ বিদ্যাকে। সমালোচনা তখনই সম্ভব যখন আমরা খেলায় যোগ দিতেই অস্বীকার করি অর্থাৎ যখন আমরা পরাদর্শনের —পূর্বনির্দিষ্ট অর্থের পরাদর্শনের—অস্তিত্ব অস্বীকার করি।

অতএব, দর্শনে বৌদ্ধিক প্রতিভান বলে কোন কিছু নেই, যেমন শিল্পের ক্ষেত্রে নেই এবই কোন বিকল্প বা অন্য কোন প্রক্রিয়া যা' দিয়ে এই কাল্পনিক বৃত্তিটিকে অভিহিত বা উপস্থাপিত করা যেতে পারে। পুনরাবৃত্তি করেই বলছি—পঞ্চম পর্যায় বলে, পঞ্চম বা সর্বোচ্চ বৃত্তি বলে কোন জ্ঞানাত্মিকা বা কর্ম-জ্ঞানাত্মিকা, কাল্পনিক বৌদ্ধিক বা বৌদ্ধিক কাল্পনিক বা অন্য কোনরূপ বিলক্ষণ বত্তি নেই।

নবম অধ্যায়

প্রকাশনের অবিভাজ্যতা এবং অলংকারের সমালোচনা

শিল্পের বৈশিষ্ট্যের (ক্যারাকটারস্) দীর্ঘ তালিকা দেওয়ার প্রথা আছে। গ্রন্থের এই পর্যায়ে এসে এবং শিল্পকে আত্মিক ক্রিয়া, জ্ঞানাত্মিকা ক্রিয়া এবং বিশেষ ধরণের জ্ঞানাত্মিকা ক্রিয়া (প্রাতিভানিক) বলে নির্ধারণ করার পরে, এটুকু আমরা ধরতে পেরেছি যে ঐসব বিচিত্র ও বহুসংখ্যক বৈশিষ্ট্য—যেখানে তারা কোন কিছু বাস্তবের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে সেখানে তারা শিল্পরূপের জাতি, প্রজাতি ও ব্যক্তিলক্ষণ ছাড়া আর কিছুই বুঝায় না, তাদের সঙ্গে আমাদের পরিচয় আগেই হয়ে গেছে। জাতি-লক্ষণের মধ্যে পড়বে,—আগেই আমরা দেখেছি—এই সব বৈশিষ্ট্যগুলি যেমন, ঐক্য, বৈচিত্র্যের-সমবায়ে-ঐক্য, সরলতা, মৌলিকতা ইত্যাদি। প্রজাতি-লক্ষণে পড়বে—সত্যতা, আন্তরিকতা প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যগুলি এবং ব্যক্তি-লক্ষণে পড়বে—জীবন, সতেজতা, প্রাণবত্তা, বিশেষত্ব, ব্যক্তিত্ব প্রভৃতি। এই শব্দগুলি বদলে যেতে পারে, কিন্তু তা'তে নতুন বৈজ্ঞানিক কিছু যুক্ত হবে না। প্রকাশনের বিশ্লেষণ উল্লিখিত বৈশিষ্ট্য নির্ধারণের মধ্যেই সম্পূর্ণ সম্পন্ন হয়ে গেছে।

*** এই মুহূর্তে, প্রশ্ন উত্থাপন করা যেতে পারে—প্রকাশনের কোন রীতি বা মাত্রা-তারতম্য থাকতে পারে কিনা এবং আত্মার ক্রিয়াকে যেমন দুই পর্যায়ে ভাগ করা হয়েছে এবং তার প্রত্যেকটি পর্যায়কে আবার যেমন দুই পর্যায়ে ভাগ করা হয়েছে*, তেমনি তার একটিকে—প্রাতিভানিক-প্রাকাশনিককে—একাধিক পর্যায়ে—প্রথম, দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় পর্যায়ে—ভাগ করা চলে কিনা। না চলে না, এরূপে কোন পুনর্বিভাগ সম্ভব নয়। প্রতিভান-প্রকাশনের শ্রেণীবিভাগ নিশ্চয়ই করতে দেওয়া যেতে পারে, কিন্তু তা দার্শনিক কোন বিভাগ নয়। বিশেষ বিশেষ প্রকাশন বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি এবং কোন

একটিকেই কোন একটির সঙ্গে অদল-বদল করা চলে না। তারা এই হিসাবেই এক যে সকলেই প্রকাশন। পণ্ডিতদের ভাষায় বলতে গেলে বলা যায়—প্রকাশন এমন একটি প্রজাতি যে কখনো জাতির মর্যাদা পাবে না। প্রত্যয় বা আধেয় বস্তু বদলে যেতে পারে; প্রত্যেকটি আধেয় বস্তু অন্যান্য বস্তু থেকে পৃথক, কারণ জীবনে পুনরাবৃত্তি ঘটতে পারে না এবং প্রকাশনের রূপবৈচিত্র্য আধেয় বস্তুর অর্থাৎ প্রত্যয়সমূহের শৈল্পিক সংশ্লেষণের অবিরাম পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই ঘটে থাকে।

* * * এরই একটি অনুসিদ্ধান্ত—অনুবাদের অসম্ভবতা; অবশ্য অনুবাদ বলতে যখন, বিশেষাকারের পাত্র থেকে ভিন্নাকারবিশিষ্ট পাত্রে তরল পদার্থ ঢালার মতো, এক প্রকাশনকে অন্য প্রকাশনে পুনর্গঠন করা বুঝায়।

শৈল্পিক রূপ রূপে যাকে আমরা পেয়েছি, তাকেই আমরা ন্যায়সঙ্গতভাবে বিস্তার করতে পারি, কিন্তু যা একবার শৈল্পিক রূপ পরিগ্রহ করেছে, তাকে অন্য শৈল্পিক রূপে পরিণত করতে পারিনে। বাস্তবিকই প্রকাশনকে প্রত্যয়ের স্তরে নামিয়ে দিয়ে—অনুবাদকের ব্যক্তিগত প্রত্যয়ের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে অনুবাদ হয় প্রকাশনকে ক্ষুণ্ণ ও নষ্ট করে, না-হয় নতুন প্রকাশন সৃষ্টি করে; প্রথম ক্ষেত্রে অনুবাদ কম-বেশী ত্রুটিপূর্ণ হওয়ায় অর্থাৎ খাঁটি প্রকাশন না হওয়ায় প্রকাশন সর্বদা একরূপই থাকে—মূলের প্রকাশনই থাকে, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ভিন্ন আধেয়বস্তু নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন দুটি প্রকাশনের সৃষ্টি হয়। প্রত্যেক অনুবাদক যে উভয়সংকটের সম্মুখীন হন তাকে সুন্দরভাবে ব্যক্ত করেছে এই প্রবাদটি—"বিশ্বস্ত কুশ্রীতা বা অবিশ্বস্ত সৌন্দর্য"। অশৈল্পিক অনুবাদকে—অক্ষর ধরে ধরে বা বাক্য ধরে ধরে অনুবাদকে—মূলের টীকাভাষ্য বলেই গণ্য করা উচিত॥

* * * বিভিন্ন পর্যায়ে (গ্রেড) প্রকাশনের যুক্তিহীন বিভাগ, সাহিত্যে—অলংকার-বাদ বা আলংকারিক বিভাগ-বাদ (ডক্ট্রিন্ অফ অর্নামেণ্ট বা রেটোরিকাল ক্যাটিগোরিজ) নামে পরিচিত। অন্যান্য ভিত্তিতে বিভাগের চেষ্টাও রয়েছে। চিত্রের এবং ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে—বহুউল্লিখিত 'বাস্তবিক' এবং 'সাংকেতিক' এই দুটি রূপের নাম করলেই যথেষ্ট হবে। বাস্তবিক ও সাংকেতিক, বস্তুবিষয়ী ও আত্মবিষয়ী, ক্লাসিকাল ও রোমান্টিক

নিরলংকার ও সালংকার, আভিধানিক ও লাক্ষণিক—লক্ষণার চৌদ্দ রকম বিভাগ, শব্দের ও বাক্যের বিচিত্র বিন্যাস, প্রয়োজনাতিরিক্ত পদ প্রয়োগ, লোপালংকার, বিপর্যাস, পুনরাবৃত্তি, প্রতিশব্দ, সমোচ্চারণ ভিন্নার্থক শব্দ প্রভৃতি এবং আরো অন্যান্য বিভাগ-কল্পনার সুনির্দিষ্ট লক্ষণ নির্দেশ করবার চেষ্টা করতে গেলেই তাদের দার্শনিক নিরর্থকতা ধরা পড়ে যায়। কারণ, তারা হয় শূন্যকে ধরতে চায়, না হয় মিথ্যার আবর্তে পড়ে ঘুরপাক খায়। এর খাঁটি একটি দৃষ্টান্ত হচ্ছে—রূপকের প্রচলিত লক্ষণটি—'ঠিক শব্দটির জায়গায় অন্য একটি শব্দের ব্যবহার'। প্রশ্ন—লোককে এ কষ্ট দেওয়া কেন? ঠিক শব্দের জায়গায় বেঠিক শব্দ বসানো কেন? যখন ভাল ও সোজা রাস্তা চিনি তখন খারাপ এবং দূরের রাস্তায় যাওয়া কেন? কারণ সম্ভবতঃ এই এবং সেই কথাই সাধারণতঃ বলা হয়ে থাকে, যে খাঁটি শব্দটি বেঠিক শব্দটির মতো তত ভাবব্যঞ্জক নয়। কিন্তু তাই যদি হয়, তবে সে ক্ষেত্রে রূপকই হচ্ছে ঠিক শব্দ এবং তথাকথিত ঠিক শব্দটি ব্যবহৃত হলে ভাবকে ব্যক্ত করবে না, অতএব বেঠিক শব্দই হবে। অন্যান্য বিভাগ সম্বন্ধেও সহজ বুদ্ধি থেকে ঐরূপ মন্তব্য করা যেতে পারে। যেমন ধরা যাক—অলংকারের সম্বন্ধে। প্রশ্ন হবে—প্রকাশনের সঙ্গে অলংকারকে যুক্ত করবে কি করে? বাইরে থেকে? সেক্ষেত্রে, প্রকাশন থেকে তা' সর্বদাই বিচ্ছিন্ন। ভিতর থেকে? সেক্ষেত্রে, অলংকার প্রকাশনকে সাহায্য করে না—নষ্ট করে, অথবা প্রকাশনেরই অংশ হয়ে যায়, অলংকার না হয়ে প্রকাশনেরই উপাদানে পরিণত হয়—প্রকাশনের ঐক্যের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য ও অনির্দেশ্য হয়ে উঠে।

আলংকারিক ভেদ-বিভেদ-কল্পনা কতখানি ক্ষতি করেছে তা' বলে বুঝানো অনাবশ্যক। অলংকারের বিরুদ্ধে অনেক সময়ে অনেক কথা বলা হয়েছে, কিন্তু তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করা হ'লেও তার সূত্রগুলি সযত্নে রক্ষা করা হয়েছে (খুব সম্ভব দার্শনিক সঙ্গতির প্রমাণ দেওয়ার জন্যই করা হয়েছে)। এই আলংকারিক শ্রেণীকল্পনার জন্যই সাহিত্যে 'সুন্দর রচনা' বা 'অলংকৃত রচনার' নাম নিয়ে এক প্রকার খারাপ লেখা চালু হয়েছে এবং সমর্থন বা প্রশ্রয় পেয়ে এসেছে।

উল্লিখিত পরিভাষাগুলি কখনই বিদ্যালয়ের বাইরে আসতে পারতো না—বিদ্যালয়েই আমরা সকলে ঐগুলি শিখেছিলাম (শিল্পের আলোচনায় কখনও ব্যবহার করবার সুযোগ পাইনি বা করলেও রসিকতার উদ্দেশ্য নিয়েই করেছি)—যদি-না কখনো কখনো, তাদের নিম্নলিখিত তাৎপর্যের যে কোন একটিতে ব্যবহার করা যেতো:—যেমন শৈল্পিক সংজ্ঞার বিকল্প হিসাবে ব্যবহার অশৈল্পিকের লক্ষণ হিসাবে ব্যবহার এবং শেষ পর্যন্ত (এইটিই সবচেয়ে প্রধান), শিল্পে বা শিল্পতত্ত্বে নয়, বিজ্ঞানে ও ন্যায়শাস্ত্রে ব্যবহার।

প্রথমতঃ, স্বরূপত বা প্রত্যক্ষতঃ প্রকাশনগুলি অবিভাজ্য, তবে কোনটি সফল, কোনটি অর্ধসফল, কোনটি নিষ্ফল। প্রকাশন সম্পূর্ণ বা অসম্পূর্ণ, সফল বা নিষ্ফল এই দু'রকমের কোন এক রকম হতে পারে। অতএব যে সব শব্দ লিখিত হয়, তারা কখনো সার্থক প্রকাশনকে, কখনো অসার্থক প্রকাশনকে নির্দেশ করে—কিন্তু তারা তা' করে অত্যন্ত অস্থির এবং খামখেয়ালী ভাবে—এমন ভাবে যে একই শব্দে কখনো সম্পূর্ণ প্রকাশনের প্রশংসা হয়, কখনো অসম্পূর্ণ প্রকাশনের নিন্দা হয়।

ধরা যাক, দু'টি ছবি; কোন প্রেরণার সৃষ্টি নয়, তাতে চিত্রশিল্পী নির্বিচারে প্রাকৃত বস্তুকে অনুকরণ করতে চেষ্টা করেছেন; দ্বিতীয়টি প্রেরণার সৃষ্টি, কিন্তু কোন বস্তুর হুবহু নকল নয়। প্রথমটিকে কেউ কেউ বলেন 'বাস্তবিক', দ্বিতীয়টিকে 'সাংকেতিক'। অন্যপক্ষে, অন্যেরা সেই ছবিকেই 'বাস্তবিক' বলে ঘোষণা করবেন, যাতে সাধারণ জীবনের দৃশ্য রূপায়িত হয়েছে এবং 'সাংকেতিক' শব্দটি প্রয়োগ করবেন তাতেই যাতে রূপকাকারে কোন কিছু উপস্থাপনা করা হয়েছে। এটা খুবই স্পষ্ট যে প্রথম ক্ষেত্রে 'সাংকেতিক' অর্থ দাঁড়িয়েছে কলাসম্পন্ন, এবং 'বাস্তবিক'-এর অর্থ দাঁড়িয়েছে অ-কলাসম্পন্ন; আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে 'বাস্তবিক'-এর অর্থ দাঁড়িয়েছে—কলাসম্মত এবং 'সাংকেতিকে'র অর্থ দাঁড়িয়েছে—অ-কলাসম্পন্ন। সুতরাং, কেউ কেউ যে জোরের সঙ্গে বলেন—সাংকেতিক শিল্পই খাঁটি শিল্প, আবার কেউ কেউ বলেন বাস্তব শিল্পই খাঁটি শিল্প—এতে আর আশ্চর্য কি? আমরা কিন্তু এই কথাই

বলব যে উভয়েই ঠিক কথা বলেছেন—কারণ, প্রত্যেকেই একই শব্দকে ভিন্ন অর্থে ব্যবহার করেছেন।

* * * ক্লাসিসিজিম এবং রোমান্টিসিজিম সম্বন্ধে যে প্রচণ্ড বাদবিসংবাদ ঘটেছে তারও ভিত্তি এই ধরনের দ্ব্যর্থক শব্দের ব্যবহার। কখনো কখনো ক্লাসিক বলতে বুঝিয়েছে যা' শিল্প হিসাবে নিখুঁত এবং রোমান্টিক বলতে বুঝিয়েছে যার ভারসাম্য নেই, যা' ত্রুটিযুক্ত। কেউ কেউ ক্লাসিক বলতে বুঝেছেন যা' নীরস ও কৃত্রিম এবং রোমান্টিক বলতে যা' অকৃত্রিম, সজীব,সরস, সতেজ, সুব্যক্ত। এমত অবস্থায় ক্লাসিকের পক্ষ নিয়ে রোমান্টিকের বিরুদ্ধে যাওয়া বা রোমান্টিকের পক্ষ নিয়ে ক্লাসিকের বিরুদ্ধে যাওয়া—যুক্তিসঙ্গত ভাবেই সম্ভব।

'স্টাইল' শব্দটি নিয়েও ঐ একই অবস্থা। কখনো কখনো বলা হয়—প্রত্যেক লেখকেরই 'স্টাইল' আছে। এখানে 'স্টাইল' শব্দটি প্রকাশনের রূপের প্রতিশব্দ। অন্য সময়ে বলা হয়—আইন-কানুনের বা গণিতের ভাষায় কোন স্টাইল নেই। এখানে আবার ভুল করা হয়—ভুল করা হয় প্রকাশের ভিন্ন ভিন্ন রূপ—নিরলংকার এবং সালংকার রূপ স্বীকার করে। কারণ স্টাইলই যদি 'রূপ' (ফর্ম) হয়, তবে এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে আইনের সূত্রে এবং গণিতের গ্রন্থেও স্টাইল আছে। অনেক সময় সমালোচকরা লেখককে—অতি-রীতিসচেতন (having too much style) বলে, 'রীতি'র লেখক (writing a style) বলে নিন্দা করে থাকেন। এখানে স্টাইল বলতে রূপ বা রূপের বিশেষ রীতিটি বুঝায় না, বুঝায় অনুচিত ও কৃত্রিম প্রকাশ—শিল্পহীনতারই রূপ।

দ্বিতীয়তঃ। এই শব্দগুলির গৌণ ব্যবহার—অবশ্য সম্পূর্ণ অর্থহীন ব্যবহার নয়—দেখা যায়, যখন সাহিত্যিক রচনার বিচারের সময় বলতে শুনি—এখানে অনাবশ্যক অবান্তর প্রয়োগ রয়েছে (প্লিয়োনেজম্), এখানে আবশ্যকের অপ্রয়োগ (এলিপ‍্স্) রয়েছে, এখানে একটি রূপক রয়েছে, এখানে একটি প্রতিশব্দ বা দ্ব্যর্থক শব্দ রয়েছে। এর অর্থ এই—এখানে অনাবশ্যক শব্দ ব্যবহারের একটি ত্রুটি রয়েছে (প্লিয়োনেজম্), এখানে যতগুলি শব্দ ব্যবহার

করা উচিত ছিল, তা' করা হয়নি বলে আবশ্যকের অপ্রয়োগ-(এলিপ্‌স্) দোষ ঘটেছে, এখানে অনুপযুক্ত শব্দ ব্যবহারের দোষ ঘটেছে (মেটাফর), এখানে দু'টি শব্দকে ভিন্ন অর্থ বুঝবার জন্য প্রয়োগ করা হলেও একই অর্থে প্রয়োগ করা হয়েছে (প্রতিশব্দ), এখানে একই অর্থ বুঝাতে শব্দটি প্রয়োগ করা হলেও, দু'টি ভিন্ন বস্তু নির্দেশ করেছে (দ্ব্যর্থকতা)। শব্দগুলির এই ধরনের নিন্দা-সূচক এবং নিদানের (প্যাথোলোজিকাল) মতো ব্যবহার আগের ব্যবহারের চেয়ে কম প্রচলিত।

তৃতীয়তঃ এবং শেষতঃও বটে—অলংকারের পরিভাষাগুলির যখন, পূর্ব-আলোচিত কোন শৈল্পিক তাৎপর্য থাকে না এবং লোকে মনে করে যে শব্দগুলি অর্থশূন্য নয় এবং লক্ষণীয় কিছু বুঝায়, তখন তার অর্থ এই যে শব্দগুলি বিজ্ঞানের এবং ন্যায়শাস্ত্রের কাজে ব্যবহৃত হয়েছে। লেখক সংজ্ঞাকে যখন বৈজ্ঞানিক অর্থে ব্যবহার করেন, তখন সুনির্দিষ্ট শব্দেই তা' ব্যক্ত করে থাকেন—এ কথা মেনে নিয়েও এ কথা সত্য যে ঐ একই ভাব বুঝতে লেখক অন্য যেসব শব্দ ব্যবহার করেন, সেই সব শব্দ সুনির্দিষ্টার্থক শব্দের তুলনায় রূপক, প্রতিশব্দ, 'সিনেকডকি' প্রভৃতি। আমরা নিজেরাও এই গ্রন্থ রচনার সময়, প্রযুক্ত শব্দের অর্থ স্পষ্ট করবার জন্য অনেকবার ঐরূপ ভাষা ব্যবহার করেছি এবং করতে ইচ্ছাও করি। কিন্তু এই ব্যবহারের, দর্শনের ও বিজ্ঞানের সমালোচনা-বিষয়ক আলোচনায়, মূল্য থাকলেও, সাহিত্য-শিল্পের আলোচনায়, কোন মূল্যই নেই। বিজ্ঞানের উপযোগী শব্দ ও উপমা রূপক আছে : একই সংজ্ঞাকে বিভিন্ন অবস্থায়, মনস্তত্ত্বানুসারে গঠন করা যেতে পারে, সুতরাং তার অভিব্যক্তির রূপও ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। যখন কোন লেখকের বৈজ্ঞানিক পরিভাষাগুলি সুনির্দিষ্টার্থক হয়ে যায় এবং কোন একটি প্রয়োগ-রীতি সত্য বা যথার্থ বলে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়, তখন অন্যান্য প্রয়োগ অসমুচিত বা তাৎস্থানিক (ট্রপিকাল) হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু শৈল্পিক ব্যাপারে—সমুচিত শব্দ ছাড়া অন্য কিছুরই স্থান নেই। কোন এক প্রতিভানকে শুধু একইভাবে ব্যক্ত করা যায়, কারণ তা' প্রতিভান—সংজ্ঞা নয়।

**** অলংকার বিভাগগুলির শৈল্পিক তাৎপর্য নেই এ কথা কেউ কেউ

স্বীকার করলেও, তাদের উপযোগিতা, বিশেষতঃ সাহিত্য ক্ষেত্রে তারা যে উপকারে লাগতে পারে তা' একেবারে অস্বীকার করতে চান না। আমরা স্বীকার করছি—কি করে ভুল-ভ্রান্তি মনকে যুক্তির দীক্ষা দিতে পারে, অথবা যে বিজ্ঞান-শিক্ষাকে সে ব্যাহত ও আচ্ছন্ন করে তাকে সাহায্য করতে পারে তা' আমরা বুঝে উঠতে পারিনে। খুব সম্ভব, তাঁরা বলতে চান যে ঐ পার্থক্য-গুলি, ভূয়োদর্শনলব্ধ শ্রেণী হিসাবে স্মৃতিকে ও শিক্ষাকে সাহায্য করতে পারে। তা'তে কোন আপত্তিই নেই। অবশ্য অন্য একটি উদ্দেশ্যে বিদ্যালয়গুলিতে অলংকারের স্থান রাখা উচিত—সমালোচনা করার উদ্দেশ্যে। অতীতের ভুল-ভ্রান্তিগুলি ভুলে গেলে চলবে না, এবং তাদের সম্বন্ধে চুপ করে থাকলে চলবে না। মিথ্যার সঙ্গে লড়াই করিয়েই সত্যকে জীবিত রাখতে হবে। অলংকার-গুলির বিবরণ না দিলে এবং সঙ্গে সঙ্গে সমালোচনা না করলে সেগুলির আবার লাফিয়ে-উঠার আশংকা থেকে যাবে বলা যেতে পারে—ইতিমধ্যেই আবার সেগুলি কয়েকজন ভাষাতত্ত্ববিদের মধ্যে, অতি-সাম্প্রতিক মনস্তাত্ত্বিক আবিষ্কার রূপে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে।

* * * * মনে হতে পারে, বিভিন্ন প্রকাশনের এবং শিল্পকর্মের মধ্যে কোনরূপ সাদৃশ্য থাকতে পারে—এ বথা আমরা অস্বীকার করেছি। সাদৃশ্য থাকে এবং ঐ সাদৃশ্যের ভিত্তিতে শিল্পকর্মকে এ-শ্রেণীতে ও-শ্রেণীতে ভাগ করাও যেতে পারে। কিন্তু বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে যেরূপ সাদৃশ্য থাকে ঐ সাদৃশ্য তার বেশী কিছু নয় এবং তাকে কখনই নৈর্ব্যক্তিকভাবে নিরূপণ করা সম্ভব নয়। অর্থাৎ এই সাদৃশ্যে—যা' পরিবার-সাদৃশ্য ছাড়া আর কিছুই নয় এবং যা' বিভিন্ন শিল্পকর্ম যে ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে জন্ম গ্রহণ করেছে সেই পরিস্থিতির ঐক্য থেকে এবং শিল্পীদের আত্মার ঐক্য থেকে, উৎপন্ন হয়েছে,—তাতে—একীকরণ, অধীনীকরণ, সমন্বয়ন, এবং সংজ্ঞার অন্যান্য সম্বন্ধ প্রয়োগ করতে গেলে ভুলই হবে।

* * * * এই সকল সাদৃশ্যের মধ্যেই অনুবাদের আপেক্ষিক সম্ভাবনা নিহিত রয়েছে। এই অনুবাদ একই মূল প্রকাশনের পুনরুপস্থাপন নয় (তা করা সম্ভব নয়), এ হচ্ছে মূলের কম-বেশী সদৃশ অনুরূপ প্রকাশন সৃষ্টি করা। যা ভাল অনুবাদ তা মূলের সদৃশ বটে কিন্তু শিল্পকর্ম হিসাবে তার মৌলিক মূল্য আছে—সে আত্মনির্ভর।

দশম অধ্যায়

শৈল্পিক আবেগ এবং সুন্দর ও কুৎসিতের পার্থক্য

এই অধ্যায়ে ক্রোচে নিম্নলিখিত বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন :—

(ক) আবেগ (ফিলিঙ্) শব্দটির নানা অর্থ

(খ) ক্রিয়া হিসাবে আবেগ

(গ) আর্থনৈতিক ক্রিয়ার সঙ্গে আবেগের ঐক্য

(ঘ) সুখবাদের (হেডোনিজিম) সমালোচনা

(ঙ) ক্রিয়ার স্বাভাবিক পরিণাম হিসাবে আবেগ

(চ) আবেগের সাধারণ শ্রেণীবিভাগ

(ছ) মূল্য ও অমূল্য

(জ) প্রকাশন-মূল্য হিসাবে 'সুন্দর'

(ঝ) কুৎসিত

(ঞ) কুৎসিত নয়, সুন্দর নয়—এমন প্রকাশনের অস্তিত্ব সম্বন্ধে ভ্রান্তি।

(ট) প্রকৃত শৈল্পিক আবেগ ও আনুষঙ্গিক আবেগ

(ঠ) 'কৃত্রিম আবেগ'-এর সমালোচনা

* * * আরো জটিল সংজ্ঞার আলোচনায়—যেখানে অন্যান্য ব্যাপারের সহযোগে শৈল্পিক ব্যাপারকে বিচার করতে হবে সেখানে প্রবেশ করতে যেয়ে এবং তাদের পারস্পরিক যোগের ও জটিলতার রূপটি দেখাতে যেয়ে, প্রথমেই আমাদের 'আবেগ'-সম্বন্ধীয় ধারণার, বিশেষতঃ শৈল্পিক আবেগ" কথাটির মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়।

আবেগ (ফিলিঙ্) শব্দটি দার্শনিক পরিভাষার ক্ষেত্রে প্রচুর অর্থের অধিকারী। আগেই একবার শব্দটির সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎকার ঘটার অবকাশ হয়েছে এবং হয়েছে, আত্মার নিষ্ক্রিয় অবস্থা বুঝাতে, শিল্পের বিষয়বস্তু বা আধেয় তথা প্রত্যয়ের প্রতিশব্দ বুঝাতে যাদের ব্যবহার করা হয়েছে

তাদের মধ্যে। আবার (তখন সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থ ছিল) আমাদের শব্দটির সঙ্গে দেখা হয়েছে—হয়েছে শব্দটি যখন শৈল্পিক ক্রিয়ার অনৈয়ায়িক ও অনৈতিহাসিক প্রকৃতি বুঝাতে, অর্থাৎ বিশুদ্ধ প্রতিভান বুঝাতে অর্থাৎ যা কোন সংজ্ঞা নির্ধারণ করে না বা ঘটনার বিবরণ দেয় না তেমন কোন সত্য বুঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে।

* * * এখানে কিন্তু শব্দটি উল্লিখিত দুই অর্থের কোন অর্থেই অথবা আত্মার অন্যবিধ জ্ঞানাত্মিকা ক্রিয়ার রূপ হিসাবে গৃহীত হয়নি, গৃহীত হয়েছে সেই অর্থেই যে অর্থে 'আবেগ' বলতে বুঝায়—বিশেষ ধরনের—অজ্ঞানাত্মিক। ক্রিয়া, যার দুই মেরু—ধনাত্মক ও ঋণাত্মক। এক মেরুতে আনন্দ, অন্যটিতে দুঃখ বা বেদনা।

এই ক্রিয়াটি নিয়ে দার্শনিকরা খুবই বিব্রত বোধ করেছেন, ফলে তাঁরা ক্রিয়াটিকে ক্রিয়া বলেই স্বীকার করতে চাননি, অথবা চৈতন্যধর্ম থেকে সরিয়ে নিয়ে প্রকৃতির ব্যাপারে পরিণত করেছেন। কিন্তু এই দুই সমাধানের মধ্যে এমন ধরনের আপত্তি আছে যা' শেষ পর্যন্ত যে কোন পরীক্ষাকামী লোকের কাছে এদের গ্রহণের অযোগ্য করে তোলে। কারণ অনাত্মিক ক্রিয়া বা প্রাকৃতিক ক্রিয়া বলে এমন কোন্ ক্রিয়া থাকতে পারে যখন আত্মিক ক্রিয়ার রূপে ছাড়া অন্য কোন রূপেই ক্রিয়ার অস্তিত্বের সম্ভাবনা নেই? প্রকৃত-প্রস্তাবে, প্রকৃতি সংজ্ঞানুসারে নিছক নিষ্ক্রিয়, জড়, যান্ত্রিক বস্তুমাত্র। অন্যপক্ষে, আবেগের ক্রিয়াধর্মিতার অস্বীকার, আনন্দ-মেরু এবং বেদনা-মেরু দ্বারা খণ্ডিত হয়। বেদনা ও আনন্দ আবেগের আনুষঙ্গিক এবং ক্রিয়াকে তা' বিশেষ রূপে ব্যক্ত করে থাকে।

* * এই সিদ্ধান্ত আমাদের খুবই মুসকিলে ফেলবে; কারণ আমরা আত্মার বৃত্তিগুলির যে ছক এঁকেছি তাতে এই অবশ্যস্বীকার্য নতুন বৃত্তিটিকে স্থান দেওয়ার কোন অবকাশ নেই। কিন্তু আবেগ-ক্রিয়া যদি ক্রিয়াই হয়ে থাকে, তবে নতুন কোন কিছু নয়। আত্মিক ক্রিয়ার যে ছক আমরা এঁকেছি তাতে নিশ্চয়ই তার স্থান আছে, অবশ্য ভিন্ন নামে—'আর্থনৈতিক' ক্রিয়া নামে আছে।

যে ক্রিয়াটিকে আমরা প্রাথমিক ও মৌলিক কর্মাত্মিকা ক্রিয়া বলেছি এবং যাকে নৈতিক ক্রিয়া থেকে পৃথক করেছি এবং বিশেষ বিষয়াভিমুখী নীতিবোধ-শূন্য কামনাস্বরূপ বলে মনে করেছি, আবেগ-ক্রিয়া সেই ক্রিয়াটি ছাড়া আর কিছুই নয়।

আবেগকে যদি কখনো দৈহিক বা প্রাকৃতিক ক্রিয়া বলা হয়ে থাকে, তা' হয়েছে এই কারণেই যে তা' নৈয়ায়িক বা শৈল্পিক বা নৈতিক ক্রিয়ার সমধর্মী নয়। ঐ তিনটির দিক থেকে দেখতে যেয়ে (এই তিনটিই স্বীকৃত) এটিকে প্রকৃত আত্মার—অভিজাত আত্মার—বাইরের বস্তু বলে, প্রাকৃতবিষয় বলে বা আত্মার প্রাকৃত অংশের ব্যাপার বলে মনে করা হয়েছে। এর থেকেই আর একটি সিদ্ধান্তের সত্যতা পাওয়া যায় এবং সে সিদ্ধান্তটি এই যে শৈল্পিক ক্রিয়া, নৈতিক এবং বৌদ্ধিক ক্রিয়ার মতোই আবেগ-ব্যাপার নয়। আবেগকে যখন আগেই অজ্ঞাতসারে এবং নির্বিচারে 'আর্থনৈতিক ইচ্ছা' রূপে মেনে নেওয়া হয়েছে, তখন এই সিদ্ধান্ত অবশ্যম্ভাবী। এই সিদ্ধান্তে যে মতবাদকে খণ্ডিত করা হয়েছে তার নাম—*সুখবাদ (হেডোনিজিম)। এই মতবাদে, আত্মার, বিভিন্ন বৃত্তিকে একটি বৃত্তিতে পরিণত করা হয়, তথা ঐ বৃত্তির নিজের বৈশিষ্ট্য-টিকেও বিলুপ্ত করে দিয়ে অস্পষ্ট ও রহস্যময় করে তোলা হয়—এ যেন 'সেই রাত্রি যার সকল গোরুই কালো'। সকল বৃত্তিকে একটি বৃত্তিতে পরিণত তথা বিকৃত করে সুখবাদীরা, সব ব্যাপারেই আনন্দ ও বেদনা ছাড়া আর কিছুই দেখতে পায় না; শিল্পের আনন্দ ও সহজ হজমের আনন্দের মধ্যে, একটি সৎকাজের আনন্দ ও বুক-ভরে-হাওয়া-খাওয়ার আনন্দের মধ্যে—তারা কোন মৌলিক পার্থক্য খুঁজে পায় না।

* * * * কিন্তু যে অর্থে আবেগ-ক্রিয়া এখানে ব্যবহৃত হয়েছে সেই অর্থ গ্রহণ করে যদি তাকে সমস্ত রকম আত্মিক ক্রিয়ার স্থলাভিষিক্ত নাই করা হয়, তাই বলে একথা আমরা বলিনি যে আবেগ ঐ সমস্ত ক্রিয়ার সঙ্গে থাকতে পারবে না। বাস্তবিকই, অনিবার্যকারণেই তা' থাকে, কারণ তারা যেমন নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক বন্ধনে যুক্ত, তেমনি প্রাথমিক বাসনার রূপের সঙ্গেও নিকট বন্ধনে আবদ্ধ। অতএব তাদের প্রত্যেকেরই সহগামী রূপে

বিশেষ বিশেষ বাসনা এবং বাসনাগত আনন্দ ও বেদনা, এককথায় আবেগ আছে। কিন্তু আমরা আনুষঙ্গিককে প্রধান বলে স্বীকার করব না এবং একের বদলে আর একটিকে গ্রহণ করব না। কোন একটি সত্যের আবিষ্কার, একটি নৈতিক কর্তব্য সম্পাদন আমাদেব মধ্যে আনন্দের উদ্রেক করে এবং আমাদের সমস্ত সত্তাকে স্পন্দিত করে তোলে। ঐ সত্তা একদিকে যেমন-আত্মিক ক্রিয়ার বিশেষ রূপটির লক্ষ্যে পৌঁছানোর চেষ্টা করে, সঙ্গে সঙ্গে তেমনি আর্থনৈতিক লক্ষ্যে পৌঁছানোর চেষ্টাও করে। সে যাই হোক আর্থ-নৈতিক বা সুখকামনার আনন্দ, নৈতিক আনন্দ, শৈল্পিক আনন্দ, বৌদ্ধিক আনন্দ, এরা পরস্পর যুক্ত হলেও সর্বদাই স্বতন্ত্র॥

একই সঙ্গে আর একটি প্রশ্নেরও উত্তর দেওয়া হয়ে গেল। প্রশ্নটিকে শিল্পশাস্ত্রেব জীবন-মরণ প্রশ্ন বলে গণ্য করা হয়। প্রশ্নটি এই—আবেগ ও আনন্দ শৈল্পিক ব্যাপারের অগ্রবর্তী বা পরবর্তী কারণ? না কার্য? এই প্রশ্নেরই মধ্যে আমরা আত্মিক ক্রিয়াব বিভিন্ন রূপগুলি অন্তর্ভুক্ত করে নিচ্ছি এবং উত্তরে এই কথাই বলছি যে আত্মার ঐক্যের মধ্যে কার্য-কারণের এবং পৌর্বাপযের প্রশ্ন তোলা চলে না।

যে সম্বন্ধের কথা উপরে বলা হয়েছে, তাকে যদি একবার আমরা প্রতিষ্ঠিত বলে ধরে নি, তা' হ'লে শৈল্পিক, নৈতিক, বৌদ্ধিক আবেগ এমন কি যাকে বলা হয়েছে আর্থনৈতিক আবেগ—এই সমস্ত আবেগের প্রকৃতি নিয়ে প্রশ্ন তোলার আর কোন প্রয়োজনই থাকে না। শেষেবটির ক্ষেত্রে, এ কথা খুবই স্পষ্ট যে প্রশ্নটি দু'টি শব্দের (terms) প্রশ্ন নয়, একটিরই প্রশ্ন, আর্থনৈতিক ক্রিয়া-বিষয়ক জিজ্ঞাসা এবং আর্থনৈতিক আবেগেব প্রকৃতি বিষয়ে জিজ্ঞাসা—একই জিজ্ঞাসা। কিন্তু অন্যান্য ক্ষেত্রেও আমরা, বিশেষ্যের দিকে নয় বিশেষণের দিকেই বেশী নজর দেব। শৈল্পিক, নৈতিক এবং নৈয়ায়িক প্রকৃতিই আবেগের শৈল্পিক, নৈতিক ও নৈয়ায়িক অনুরঞ্জন নির্ধারিত কববে, আর যখন আবেগ শুধুই আবেগ তখন তার ঐরূপ কোন অনুরঞ্জন থাকবে না।

এর আর একটি পরিণাম এই যে, আর আমাদের বিভিন্ন মূল্যের এবং আবেগের মূল্যের মধ্যে— মূল্যহীন এবং নিছক সুখের আবেগের, প্রয়োজনমিশ্র

ও অপ্রয়োজনমিশ্র আবেগের, বস্তুকেন্দ্রিক আবেগ ও আত্মকেন্দ্রিক' নিছক আনন্দের আবেগের মধ্যে (জার্মান ভাষায় "গেফাল্লেন্" ও "ভেরগুনেন্"-এর মধ্যে) সুপ্রচলিত পার্থক্যকে বজায় রাখতে হবে না। ঐ পার্থক্য আত্মার ত্রিমূর্তি সত্য-শিব-সুন্দরকে অজ্ঞাত অতএব অনির্দিষ্ট চতুর্থ মূর্তি থেকে রক্ষা করবার জন্য ব্যবহার করা হয়েছিল। আমাদের কাছে, ঐ ত্রিমূর্তি সুরক্ষিত, কারণ আমরা আরো প্রত্যক্ষভাবে ঐ বিভাগে পৌছতে পেরেছি এবং স্বার্থপর, আত্মকেন্দ্রিক এবং নিছক আনন্দের আবেগকেও, আত্মার সামান্য রূপগুলির মধ্যে স্থান করে দিতে সমর্থ হয়েছি। ফলে আগে যেখানে আমরা, আত্মা ও প্রকৃতির মধ্যে যেরূপ দ্বন্দ্ব রয়েছে, মূল্য ও আবেগের মধ্যে সেরূপ দ্বন্দ্ব কল্পনা করেছি (আমরা এবং অপরে), এখন সেখানে মূল্যের সঙ্গে মূল্যের পার্থক্য ছাড়া আর কিছুই দেখিনে।

* * * * আগেই এ কথা বলা হয়েছে যে, আবেগ বা আর্থনৈতিক ক্রিয়া দুই মেরুতে বিভক্ত, একটি ধনাত্মক, অন্যটি ঋণাত্মক, একটি আনন্দ, অন্যটি বেদনা। এখন তাকে প্রয়োজনীয় ও অপ্রয়োজনীয় এই দুই ভাগে ভাগ করা যাক। এই দ্বিধাবিভাগকে আগেই আবেগের ক্রিয়াশীল প্রকৃতির লক্ষণ-রূপে গণ্য করা হয়েছে এবং দেখা গেছে, সমস্ত রকম ক্রিয়ার সঙ্গেই আবেগের যোগ আছে। এদের প্রত্যেককেই যদি 'মূল্য' বলে স্বীকার করা হয় তবে এদের প্রত্যেকেরই বিপরীত 'অমূল্য' বা মূল্যবিরোধী বলে কিছু আছে। মূল্যের অভাব ঘটলেই অমূল্যের সৃষ্টি হয় না, ক্রিয়াশীলতা এবং নিষ্ক্রিয়তা নিজেদের মধ্যে অবিরাম দ্বন্দ্ব করতে থাকবে এবং কেউ কাউকে হারিয়ে দিতে পারবে না। তাইতো দ্বন্দ্ব এবং যে ক্রিয়া ব্যাহত, বাধাগ্রস্ত, তার মূল্যহীনতা। মূল্য হচ্ছে ক্রিয়া যা' স্বচ্ছন্দে আত্মপ্রকাশ করতে পারে ; মূল্যহীনতা এর বিপরীত।

শব্দ দু'টির এই লক্ষণ নিয়েই আমরা সন্তুষ্ট থাকব এবং মূল্য ও মূল্যহীনতার সম্পর্কের সমস্যায় অর্থাৎ বিরুদ্ধস্বভাবের সমস্যায় (অর্থাৎ তাদের দ্বৈত সত্তা বলে অরমুজ্‌দ ও অহ্‌রিমন্, দেবদূত ও শয়তান একে অন্যের শত্রু, ঐরূপ দু'টি স্বতন্ত্র ব্যক্তিসত্তা বলে গণ্য করা হবে অথবা বিরুদ্ধ সমন্বয়ে এক বলে গণ্য

করা হবে) প্রবেশ করব না। এই লক্ষণেই আমাদের উদ্দেশ্য—শৈল্পিক প্রকৃতিকে এবং শিল্পতত্ত্বের সবচেয়ে অস্পষ্ট এবং বিসংবাদিত সংজ্ঞাকে—'সুন্দরের' সংজ্ঞাটিকে—পরিচ্ছন্ন করে তোলার কাজ সিদ্ধ হবে।

* * * শৈল্পিক, বৌদ্ধিক, আর্থনৈতিক এবং নৈতিক সৎমূল্য এবং অসৎমূল্যকে প্রচলিত ভাষায় নানা নামে অভিহিত করা হয় : সুন্দর, সত্য, মঙ্গল, প্রয়োজনীয়, ন্যায়সঙ্গত, যথার্থ প্রভৃতি বলা হয়, আত্মিক ক্রিয়ার মুক্ত প্রকাশকে, আচরণকে,বৈজ্ঞানিক গবেষণাকে,শিল্পকর্মের সাফল্যকে বুঝাতে এবং কুৎসিত, মিথ্যা, দুষ্ট, অপ্রয়োজনীয়, অন্যায়সঙ্গত প্রভৃতি, ব্যাহত ক্রিয়া—অসার্থক ক্রিয়া—বুঝাতে—ভাষা ব্যবহারে, এই নামগুলি অবিরাম এক ক্ষেত্র থেকে অন্য ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হচ্ছে। দৃষ্টান্ত, 'সুন্দর' বিশেষণটি শুধু সার্থক প্রকাশনের ক্ষেত্রেই প্রযুক্ত হয় না, বৈজ্ঞানিক সত্যের, সুসিদ্ধ কর্মের এবং নৈতিক আচরণের ক্ষেত্রেও প্রযুক্ত হয়। তাইতো আমরা বলি—'বৌদ্ধিক সৌন্দর্য', 'সুন্দর কর্ম', 'নৈতিক সৌন্দর্য'। এই বিচিত্র বাক্-ব্যবহারের সঙ্গে তাল রেখে চলতে গেলে, পথহীন বাক্ জটিলতার মধ্যে আটকে পড়তেই হবে এবং বহু দার্শনিক ও শিল্প-শিক্ষার্থী এই অরণ্যে পথ হারিয়ে বসেছেন। এই কারণে, সার্থক প্রকাশনকে বিশেষিত করতে 'সুন্দর' শব্দটির প্রয়োগ আমরা ইচ্ছা করেই এড়িয়ে গেছি। কিন্তু এত ব্যাখ্যা দেওয়ার পরে এবং ভুল বুঝার সম্ভাবনা তিরোহিত হওয়ার পরে এবং প্রচলিত কথাবার্তায় ও দর্শনে শৈল্পিক মূল্য-অর্থে 'সুন্দর' কথাটি ব্যবহার করার ঝোঁক দেখা দিয়েছে দেখে, 'সার্থক প্রকাশন' বলে বা শুধু 'প্রকাশন' বলে—কারণ যা' সার্থক নয় তা' প্রকাশনও নয়—সুন্দরের সংজ্ঞা দেওয়া উচিত ও সম্ভব বলে মনে করি।

* * * অতএব, কুৎসিত হচ্ছে অসার্থক প্রকাশন। দৃশ্যতঃ অসঙ্গত হলেও, অসার্থক শিল্পকর্মের পক্ষে এ কথা সত্য—সুন্দর দেখা দেয় 'ঐক্য' রূপে আর কুৎসিত দেখা যায় 'বৈচিত্র্য' রূপে। তাইতো যে সব শিল্পকর্ম বেশী-কম অসার্থক তাদের যে অংশ সুন্দর তাদের প্রশংসা শোনা যায়, কিন্তু সার্থক শিল্পের পক্ষে তা' সম্ভব নয়। সার্থক শিল্পকর্ম একটি সুসম্পূর্ণ সমবায় বলে এবং

তার একটিমাত্র মূল্যই আছে বলে, তার কোন্ অংশ সুন্দর আর কোন্ অংশ কুৎসিত তার গুণগুলি নির্দেশ করা সম্ভব নয়। প্রাণ সর্বদেহে পরিব্যাপ্ত থাকে, বিশেষ বিশেষ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে থাকে না।

অসার্থক শিল্পকর্মের বিভিন্ন মাত্রায়, এমন কি অধিক মাত্রায়, গুণ থাকতে পারে। সুন্দরের কোন মাত্রা নেই; কারণ, অধিকতর সুন্দরের অর্থাৎ অধিকতর-প্রকাশিত প্রকাশনের, অধিকতর পর্যাপ্তের কোন অস্তিত্ব নেই। অন্যপক্ষে অসুন্দরের মাত্রা-তারতম্য আছে—অসুন্দর (প্রায়-সুন্দর) থেকে অতি-অসুন্দর পর্যন্ত এই মাত্রার ব্যাপ্তি। কিন্তু অসুন্দর যদি সুসম্পূর্ণ হতো অর্থাৎ সুন্দরের লেশটুকুও যদি তার মধ্যে না থাকতো তা'হ'লে ঐ কারণেই অসুন্দর আর অসুন্দর থাকতো না, কারণ যে দ্বন্দ্বকে আশ্রয় করে অসুন্দরের স্থিতি, সেই দ্বন্দ্বই তার মধ্যে থাকতো না। অসৎমূল্য অ-মূল্য হতো, ক্রিয়া জড়তায় পর্যবসিত হতো—জড়তার সঙ্গে ক্রিয়ার কোন দ্বন্দ্বই থাকতো না।

* * * যে দ্বন্দ্ব ও বিরোধের ভিতর দিয়ে শৈল্পিক ক্রিয়া বিকশিত হয় সেই দ্বন্দ্বেরই ভিত্তির উপরে যেহেতু সুন্দর ও অসুন্দরের পার্থক্য-চেতনা দাঁড়িয়ে আছে, এ খুবই স্পষ্ট যে যতো আমরা জটিলতর প্রকাশন থেকে সরলতর ও সরলতম প্রকাশনে নেমে যাই, ততো আমাদের ঐ চেতনা ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হতে হতে শেষ পর্যন্ত বিলোপ পেয়ে যায়। এই কারণেই ঐ ভ্রান্তি দেখা দিয়েছে যে এমন প্রকাশন সম্ভব যা' সুন্দর বা অসুন্দর কোনটিই নয়, যা' অনায়াসলব্ধ, সহজ ও স্বাভাবিক।

* * * সুন্দর-অসুন্দরের সমস্ত রহস্য তা'হ'লে অতি সহজ সরল সংজ্ঞার মধ্যে ধরা গেল। কেউ যদি আপত্তি করে বলেন যে এমন সার্থক শৈল্পিক প্রকাশন আছে যা' দেখে কোন আনন্দই হয় না। আবার এমন প্রকাশনও, সম্ভবত; অসার্থক প্রকাশনও থাকতে পারে যা' তাকে আনন্দ দিতে পারে তা'হ'লে আমরা তাকে শৈল্পিক ব্যাপারটির উপরে—খাঁটি শৈল্পিক আনন্দের উপরে—মনোযোগ নিবদ্ধ করতে পরামর্শ দেব। শৈল্পিক আনন্দের সঙ্গে

কখনো কখনো বাহ্যিকব্যাপারজনিত আনন্দ মিশে তাকে জোরালো ও জটিল করে তোলে। ঐ ব্যাপারের সঙ্গে শিল্পের যে যোগ তা' বহিরঙ্গ যোগ। কবি বা শিল্পী, শৈল্পিক আনন্দ সম্ভোগ করেন তখনই যখন তিনি সর্বপ্রথম তাঁর শিল্পকর্মের রূপটিকে প্রত্যক্ষ (প্রতিভান) করেন, অর্থাৎ যখন তাঁর প্রত্যয়গুলি রূপ নিয়ে সামনে দাঁড়ায় এবং তখন তাঁর মুখমণ্ডল স্রষ্টার দৈব আনন্দে উদ্‌ভাসিত হয়ে উঠে। অন্যপক্ষে, তিনি পান মিশ্র আনন্দ যিনি দিনের কাজের শেষে, কমেডি-নাটক দেখবার জন্য থিয়েটারে যান এবং নাট্যকারের ও অভিনেতার কলাকৌশলের মধ্যে প্রকৃত শৈল্পিক আনন্দ উপভোগ করার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্রামের ও আমোদ-প্রমোদের আনন্দ, শবাধার থেকে পেরেক খুলে নেওয়ার কৌতুকও উপভোগ করেন। একই কথা বলা যায় সেই শিল্পীর সম্বন্ধে—যিনি শিল্পসৃষ্টির শ্রম শেষ করে আনন্দিত হন, এবং যাঁর আনন্দের মধ্যে, শৈল্পিক আনন্দ ছাড়াও, আত্মপ্রতিষ্ঠার কামনা চরিতার্থ হওয়ার বা আত্মপরিতৃপ্তির আনন্দ এবং আর্থিকলাভের আনন্দ মিশে থাকে। এর বহু দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে।

* * * আধুনিক শিল্পতত্ত্বে, 'কৃত্রিম' বা অলৌকিক (এপারেন্ট) শৈল্পিক আবেগ বলে একটি বস্তু স্বীকার করা হয়েছে। এ আবেগ শিল্পকর্মের রূপ দেখার ফলে যে আবেগ জন্মে সে আবেগ নয়, এ আবেগ শিল্পের আধেয় বস্তু থেকে জন্মে। বলা হয়েছে—শৈল্পিক উপস্থাপনা বিচিত্র রকমের আনন্দ ও বেদনা জাগিয়ে থাকে। নাটকের বা উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীর সঙ্গে সহানুভূতিতে,চিত্রের কোন মূর্তি দেখে এবং সংগীতের সুর শুনে উদ্বেগে আমরা কম্পিত হই, আমরা আনন্দ করি, ভয় করি, হাসি, কাঁদি, কামনা করি। কিন্তু এই আবেগগুলি, লৌকিক ঘটনা যেভাবে আবেগ সৃষ্টি করে, সে ভাবের আবেগ নয় ; বরং তারা গুণে এক হ'লেও পরিমাণে, লৌকিকের চেয়ে ক্ষীণ শৈল্পিক এবং অলৌকিক আনন্দ ও বেদনা, লঘু, অগভীর এবং ক্ষণস্থায়ী।

এই অলৌকিক আবেগ নিয়ে আলোচনা করবার কোন প্রয়োজন নেই—কারণ এ সম্বন্ধে আমরা আগেই অনেক আলোচনা করেছি। বাস্তবিক এ পর্যন্ত আমরা এ ছাড়া আর কিছুরই আলোচনা করিনি। এই অলৌকিক বা

ব্যক্ত আবেগগুলি, রূপায়িত, প্রতিভাত, প্রকাশিত আবেগ ছাড়া আর কি? সুতরাং এ খুবই স্বাভাবিক যে লৌকিক আবেগের মতো এই আবেগগুলি আমাদের তত কষ্ট বা পীড়া দেয় না; কারণ লৌকিক আবেগগুলি বস্তু (ম্যাটার), এগুলি রূপ, ক্রিয়া; প্রথমগুলি সত্য ও যথার্থ আবেগ, এগুলি প্রতিভান ও প্রকাশন। অতএব অলৌকিক আবেগের কথাটি আমাদের কাছে কথিতেরই পুনঃকথন মাত্র,—কথাটিকে আমরা বিনা দ্বিধায় কেটে দিতে পারি।

একাদশ অধ্যায়

শৈল্পিক-সুখবাদের সমালোচনা

যেমন আমরা সাধারণভাবে সুখবাদের অর্থাৎ যে মতবাদ আর্থ নৈতিক ক্রিয়ানিহিত এবং অন্যান্য-ক্রিয়ার-আনুষঙ্গিক আনন্দ ও বেদনার উপরে প্রতিষ্ঠিত, যা আধার ও আধেয়কে এক করে ফেলায়, আনন্দ-বেদনা ছাড়া আর কোন কিছুই খুঁজে পায় না, সেই মতবাদের বিরোধী, তেমনি আমরা বিশেষভাবে শৈল্পিক-সুখবাদের বিরোধী যা', অন্যান্য ব্যাপারকে বাদ দিলেও, শৈল্পিক ব্যাপারটিকে—নিছক আবেগের ব্যাপার বলে মনে করে, যা' আনন্দ-দায়ক প্রকাশনকে তথা সুন্দরকে নিছক আনন্দদায়কের সঙ্গে এক করে ফেলে।

**শৈল্পিক-সুখবাদকে নানা রূপে উপস্থাপিত করা হয়েছে। অন্যতম প্রাচীন রূপ হচ্ছে এই মতবাদটি যে, সুন্দর হচ্ছে তাই যা' চোখ ও কানের আনন্দ বিধান করে অর্থাৎ তথাকথিত উন্নত ইন্দ্রিয়গুলিকে তৃপ্ত করে। শিল্পের বিশ্লেষণ যখন প্রথম আরম্ভ হয়েছিল, তখন, 'ছবি ও গান চোখের ও কানের প্রত্যয়'—এই মিথ্যা ধারণা বর্জন করা এবং 'অন্ধেরা ছবি বা বধিররা গান উপভোগ করতে পারে না'—এই মন্তব্যগুলির সঠিক ব্যাখ্যা করা কঠিন কাজ ছিল। আগে যেমন আমরা দেখিয়েছি, তেমনি এখানেও এই কথা প্রমাণ করা যে শৈল্পিক ব্যাপার প্রত্যয়ের প্রকৃতির উপবে নির্ভর করে না, সবরকম ইন্দ্রিয়ের প্রত্যয়কেই শৈল্পিক প্রকাশনের স্তরে নিয়ে যাওয়া যায় এবং কোন প্রত্যয়কেই প্রকাশ করার বিশেষ বাধ্যবাধকতা নেই—তখনই আবশ্যক হবে যখন এই সমস্যারই অন্যান্য প্রস্তাবগুলি পরীক্ষিত হয়েছে। যিনি বলেন—শৈল্পিক বস্তু হচ্ছে তাই যা' চোখের ও কানের কাছে আরামদায়ক, তিনি সেই লোকের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে কিছুতেই আত্মরক্ষা করতে পারেন না, যিনি সুন্দরকে সাধারণ আনন্দদায়কের সঙ্গে এক করতে বদ্ধপরিকর এবং শিল্পতত্ত্বের মধ্যে

রঞ্জনকে বা (প্রত্যক্ষবাদীরা যেমন বলেছেন) অন্ত্রের-কাছে-যা-সুন্দর (viscerally beautiful) তাকে স্থান করে দিতে ইচ্ছুক।

** শৈল্পিক সুখবাদের আর একটি রূপ—"খেলাবাদ"। প্রকাশন ব্যাপারের ক্রিয়াস্বভাবটি বুঝবার পক্ষে, খেলাতত্ত্ব অনেকখানি সাহায্য করেছে। বলা হয়—মানুষ ততক্ষণ প্রকৃত মানুষ নয় যতক্ষণ না সে খেলতে আরম্ভ করে (অর্থাৎ যতক্ষণ না সে প্রাকৃতিক ও যান্ত্রিক কার্যকারণ-নিয়ম থেকে নিজেকে মুক্ত করে এবং মনন করে। মানুষের প্রথম খেলা হচ্ছে তার শিল্প। কিন্তু যেহেতু 'খেলা' শব্দটিতে দেহের উদ্বৃত্ত শক্তির মুক্তিজনিত আনন্দ বুঝায় (ব্যাপারটি কর্মাত্মক), এই মতবাদের ফল দাঁড়িয়েছে এই যে প্রত্যেকটি খেলাকে শৈল্পিক কর্ম এবং শৈল্পিক ব্যাপারকে খেলা বলা হয়েছে। কারণ বিজ্ঞানের এবং অন্য কিছুর মতো এও খেলার অংশে পরিণত হতে পারে।

একমাত্র নীতিই খেলার ইচ্ছার দ্বারা সৃষ্ট হতে পারে না (এ ভাবে নীতির উৎপত্তি কেউই স্বীকার করবে না), অন্যপক্ষে নীতিই খেলা-ব্যাপারটিকে প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত করে।

*** তারপর, কেউ কেউ শিল্পের আনন্দকে—যৌনেন্দ্রিয়ের আনন্দের মূল থেকে ব্যুৎপন্ন করতে চেষ্টা করেছেন। অতি আধুনিক শিল্পতত্ত্ববিদ্‌দের কেউ কেউ শৈল্পিক ব্যাপারের প্রেরণা খুঁজে পেয়েছেন জয় করার আনন্দের মধ্যে, অপরের উপর আধিপত্য বিস্তার করার মধ্যে, অথবা অন্যান্য ব্যক্তিরা যেমন বলেছেন পুরুষের স্ত্রী-জাতিকে জয় করবার ইচ্ছার মধ্যে। এই মতবাদটিকে আদিম জাতির আচার-আচরণ থেকে নানা কাহিনী সংগ্রহ করে পাকা করে তোলার চেষ্টা হয়েছে। ভগবান জানেন ঐ সব কাহিনী কতখানি বিশ্বাস-যোগ্য। আসলে ঐ সব সংগ্রহের দ্বারা সমর্থনের কোন প্রয়োজনই ছিল না। কারণ আমাদের সাধারণ জীবনেও আমরা এমন সব কবি দেখতে পাই—যাঁরা, মোরগ যেমন মাথার ঝুঁটি উঁচু করে এবং 'টার্কি'রা পুচ্ছ বিস্তার করে, তেমনি কবিতা দিয়ে নিজেদের সজ্জিত করেন। কিন্তু যিনিই তা' করুন তিনি কবি নন—হতভাগ্য নির্বোধ—মোরগের বা টার্কির মতোই নির্বোধ। শিল্প-কর্মের সঙ্গে স্ত্রী-জয় কামনার কোন সম্পর্ক নেই। তা' মানলে, কাব্যকে

আর্থনৈতিক বা 'অর্থকরী' বলাও বেঠিক হবে না, কারণ প্রাচীন যুগে কবিদের অনেকে সভাকবি ছিলেন, বেতনভোগী ছিলেন এবং এখনও অনেক কবি আছেন যাঁরা কবিতা বিক্রয় করে—সম্পূর্ণ না হলেও আংশিক—জীবিকা নির্বাহ করেন। এই সিদ্ধান্ত ঐতিহাসিক বস্তুবাদে নবদীক্ষিতদের কোন কোন ব্যক্তিকে বেশ আকর্ষণ করেছে।

আর একটি মতবাদ—অবশ্য কম প্রাকৃতজনোচিত—শিল্পতত্ত্বকে হৃদ্য বা সহানুভব্যের (সিম্প্যাথেটিক) বিজ্ঞান অর্থাৎ যার সঙ্গে সহানুভবের যোগ আছে, যা' আমাদের আকর্ষণ করে, আনন্দ দেয়, উল্লাস ও বিস্ময় জাগায়—তার বিজ্ঞান বলে মনে করে। কিন্তু সহানুভব্য তো আনন্দদায়কের উপস্থাপনা বা প্রতিরূপ ছাড়া আর কিছুই নয়। এবং যেহেতু তাই, সেই হেতু এ একটি যৌগিক বস্তু, যা' দুটি উপাদানের সংযোগে উৎপন্ন—একটি অপরিবর্তনীয় উপাদান—উপস্থাপনাস্বরূপ শৈল্পিক উপাদান এবং অন্যটি পরিবর্তনশীল উপাদান—আনন্দজনকের অনন্ত রূপ—যা' মূল্যের বিভিন্ন শ্রেণী থেকে উৎপন্ন।

সাধারণ ভাষায়, যা' সহানুভব্যের প্রকাশ নয় তাকে সুন্দর আখ্যা দেওয়ার ব্যাপারে বিরাগ-ভাব লক্ষ্য করা যায়। সেই কারণে, যে সব সাধারণ লোক এ কথা বুঝতে পারে না যে বেদনার ও হীনতার রূপও সুন্দর হতে পারে, অন্ততঃ আনন্দদায়ক ও মহতের মতো তাদেরও সুন্দর হওয়ার সমানাধিকার আছে, তাদের দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে শিল্প সমালোচক এবং শিল্পতত্ত্ববিদ্‌দের দৃষ্টিভঙ্গীর নিত্য বিরোধ লেগেই আছে।

এই বিরোধের অবসান ঘটানো যায়—প্রকাশনের বিজ্ঞান এবং সহানুভব্যের বিজ্ঞান—এই দুই বিজ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করে। অবশ্য যদি সহানুভব্যের কোন বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু হওয়ার যোগ্যতা থাকে—অর্থাৎ যদি সহানুভব্য যৌগিক এবং দ্ব্যর্থক সংজ্ঞা না হয়, তবেই। যদি প্রকাশন ব্যাপারটির উপরে অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয় তবে এ প্রকাশন-বিজ্ঞান হিসাবে শিল্পতত্ত্বের মধ্যে প্রবেশ করে, আর যদি আনন্দদায়ক আধেয় বস্তুর উপর জোর দেওয়া হয়, তবে আপাততঃ যত জটিল বলেই মনে হোক, শেষ পর্যন্ত আমরা পিছিয়ে যেয়ে সেই সুখবাদেই উপস্থিত হই। যে মতবাদ আধার ও

আধেয়ের সম্পর্ককে দু'টি মূল্যের সমষ্টি বলে মনে করে, তারও উৎপত্তির উৎস এই সহানুভব্য-মতবাদ।

যে সমস্ত মতবাদ এইমাত্র আলোচিত হলো, তাতে শিল্পকে নিছক সুখ-দায়ক বস্তু হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছে। কিন্তু কোনরূপ দার্শনিক সুখবাদের সঙ্গে অর্থাৎ যে বাদে সুখ ছাড়া অন্যরূপ কোন মূল্য স্বীকৃত হয় না—যুক্ত করে না দেখা পর্যন্ত শৈল্পিক সুখবাদকে মানা চলে না। দার্শনিকরা কদাচিৎ এই সুখবাদকে গ্রহণ করেছেন, করেন নি বলাই ভাল। শিল্প দিয়ে কি হবে? শিল্প কোন্ কাজে লাগবে? শিল্পের আনন্দ কি অবাধ আনন্দ? যদি তাই হয় তবে কি পরিমাণে অবাধ? এই সব প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেই তাঁরা এক বা একাধিক আধ্যাত্মিক মূল্য – সত্য বা নীতি স্বীকার করে থাকেন! শিল্পের উদ্দেশ্য কি?—এই প্রশ্নটি প্রকাশন-বাদী শিল্পতত্ত্বে অকল্পনীয় হলেও সহানুভব্য-বাদী শিল্পতত্ত্বে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ এবং মীমাংসা দাবি করবেই।

* * * বলা বাহুল্য যে ঐ মীমাংসা দুই রকমের হতে পারে; এক—সম্পূর্ণ অভাববাদী (নিগেটিভ), অন্য—শর্তসীমাবদ্ধ।

প্রথমটিকে আমরা বলছি—অতিসংযমী-সুলভ (রিগোরিস্টিক) বা সন্ন্যাসী-সুলভ (এস্‌সেটিক) সমাধান। এই সমাধান ভাবনার ইতিহাসে খুব অল্পকাল ব্যবধানে দেখা না দিলেও, বহুবার দেখা দিয়েছে। শিল্পকে এ ইন্দ্রিয়ের মাদক রূপে গণ্য করে, অতএব শুধু অপ্রয়োজনীয় বলেই মনে করে না; ক্ষতিকর বলেই মনে করে। সুতরাং এই মতবাদ অনুসারে এর ক্ষতিকর প্রভাব থেকে মানব-আত্মাকে মুক্ত করতে আমাদের অবশ্যই সমস্ত শক্তি নিয়োগ করতে হবে। অন্যটিকে আমরা বলব—গুরুগিরি-মনোভাবাশ্রয়ী (পেডাগোগিক) বা 'নৈতিক-ঔপযোগিক'। এই মীমাংসা শিল্পকে ততক্ষণ পর্যন্তই স্বীকার করে যতক্ষণ তা' নৈতিক উদ্দেশ্যের সঙ্গে সহযোগিতা করে; যতক্ষণ, সত্য ও শিবের পথ নির্দেশ করছেন যিনি তাঁর কাজকে নির্দোষ আনন্দের সংযোগে সাহায্য করে, যতক্ষণ এ জ্ঞানের ও নীতির পানপাত্রের চারিধার মধুলিপ্ত করে রাখে।

এ কথা বলা দরকার যে, এই দ্বিতীয় সমাধানকে সত্য-সন্ধানের বা শিব বা

মঙ্গল সাধনের প্রবৃত্তির ভিত্তিতে—'বৌদ্ধিকতাধর্মী' এবং 'নৈতিক-ঔপযৌগিক' এই দুই ভাগে ভাগ করলে ভুল করা হবে। যে শিক্ষার দায়িত্ব তার উপর আরোপ করা হয়েছে, তা নিজেই ঈপ্সিত ও উপদিষ্ট লক্ষ্য বলে তাকে আর নিছক জ্ঞানাত্মক ব্যাপার বলা চলে না, তা' হচ্ছে সেই জ্ঞানাত্মক ব্যাপার যা আগেই কর্মাত্মিকা ক্রিয়ার ভিত্তিস্বরূপ হয়েছে। সুতরাং এ বৌদ্ধিকতা নয়, এ গুরুগিরি-মনোভাব, প্রয়োগপ্রবণতা। তারপর গুরুগিরি-মনোভাবাশ্রয়ী ধারণাকেও বিশুদ্ধ 'ঔপযোগিক' এবং 'নৈতিক-ঔপযৌগিক' এই দুই ভাগে ভাগ করা ঠিক হবে না। কারণ, যাঁরা শুধু ব্যক্তি-কামনার পরিপূর্তিকেই স্বীকার করেন, বিশেষতঃ যাঁরা চরম সুখবাদী, তাঁদের শিল্পের সদুদ্দেশ্য খোঁজার কোন অভিপ্রায়ই নেই।

কিন্তু এই পর্যায়ে এসে এই সব মতবাদ স্থাপনা করার অর্থ তাদের খণ্ডনই করা। আমরা এখানে এই একটি মন্তব্যেরই মধ্যে বক্তব্য সীমাবদ্ধ রাখব যে, 'শিল্পের বিষয়বস্তু প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখেই নির্বাচন করতে হবে'—এই ভুল দাবি কেন করা হয়েছে তার অন্যতম কারণ শিল্পের এই গুরুগিরি-মনোভাবাশ্রয়ী মতবাদের মধ্যেই পাওয়া যাবে।

শিল্প 'বিশুদ্ধ সৌন্দর্যের' সামগ্রী—এ প্রস্তাবটি, সুখবাদী ও গুরুগিরি-মনোভাবাশ্রয়ী বা পণ্ডিতী শিল্পতত্ত্বের বিরুদ্ধে উপস্থাপিত করা হয়েছে এবং শিল্পীরাও সাগ্রহে গ্রহণ করেছেন: "বিশুদ্ধ সৌন্দর্যের মধ্যেই ভগবান আমাদের সব আনন্দকে নিহিত রেখেছেন এবং শিল্পই পরমার্থ"। এর অর্থ যদি এই হয় যে শিল্পকে ইন্দ্রিয়-সুখের সঙ্গে (উপযোগবাদীদের প্রবৃত্তি) বা নীতি-বিচারের সঙ্গে একাকার করলে চলবে না, তা'হ'লে আমাদের শিল্পতত্ত্বকে 'বিশুদ্ধ সৌন্দর্যের শিল্পতত্ত্ব' উপাধিতে ভূষিত করা যেতে পারে। কিন্তু তাতে যদি (প্রায় ক্ষেত্রেই হয়ে থাকে) রহস্যময় ও অতীন্দ্রিয় কোন কিছু বুঝায়—এমন কিছু বুঝায় যা' মানুষের পৃথিবীতে অজ্ঞাত, যা' আধ্যাত্মিক ও স্বর্গসুখদায়ক—যা' প্রকাশাত্মক ব্যাপার নয়—তা' হ'লে নিশ্চয়ই আমরা বলব যে, যে সৌন্দর্য সব রকম অনাত্মিক অজ্ঞানাত্মিক ব্যাপার থেকে মুক্ত তেমন এক সৌন্দর্যের ধারণা করার জন্য অবশ্যই প্রশংসা করি, কিন্তু আমরা প্রকাশনগত সৌন্দর্যের অতিরিক্ত কোন সৌন্দর্য, অথবা রূপহীন বা রূপবিযুক্ত সৌন্দর্য ধারণা করতে অক্ষম।

দ্বাদশ অধ্যায়

সহানুভব্যের শিল্পতত্ত্ব ও ছদ্ম-শৈল্পিক সংজ্ঞা

'সহানুভব্য' মতবাদটি (ডকট্রিন অফ দি সিম্প্যাথেটিক)—(পরাতত্ত্বাশ্রয়ী ও রহস্যবাদী শিল্পতত্ত্বের প্ররোচনায় ও সমর্থনে এবং অন্ধ প্রথানুবর্তিতায় যা একই গ্রন্থকারের একই গ্রন্থের মধ্যে ইতস্ততঃ আলোচিত বিষয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক কল্পনা করে তার প্ররোচনায়) শিল্পতত্ত্বের গ্রন্থে কতকগুলি সংজ্ঞাকে প্রবিষ্ট ও পরিচিত করে তুলেছে; তাদের দ্রুত উল্লেখেই বুঝতে পারা যাবে কেন তাদের আমাদের গ্রন্থ থেকে দৃঢ়ভাবে বহিষ্কার করতে চাই।

তাদের তালিকা সুদীর্ঘ বলা চলে:—ট্র্যাজিক, কমিক সাবলাইম (মহীয়ান), প্যাথেটিক (করুণ), মুভিং (চিত্তাকর্ষক), স্যাড (বিষণ্ণ), রিডিকুলাস (হাস্যাস্পদ), মেলাংকলি (বিষাদ), ট্র্যাজি-কমিক, হিউমারাস (হাস্যোদ্দীপক), ম্যাজেস্টিক (রাজসুলভ গাম্ভীর্য), ডিগ্‌নিফায়েড (মর্যাদাপূর্ণ), সিরিয়াস (গুরুত্বপূর্ণ), গ্রেভ্ (গম্ভীর), ইম্পোজিং (মনোজয়ী), নোবল্ (মহান্), ডেকোরাস (অলংকৃত), গ্রেসফুল (মাধুর্যময়), ভায়োলেন্ট (ভীষণ), ইনজেনুয়াস (উদার, অকপট), ক্রুয়েল (নিষ্ঠুর), বেস্ (নীচ), হর্‌রিবল্ (ভয়ংকর), ডিসগাস্টিং (ঘৃণ্য), ড্রেডফুল (ভয়ানক), নসিয়েটিং (বীভৎস) প্রভৃতি। এই তালিকা যত ইচ্ছা বাড়ানো যেতে পারে।

ঐ মতবাদটি যেহেতু সহানুভব্যকে তার বিশেষ বিষয় হিসাবে গ্রহণ করেছে, সেইহেতু তার পক্ষে সহানুভব্যের কোনো শ্রেণীকেই, চূড়ান্ত ও ঐকান্তিক রূপ থেকে আরম্ভ করে তার বিপরীতকোটিব অসহানুভব্য ও হেয় পর্যন্ত যত পর্যায় বা মিশ্রণ সম্ভব তার কোনটিকেই উপেক্ষা করা সম্ভব নয়। এবং যেহেতু সহানুভব্যকে—অনুরাগের বিষয়কে—সুন্দর এবং বিরাগের বিষয়কে বা অসহানুভব্যকে কুৎসিত বলে গণ্য করা হয়েছে, ঐ পর্যায়গুলি (ট্র্যাজিক, কমিক, সাবলাইম, প্যাথেটিক প্রভৃতি), ঐ শিল্পতত্ত্বের ক্ষেত্রে, সুন্দর ও অসুন্দরের মধ্যবর্তী বিভিন্ন স্তর হিসাবে দাঁড়িয়ে আছে।

* * * এই সকল প্রধান প্রধান পর্যায়ের লক্ষণ যথাসাধ্য নিরূপণ করার পরে, 'সহানুভব্যের শিল্পতত্ত্ব', 'শিল্পে অসুন্দরের স্থান কোথায়'—এই সমস্যার সমাধানে আত্মনিয়োগ করেছে। আমরা যাঁরা অশিল্পিত বা অপ্রকাশিত ছাড়া অর্থাৎ প্রকাশনের বিপরীতকে ছাড়া অন্য কোন অসুন্দরকে স্বীকার করিনে, তাদের কাছে এ সমস্যার কোন অর্থই নেই। কিন্তু যে মতবাদকে আমরা সমালোচনা করছি, তাতে এই সমস্যার উত্থাপনা ও আলোচনা আবশ্যক এবং এই কারণেই আবশ্যক যে শিল্পকে আনন্দদায়কের উপস্থাপনায় পর্যবসিত করে, শিল্পের যে মিথ্যা ও ত্রুটিপূর্ণ ধারণা সে করেছে, তাকে বহুব্যাপী খাঁটি শিল্পের সঙ্গে সমন্বিত করবার চেষ্টা করতেই হবে।

এই কারণেই কোন্ ধরনের অসুন্দর শিল্পকর্মে স্থান পেতে পারে, কেন এবং কিভাবে স্থান পেতে পারে—এই প্রশ্নের মীমাংসা করবার জন্য কৃত্রিম চেষ্টা করা হয়েছে।

উত্তর দেওয়া হয়েছে:—অসুন্দরকে তখনই স্থান দেওয়া যেতে পারে যখন তাকে জয় করা সম্ভব। সুতরাং যা' বীভৎস অর্থাৎ জুগুপ্সাব্যঞ্জক, সেই অপরাজেয় অসুন্দর সম্পূর্ণ বহিষ্কৃত। তারপর, শিল্পে অসুন্দরের কাজ হচ্ছে—বৈপরীত্যের সৃষ্টি করে আনন্দদায়ককে আরো বেশী কার্যকরী এবং আনন্দদায়ক করা তথা সুন্দরের কার্যকারিতাকে আরো বাড়িয়ে তোলা। সকলেরই এ অভিজ্ঞতা আছে যে নিবৃত্তির এবং বেদনার পরে আনন্দ আরো তীব্রভাবে অনুভূত হয়ে থাকে। এই ভাবেই সুন্দরের সেবক হিসাবেই—শৈল্পিক আনন্দের রসায়ন ও গরম মসলা হিসাবেই—অসুন্দরকে শিল্পে স্থান দেওয়া হয়েছে।

সুখবাদের এই বিশেষ সূক্ষ্ম রূপটি—যাকে ঘটা করে 'অসুন্দরের পরাজয়'-তত্ত্ব বলে জাহির করা হয়েছে,—সহানুভব্য-শিল্পতত্ত্বের পতনের সঙ্গে সঙ্গেই পতিত হয় এবং তার সঙ্গেই পতন ঘটে উল্লিখিত সংজ্ঞাগুলির পরিসংখ্যানের ও লক্ষণ নিরূপণের; কারণ শিল্পতত্ত্বের সঙ্গে তাদের কোন যোগই নেই। শিল্পতত্ত্ব সহানুভব্যকে বা অসহানুভব্যকে ও তাদের বিভিন্ন প্রকারকে চেনে না, সে চেনে একমাত্র উপস্থাপনারূপ আত্মিক ক্রিয়াটিকেই।

সে যা' হোক, এ পর্যন্ত ঐ সংজ্ঞাগুলি শিল্পতত্ত্বের গ্রন্থে যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে এসেছে তাতে তাদের স্বরূপ সম্বন্ধে আরো বিস্তৃত ব্যাখ্যা দেওয়া উচিত। তাদের ভাগ্যে কি ঘটবে? শিল্পতত্ত্ব থেকে বহিষ্কৃত হ'লে দর্শনের কোন্ বিভাগে তারা স্থান পাবে?

সত্য কথা বলতে, কোথাও স্থান পাবে না। কারণ ঐ সংজ্ঞাগুলির দার্শনিক মূল্য কিছুই নেই। তারা কতকগুলি শ্রেণী—যা' নানাভাবে কল্পনা করা যেতে পারে, ইচ্ছামত বাড়ানো যেতে পারে এবং যাতে জীবনের সৎমূল্য এবং অসৎমূল্যের অনন্ত জটিলতাকে সাজিয়ে-গুছিয়ে রাখা হয়েছে। এই সব শ্রেণীর কোন কোনটির ভাববাচী (পজিটিভ) তাৎপর্য আছে—যেমন সুন্দর, মহীয়ান, ঐশ্বর্যশালী, প্রশান্ত, গুরুগম্ভীর, মহান্, সমুন্নত প্রভৃতি; কোন কোনটির নঙ্‌বাচী তাৎপর্য—যেমন কুৎসিত, বেদনাজনক, ভয়ঙ্কর, প্রচণ্ড, বীভৎস নীরস, অমিতব্যয়ী; কোন কোনটির মিশ্র তাৎপর্য—যেমন হাস্যোদ্দীপক কোমল, বিষণ্ণ, কৌতুকপ্রবণ, ট্র্যাজি-কমিক। জটিলতার অন্ত নেই, কারণ ব্যক্তীকরণেরও অন্ত নেই। সুতরাং প্রকৃতি-বিজ্ঞানগুলি যেমন খেয়ালখুশি মতো এবং মোটামুটিভাবে, অপরিগণনীয়, অবোধ্য ও বুদ্ধি-অজেয় প্রকৃতির 'যথাসাধ্য' শ্রেণীবিভাগ করে সন্তুষ্ট হয়, তেমনি ভাবে ছাড়া অন্য কোন ভাবে এই সংজ্ঞাগুলি গড়ে তোলা সম্ভব নয়। যেহেতু প্রাকৃত বিজ্ঞানগুলির মধ্যে মনস্তত্ত্বই মানুষের মানসিক জীবন থেকে নানা শ্রেণী ও ছক গঠন করতে চেষ্টা করে, সেই হেতু এই সংজ্ঞাগুলিকে শিল্পতত্ত্বের বা দর্শনের মধ্যে স্থান না দিয়ে, মনস্তত্ত্বের হাতেই তুলে দিতে হবে।

* * * ঐ সংজ্ঞাগুলির অবস্থা এবং মনস্তত্ত্বের সংজ্ঞাগুলির অবস্থা একই—ঐকান্তিক লক্ষণনিরূপণ সম্ভব নয়। সুতরাং তাদের একটিকে অন্যটি থেকে নিষ্পন্ন করা যায় না বা কোনরূপ তন্ত্রেও সমন্বিত করা চলে না, যদিও মাঝে মাঝে তা' করার চেষ্টা হয়েছে, করতে যেয়ে বহু সময়ের অপচয় করা হয়েছে এবং কোন ফলই তাতে পাওয়া যায়নি। তারপর দার্শনিক লক্ষণের মতো সুনির্দিষ্ট, সত্য এবং সর্বজনগ্রাহ্য ভূয়োদর্শনভিত্তিক লক্ষণ নিরূপণ সম্ভব—এ কথাও বলা চলে না। কারণ একক কোন ঘটনার একটিমাত্র লক্ষণ দেওয়া

যায় না। অবস্থা ও উদ্দেশ্য অনুসারে তার অসংখ্য লক্ষণ হয়ে থাকে। বলা বাহুল্য, এমন যদি কোন একটি সংজ্ঞা থাকতো, যা' সত্যের মূল্যে মূল্যবান তা' হলে সে আর ভূয়োদর্শন-ভিত্তিক লক্ষণ হতো না, খাঁটি এবং দার্শনিক লক্ষণে পরিণত হতো। বস্তুতঃ উল্লিখিত সংজ্ঞার কোন একটি যখন ব্যবহৃত হয়, তখন সঙ্গে সঙ্গে তার নতুন লক্ষণও নিরূপিত হয়ে যায়—তা' সে ব্যক্তই হোক আর উহ্যই থাক। ঐ লক্ষণগুলির প্রত্যেকটি অন্য লক্ষণ থেকে বিশেষ কারণে—যত সূক্ষ্মই সে কারণ হোক—পৃথক হয়—পৃথক হয় অন্য সব বস্তুতে বা বিষয়ে তাৎপর্যের ব্যাপ্তি ঘটিয়ে,—যে বস্তু বা বিষয় তখন তার মনোযোগের বিশেষ বিষয় হয়ে উঠে এবং সামান্যের মর্যাদায় উন্নীত হয়। অতএব অবস্থা দাঁড়াচ্ছে এই যে ঐ সব লক্ষণের একটিও শ্রোতাকে অথবা লক্ষণ-নির্ধারককে তৃপ্তি দিতে পারে না। কারণ, এক মুহূর্ত পরেই সে এমন একটি নতুন পরিস্থিতির সামনে গিয়ে হাজির হয়, যা' দেখে তার মনে হয়—তার লক্ষণ কম বা বেশী অসম্পূর্ণ, অযথার্থ, সংস্কারযোগ্য। সুতরাং লেখক বা বক্তারা মহীয়ানের, হাস্যকরের, ট্র্যাজিকের বা হাস্যোদ্দীপকের সংজ্ঞা যখন যে উদ্দেশ্যে এবং যে-ভাবে খুশি দিতে পারেন। যদি শাশ্বত সত্য, অথচ ভূয়োদর্শনভিত্তিক লক্ষণ একান্তই দাবি করা হয় তা' হ'লে আমরা এইটি দিতে পারি :—মহীয়ান (কমিক, ট্র্যাজিক, হাস্যোদ্দীপক ইত্যাদি) তাকেই বলা হয়েছে বা বলা হবে, যাকে লোকে ঐ শব্দটি দ্বারা বুঝতে চেষ্টা করেছে বা চেষ্টা করবে।

* * * **মহীয়ান** কাকে বলে? বিস্ময়কর প্রচণ্ড নৈতিক শক্তির অপ্রত্যাশিত আবির্ভাব,—অন্যতম লক্ষণ। কিন্তু অন্য লক্ষণও সমান ভালো—তাতে বলা হয়েছে,—মহীয়ান প্রচণ্ড শক্তির অভিব্যক্তি বটে, কিন্তু সে শক্তি অনৈতিক ও মারাত্মক শক্তিও হতে পারে। ততক্ষণ উভয়েই অস্পষ্ট ও অনির্দিষ্ট, যতক্ষণ না বিশেষ ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হয়,—এমন দৃষ্টান্তে প্রযুক্ত হয় যা' পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দেয়—'প্রচণ্ড' বা 'বিমূঢ়কারী' বলতে বা 'অপ্রত্যাশিত' বলতে কি বুঝায়? তারা পরিমাণাত্মক সংজ্ঞা বটে, কিন্তু মিথ্যা পরিমাণাত্মক, কারণ পরিমাপ করার কোন উপায় নেই। আসলে তারা রূপক, শক্তিসঞ্চারী বাক-বিন্যাস বা নৈয়ায়িক পুনঃকথন বিশেষ। '**হিউমার**'কে বলা হয়েছে—

অশ্রুসিক্ত হাসি, তিক্ত হাসি, হাস্য থেকে করুণে এবং করুণ থেকে হাস্যে হঠাৎ উল্লম্ফন, রোমান্টিক কমিক, মহীয়ানের বিপরীত, কপটতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা, চোখের-জল-ফেলতে লজ্জিত সমবেদন', ঘটনাকে নয় আদর্শকে উপহাস করা ;·········

হাস্যোদ্দীপকের (কমিক) লক্ষণ করা হয়েছে—বিকৃতি দেখে মনে যে অসন্তোষ বা বেদনা জাগে, তার সঙ্গে সঙ্গেই, গুরুত্বপূর্ণ-কিছু-দেখার-প্রত্যাশায়-উদ্দীপিত মানসিক শক্তির শৈথিল্য বা বিরাম ঘটার ফলে যে আনন্দ জন্মে, সেই আনন্দের আধিক্য ও প্রাধান্য ঘটে, তারই নাম 'কমিক'। কোন গল্প শোনার সময়, সে গল্প হয়তো কোন ব্যক্তির অদ্ভুত বীরত্বের কাহিনী, আমরা ঐরূপ কোন ব্যক্তির ও বীরত্বের ঘটনাই মনে মনে কল্পনা করে থাকি এবং মনঃশক্তিকে সংহত করে আমরা তাকে গ্রহণ করবার জন্য প্রস্তুত হই। কিন্তু গল্পের সূচনা ও সুর থেকে আমাদের মনে যে অদ্ভুত বীরত্বপূর্ণ ঘটনার প্রত্যাশা জেগেছে, সেই প্রত্যাশা হঠাৎ অপ্রত্যাশিত ভাবে অতি ছোট হীন এবং নির্বোধ ঘটনায় চুপসে বা পরিণত হয়ে গেল। আমরা প্রবঞ্চিত হয়েছি এবং প্রবঞ্চিত হয়েছি এই চেতনা জাগতেই ঐ মুহূর্তে বিরক্তি বা অসন্তোষ জাগে। কিন্তু ঐ মুহূর্তটি পরক্ষণেই অন্য একটি মুহূর্তের দ্বারা পরাভূত হয়—আমাদের ঐকান্তিক মনোযোগকে আমরা শিথিল করতে পারি, নতুন-করে-সঞ্চিত, সুতরাং বাড়তি মানসিক শক্তি থেকে মনকে মুক্ত করতে পারি, নিজেদের হালকা এবং সুস্থ মনে করতে পারি। হাসি যার শারীরিক অভিব্যক্তি, সেই কমিকের আনন্দ—এই আনন্দই।

যদি উপস্থিত অপ্রীতিকর ঘটনা আমাদের স্বার্থের প্রতিকূল হয়ে বেদনার সৃষ্টি করে, তা'হ'লে আনন্দ জাগবে না ; হাসির দম সেই মুহূর্তে বন্ধ হয়ে যাবে, মনোযোগ আরো সব গুরুতর বিষয়ের চাপে ঐকান্তিক ও অতি শ্রান্ত হয়ে উঠবে। আর যদি ঐরূপে গুরুত্বপূর্ণ কোন প্রতীতি না উপস্থিত হয়, যদি সমস্ত ক্ষতির পরিমাণটা দূরদর্শিতার সামান্যতম বঞ্চনার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, তা'হ'লে মানসিক আবেগের প্রাচুর্যে ঐ সামান্য বঞ্চনার বা নৈরাশ্যের যথেষ্ট ক্ষতিপূরণ হয়ে যায়। অল্প কথায় বললে এই হচ্ছে কমিক-এর সব চেয়ে

যথাযথ আধুনিক লক্ষণ। এর গর্ব এই যে, গ্রীক যুগ থেকে আমাদের যুগ পর্যন্ত, 'ফিলেবাস'-গ্রন্থে প্লেটোর দেওয়া লক্ষণ থেকে, এরিস্টটলের আরো স্পষ্ট লক্ষণ যাতে কমিককে 'বেদনাবিহীন বিকৃতি' (ugliness without pain) বলা হয়েছে—তা' থেকে হব্‌সের লক্ষণ পর্যন্ত—হব্‌সের মতে কমিকের উৎস হচ্ছে ব্যক্তির মহম্মন্যতা বোধ (feeling of individual superiority), কাণ্টের লক্ষণ পর্যন্ত—কাণ্টের মতে স্নায়বিক উত্তেজনার শৈথিল্য থেকেই কমিকের জন্ম (relaxation of tension) এবং অন্যান্যের আরো লক্ষণ যেমন 'ক্ষুদ্র ও মহানের দ্বন্দ্ব' 'সান্ত ও অনন্তের দ্বন্দ্ব' প্রভৃতি পর্যন্ত—যত লক্ষণ দেওয়া হয়েছে সবগুলিকেই এ অন্তর্ভুক্ত, সংশোধিত ও পরীক্ষিত করেছে। কিন্তু একটু সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখলেই দেখা যাবে, উল্লিখিত বিশ্লেষণ ও লক্ষণনিরূপণ, আপাতদৃষ্টিতে খুব বিস্তারিত ও সুনির্দিষ্ট বলে মনে হ'লেও এমন সব বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছে যা' শুধু কমিকে-ই প্রযোজ্য নয়, প্রত্যেক মানসিক প্রক্রিয়ার পক্ষেই প্রযোজ্য; যেমন, বেদনাজনক মুহূর্তের পৌর্বাপর্যপরম্পরা, আত্মশক্তির উপলব্ধিজনিত এবং শক্তির মুক্ত সম্প্রসারণজনিত আনন্দ, এখানে পার্থক্য করা হয়েছে পরিমাণসূচক বিভাজক দ্বারা এবং ঐ বিভাজকের মাত্রা নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। সুতরাং তারা কতকগুলি অস্পষ্টার্থক শব্দ; বিশেষ বিশেষ হাস্যকর ঘটনার বর্ণনায় তাদের প্রয়োগ দেখে এবং বক্তার বলার ভঙ্গী থেকে তাদের অর্থ যথাসম্ভব বুঝতে পারা যায়। যাঁরা এই সব লক্ষণের উপর অত্যধিক গুরুত্ব দেবেন, জাঁ পল রাইকতের 'কমিকের' সংজ্ঞা সম্বন্ধে সাধারণ ভাবে যা' বলেছিলেন তাদের ভাগ্যে সেই রকম একটা কিছুই ঘটবে—তিনি বলেছিলেন—তাঁদের একমাত্র প্রশংসার কথা এই যে তাঁরা নিজেরাই হাস্যোদ্দীপক হয়েছেন এবং যে ঘটনার তত্ত্বকে তারা যুক্তি বিচার করে প্রতিষ্ঠিত করতে চান তাঁরা নিজেরাই সেই ঘটনাকে বাস্তবে পরিণত করেছেন। হাস্যোদ্দীপক ও অহাস্যোদ্দীপকের, উচ্চহাস্যের ও স্মিতহাস্যের, স্মিতহাস্যের ও গাম্ভীর্যের পার্থক্যের সীমা-রেখা কে কবে সূত্র দিয়ে নির্ধারণ করতে পারবেন? কে নিত্যপরিবর্তনশীল, প্রবহমান জীবনধারাকে পৃথক পৃথক খণ্ডে ভাগ করতে পারে?

* * * মনস্তাত্ত্বিক সংজ্ঞায় যথাসম্ভব শ্রেণীবিভক্ত এই সব বিষয়ের সঙ্গে শৈল্পিক বিষয়ের এই সাধারণ সম্বন্ধটুকুই আছে যে তাদের প্রত্যেকেই জীবনের উপাদান বলেই, শৈল্পিক উপস্থাপনার বিষয়ীভূত হতে পারে এবং বিশেষ বা ব্যাভিচারী সম্বন্ধটুকু এই যে শৈল্পিক বিষয়ও পূর্ববর্ণিত প্রক্রিয়ার মধ্যে প্রবেশ করতে পারে—যেমন দান্তে ও শেক্সপীয়রের মতো বিরাট শিল্পীর রচনা দ্বারা মহীয়ান-বোধ জাগ্রত হতে পারে, বা স্থূলরসরসিক হীন লেখকের রচনা দ্বারা কৌতুকবোধ জাগ্রত হতে পারে।

কিন্তু এখানেও শৈল্পিক বিষয়ের সঙ্গে ঐ ব্যাপারের যোগ বহিরঙ্গ; কারণ শৈল্পিক বিষয়ের সঙ্গে শুধু শৈল্পিক সৎমূল্যের ও অসৎমূল্যের আবেগেরই—সুন্দর ও অসুন্দরেরই যোগ বর্তমান। দান্তের 'ফারিনেতা'—শিল্প হিসাবে সুন্দর এবং সুন্দর ছাড়া আর কিছুই নয়। এখন, যদি ঐ ব্যক্তির ইচ্ছার শক্তি মহীয়ান্ (সাবলাইম) বলে মনে হয়, বা দান্তে এক বিরাট প্রতিভাবলে তাকে যে ভাবে ব্যক্ত করেন, অন্যান্য প্রতিভাধর কবিদের অভিব্যক্তির তুলনায় তা' যদি মহীয়ান বলে মনে হয়,—এই বস্তুগুলি শৈল্পিক বিচারের গণ্ডীর বাইরে, আমরা আবার বলি—শৈল্পিক বিচার সর্বদাই এবং কেবলমাত্র প্রকাশনের যাথার্থ্যেরই দিকে অর্থাৎ সৌন্দর্যেরই দিকে মনোযোগ দিয়ে থাকে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

সুন্দরের দেহ—প্রকৃতিতে ও শিল্পে

শৈল্পিক ক্রিয়া কর্মাত্মিকা ক্রিয়া থেকে স্বতন্ত্র বটে, কিন্তু সর্বদাই শৈল্পিক ক্রিয়ার সঙ্গে কর্মাত্মিকা ক্রিয়ার সহযোগিতা থাকে। সেই কারণেই তার মধ্যে উপযোগের বা সুখ দুঃখের হিসাব আসে—শৈল্পিক মূল্য—অমূল্যের—সুন্দর-অসুন্দরের সক্রিয়মূর্তি যে আনন্দ-বেদনা তার হিসাব আসে। শৈল্পিক ক্রিয়ার এই কর্মাত্মক দিকটির আবার একটি 'দৈহিক' বা 'মনোদৈহিক' সহযোগী আছে, সে হচ্ছে—শব্দ, স্বর, গতি, রেখাবলীর সংযোগ, বর্ণ ইত্যাদি।

এর এই দিকটি বাস্তবিকই আছে কি? না যেরূপ আরোপ করা হয়, এবং যে-ভাবে আরোপ করা হয় তার জন্যই মনে হয় আছে? আমাদের উত্তরে সন্দেহের স্থান নেই এবং তা' হচ্ছে এই যে ঐ দুইটি প্রস্তাবের দ্বিতীয়টিই সত্য ও স্বীকার্য।

সে যাই হোক, এখানে এই বিষয়ের আলোচনা স্থগিত রাখা যাক, কারণ বর্তমানে এই আলোচনা চালিয়ে যাওয়ার কোন আবশ্যকতা নেই। যে উল্লেখটুকু করা হয়েছে তা' থেকে বুঝা যাবে যে দৈহিক উপাদানের কথা আমরা বলছি তা' বস্তুবিশেষ, সত্তাবিশেষেই সীমাবদ্ধ, তা' আত্মার ও প্রকৃতির সংজ্ঞা এবং তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে হঠাৎ সিদ্ধান্তে পরিব্যাপ্ত হবে না। আরও একটি কথাও পরিষ্কার করে তোলা দরকার—প্রত্যেক আত্মিক ক্রিয়ার আনুষঙ্গিক আনন্দ-বেদনার দিক থাকায়, যেমন শৈল্পিক ক্রিয়া এবং প্রয়োজনীয় বা আনন্দদায়ক—এই দুয়ের মধ্যে ভুল সম্পর্কের কল্পনা দেখা দিয়েছে, তেমনি দৈহিক দিকটির অস্তিত্ব বা দেহ-গঠনের সম্ভাবতা, শৈল্পিক প্রকাশ এবং প্রাকৃত অর্থে প্রকাশ—এই দুই প্রকাশের সম্বন্ধে অর্থাৎ আত্মিক ক্রিয়া এবং যান্ত্রিক ও জড় ব্যাপারের মধ্যে ভুল ধারণার সৃষ্টি করেছে। সাধারণ কথাবার্তায়, কবি যে সব শব্দ প্রয়োগ করেন তাদেরই 'প্রকাশন' বলে

গণ্য করা হয়, গীতিকারের স্বরলিপি, চিত্রকরের মূর্তি, লজ্জার সঙ্গে সাধারণতঃ যে অরুণাভা দেখা দেয়, ভয়ের সঙ্গে যে বিবর্ণতা দেখা দেয়, ক্রোধের সঙ্গে যে দন্তঘর্ষণ থাকে, উৎফুল্ল ভাবের সঙ্গে যে দৃষ্টির উজ্জ্বলতা এবং মাংসপেশীর ও মুখের বিশেষ গতিভঙ্গী দেখা দেয়—এরাও প্রকাশন। এও আমরা বলি —তাপের একটি বিশেষ মাত্রা জ্বরের প্রকাশ, বায়ুচাপযন্ত্রে চাপের পতনে— বৃষ্টির প্রকাশ, এমন কি, বিনিময়ের হিড়িক, রাষ্ট্রের কাগজীমুদ্রার মূল্যহ্রাসকে, সামাজিক অসন্তোষকে, বিপ্লবের পদক্ষেপকে প্রকাশ করে। এতগুলি ভিন্ন ভিন্ন বিষয়কে বিশেষ একটি শব্দের দ্বারা ব্যক্ত করতে গেলে বা শ্রেণীবদ্ধ করতে গেলে কি বৈজ্ঞানিক ফল পাওয়া যাবে, সহজেই তা' অনুমেয়। বস্তুতঃ একটি মানুষ যার মধ্যে ক্রোধের সমস্ত লক্ষণ দেখা দিয়েছে আর যে মানুষ ক্রোধের শিল্পরূপ দিচ্ছে—এই দুয়ের মধ্যে, যে প্রিয়জনকে হারিয়ে আর্তনাদ করছে, আছাড়িপিছাড়ি খেয়ে কাঁদছে আর যে ব্যক্তি হয়তো একই ব্যক্তি, কোন এক সময়ে—শব্দে ও গানে শোককে প্রকাশ করছে—এই দুয়ের মধ্যে এবং আবেগ-জনিত মুখভঙ্গিমার ও অভিনেতার ভাবাভিব্যক্তির মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য। ডারুইনের মানুষের ও প্রাণীর আবেগের অভিব্যক্তি গ্রন্থখানি শিল্পতত্ত্বের কোন গ্রন্থ নয়। কারণ আত্মিক-প্রকাশন বিজ্ঞান এবং..... (সেমিয়োটিক)-এর মধ্যে—তা চিকিৎসা-বিজ্ঞান, উষ্ণা-বিজ্ঞান, রাজনীতি' বা 'চিরোমান্টিক'ই হোক—কোন সম্বন্ধই নেই।

'প্রাকৃত-অর্থে প্রকাশন' মাত্রেই আত্মিক-অর্থে-প্রকাশন নয়', অর্থাৎ ক্রিয়ার ও চৈতন্যধর্মিতার প্রকৃতি তার নেই, সুতরাং সুন্দর ও অসুন্দর এই দুই মেরুতে ভাগ করে দেখারও অবকাশ নেই। বুদ্ধি-দ্বারা নির্ধারিত কার্য ও কারণের সম্বন্ধ ছাড়া আর কিছুই নয়। শিল্পসৃষ্টির সমগ্র প্রক্রিয়াটি চার পর্যায়ে সম্পূর্ণঃ—(ক) প্রত্যয় (খ) প্রকাশন বা আত্মিক শৈল্পিক-সংশ্লেষণ (গ) আনুষঙ্গিক আনন্দ-বেদনা বা সুন্দরকে উপলব্ধি করার আনন্দ (শৈল্পিক আনন্দ) (ঘ) শৈল্পিক বিষয়টিকে বস্তুশরীরে রূপান্তরিত করার চেষ্টা (শব্দ, সুর, গতি, রেখা-সংযোগ ও বর্ণ-সংযোগ ইত্যাদি) যে কেউ বুঝতে পারবে যে,যেটি আসল ব্যাপার, যাকে যথার্থ এবং একমাত্র শৈল্পিক এবং সত্য ব্যাপার

বলা চলে সে হচ্ছে—"খ"। প্রাকৃত অভিব্যক্তি বা গঠন না থাকলেও, তাকে প্রকাশনই বলা হয়।

এই চার পর্যায়ের ভিতর দিয়ে এসে প্রকাশন-প্রক্রিয়ার বৃত্ত সম্পূর্ণ হয়। আবার নতুন প্রত্যয় থেকে শুরু হয়, নতুন শৈল্পিক সংশ্লেষ ঘটে এবং তার আনুষঙ্গিক আনন্দ-বেদনার সৃষ্টি হয়।

* * প্রকাশন বা উপস্থাপনাগুলি একের পর আর একটি দেখা দেয়, একে অন্যকে বিতাড়িত করে। অবশ্য, এই চলে-যাওয়ার বা বিতাড়িত-হওয়ার অর্থ নষ্ট হওয়া নয়, সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হওয়া নয়। যা একবার জন্মে, সে কখনই এমন সম্পূর্ণ মরা মরতে পারে না যে মরার অর্থ হয়—আর জন্মগ্রহণ না করা। যদি সব বস্তুই চলে যায়, তবে কোন বস্তুই মরতে পারে না। এমন কি যে উপস্থাপনাগুলিকে আমরা বিস্মৃত হয়ে গেছি তারাও কোনও এক রূপে আমাদের আত্মার মধ্যে থেকে যায়। তা' না থাকলে অর্জিত অভ্যাস ও শক্তিসামর্থ্যের অস্তিত্ব ব্যাখ্যা করা যেতো না। বাস্তবিক, জীবনের শক্তি নিহিত রয়েছে এই আপাত বিস্মরণের মধ্যেই, লোকে তাকেই ভুলে যায় যাকে সে আত্মসাৎ করে নিয়েছে, যাকে জীবন অতিক্রম করে যেতে পেরেছে।

কিন্তু আত্মার বর্তমান ক্রিয়ার মধ্যে অন্যান্য উপস্থাপনাগুলিও বেশ প্রবল উপাদান। সেগুলি ভুলে গেলেও যেমন চলবে না, তেমনি প্রয়োজনমতো তাদের স্মরণ করাও চাই। 'ইচ্ছা'টি (উইল) সর্বদাই এ সংরক্ষণ-বিষয়ে সতর্ক। সে আমাদের সম্পদের অধিকতর মূল অংশগুলি—(বলা যায়) বেশীর ভাগই, সংরক্ষণ করতে চেষ্টা করে। তবে, এর সতর্কতাই যথেষ্ট নয়। স্মৃতি আমাদের পরিত্যাগ করে, নানাভাবে আমাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে। এই কারণে, মানুষের মন এমন প্রতিষেধক উদ্ভাবন করে যা স্মৃতির দুর্বলতা দূর করে, স্মৃতির সহায়ক হয়।

কি করে সহায়তা সম্ভব—আগের আলোচনা থেকেই জানা গেছে। প্রকাশন বা উপস্থাপনাগুলি কর্মাত্মক ব্যাপারও বটে এবং যেহেতু পদার্থবিদ্যা তাদের শ্রেণীবিভক্ত ও পর্যায়ভুক্ত করে, সেইহেতু তাদের 'পদার্থধর্মী' বা শরীরী

(ফিজিকাল) বলা হয়ে থাকে। এখন এ কথা খুবই স্পষ্ট যে আমরা যদি ঐ সৃষ্টিকর্মকে বা শরীরদান-ব্যাপারটিকে কোনও রকমে চিরস্থায়ী করতে সমর্থ হই, তা'হ'লে (অন্যান্য অবস্থা একরূপ থাকলে) ঐগুলি দেখে শুনে আবার আমরা পূর্বসৃষ্ট প্রকাশনকে বা প্রতিভানকে মনের মধ্যে পুনরুপস্থাপিত করতে পারব।

যাকে আশ্রয় করে (জ্ঞানের) আনুষঙ্গিক কর্ম রূপ পরিগ্রহ করে, অথবা (পদার্থবিদ্যার পরিভাষা প্রয়োগ করলে) যার মধ্যে গতিপ্রবাহকে বিচ্ছিন্ন করে নেওয়ার এবং স্থায়ী করবার চেষ্টা হয়েছে, তাকে যদি আমরা 'বস্তু' বা 'পাদার্থ উদ্দীপক' (ফিজিকাল স্টিমুলাস) বলি এবং সেই বস্তু বা উদ্দীপককে "ঙ" বর্ণটির দ্বারা চিহ্নিত করি, তা'হ'লে পুনরুপস্থাপন প্রক্রিয়াটি এই ক্রমঅনুসারে সংঘটিত হবে :—'ঙ' পাদার্থ উদ্দীপক ; ঘ—খ পদার্থের প্রতীতি (শব্দ, সুর, অনুকৃতি, রেখা-সংযোগ, বর্ণসমাবেশ ইত্যাদি) এবং তৎসহযোগী পূর্বকৃত শৈল্পিক সংশ্লেষ এবং গ—পুনঃপ্রবোধিত আনুষঙ্গিক আনন্দ-বেদনা।

পদ্য, গদ্য, কবিতা, উপন্যাস, ট্র্যাজেডি বা কমেডি এইসব শব্দ-সমাবেশ-গুলিকে, পুনরুপস্থানের পাদার্থ উদ্দীপক ছাড়া আর কি বলা যায়? অপেরা, ঐকতান, সোনাটা প্রভৃতি ধ্বনিসংযোগগুলি, বা চিত্র, মূর্তি, স্থাপত্যকর্ম নামক রেখা ও বর্ণের সমাবেশগুলিকে আর কি বলা যায়। স্মৃতিরূপ আত্মিক শক্তি উল্লিখিত পদার্থের সাহায্যে মনুষ্যকৃত প্রতিভানগুলির পুনরুপস্থাপন ও সংরক্ষণ সম্ভব করে তোলে। শারীরিক যন্ত্রগুলি এবং তাদের সঙ্গে স্মৃতিও দুর্বল হয়ে যায়, শিল্পের স্মৃতিস্তম্ভগুলি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এবং চেয়ে দেখো বহু যুগের পরিশ্রম, শিল্পসম্পদ হ্রাস পায় এবং দ্রুত বিলুপ্ত হয়ে যায়।

শিল্পের স্মৃতিমন্দিরগুলিকেই, শৈল্পিক পুনরুপস্থাপনের উদ্দীপক পদার্থ-গুলিকেই "সুন্দর বস্তু" বা "শরীরী সৌন্দর্য" বলা হয়। এইরূপ বাগ্‌বিন্যাসে বিরোধাভাসের সৃষ্টি হয়, কারণ সুন্দর কোন বস্তুসত্তা নয়, সৌন্দর্য বস্তুগত নয়, মনোগত, আত্মিক শক্তি-নিহিত। কোন ধরনের আরোপের ও ভাবানুষঙ্গের ফলে, সৌন্দর্য-উদ্বোধক বস্তুগুলিকেই যে লোপালংকারে "সুন্দর বস্তু" ও "শরীরী সৌন্দর্য" বলা হয়—এতক্ষণে নিশ্চয়ই তা' স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এই লোপালংকার

প্রয়োগকে আমরা ভালো করে ব্যাখ্যা করেছি বলে, আমরাও তাকে বিনা দ্বিধায় প্রয়োগ করব।

* * * শরীরী বা বস্তু-সৌন্দর্যের প্রসঙ্গ, শিল্পের 'আধার' এবং 'আধেয়'—এই দুটি শব্দের অন্য একটি অর্থ নির্ধারণ করতে সাহায্য করবে। 'আধেয়'কে (কনটেনট্) কেউ কেউ ভিতরকার বিষয় বা প্রকাশন (আমাদের কাছে যা রূপ বা আধার) বলে থাকেন এবং শারীরিক সত্তাটিকে বলেন— আধার বা রূপ এবং তা' আধেয় বস্তুর সঙ্গে যুক্ত হতে বা নাও হতে পারে। তারপর, শৈল্পিক অসুন্দরের আর একটি দিকের ব্যাখ্যাতেও এ সাহায্য করে। যখন কোন ব্যক্তির প্রকাশ করবার মতো নির্দিষ্ট কোন কিছু থাকে না, তখন সে শব্দের বন্যায়, ধ্বনিময় ছন্দে, কানধাঁধানো স্বরবৈচিত্র্যে, চোখধাঁধানো চিত্রণে, অর্থহীন বিরাট স্থাপত্য-বিধানে, ভিতরকার শূন্যতাকে ঢাকতে চেষ্টা করে। এই হিসাবে অসুন্দর হচ্ছে—উৎকল্পনাময়—বাক্‌চাতুরী। বাস্তবিক পক্ষে, জ্ঞান-ক্রিয়ার সঙ্গে যদি প্রয়োগ-কৌশলের যোগ না ঘটতো, তা'হ'লে সৌন্দর্যের অভাব হয়তো হতো, কিন্তু 'অসুন্দর' যাকে বলা যায় এমন কিছুর উদ্ভব সম্ভব হতো না।

* * * শরীরী বা বস্তুর সৌন্দর্যকে সাধারণতঃ 'প্রাকৃতিক' এবং 'কৃত্রিম' এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয়ে থাকে। ফলে আমরা এমন একটি বিষয়ের সামনে এসে পৌঁছেছি যা চিন্তাশীলদের সবচেয়ে বেশী কষ্ট দিয়েছে ঃ বিষয়টি— "প্রাকৃতিক সৌন্দর্য"। এই কথাটিতে প্রায়ই 'নিছক ব্যবহারিক আনন্দ' বুঝায়। কোন লোক যখন প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখে, যেখানে তার চোখ দুটি শ্যামলিমায় বিশ্রাম করে, দেহ উচ্ছল গতিতে চলাফেরা করে, অন্তপ্ত সূর্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলিতে আলিঙ্গন-সংবাহন করে, তাকে সুন্দর বলে, তখন সে শৈল্পিক মন্তব্য কিছু করে না। কিন্তু এ বিষয়েও কোন সন্দেহ নেই যে অন্যসময়ে, প্রাকৃতিক বস্তুতে এবং দৃশ্যে 'সুন্দর' বিশেষণটির প্রয়োগে সম্পূর্ণ শৈল্পিক তাৎপর্য থাকতে পারে।

বলা হয়েছে—প্রাকৃতিক বস্তুকে শৈল্পিক দৃষ্টিকোণ থেকে উপভোগ করতে হলে তাকে অবশ্যই তার বাহিক ও ঐতিহাসিক পরিবেষ্টনী থেকে পৃথক

করে নিতে হবে এবং প্রাকৃত অস্তিত্ব থেকে তার সাদৃশ্যকে পৃথক করতে হবে। বলা হয়েছে—আমরা যদি কোন প্রাকৃতিক দৃশ্যের সঙ্গে লৌকিক যোগ বিচ্ছিন্ন করে, দুই হাঁটুর মধ্যে মাথা রেখে তার রূপ ধ্যান করি, তাহলে ঐ দৃশ্যটি আমাদের কাছে একটি আদর্শ দৃশ্যে পরিণত হয়ে যায়। প্রকৃতি তারই কাছে সুন্দর যে শিল্পীর চোখ দিয়ে প্রকৃতিকে ধ্যান করে। প্রাণিতত্ত্ববিদ্ ও উদ্ভিদতত্ত্ববিদ্ সুন্দর প্রাণী ও ফুল চেনেন না; প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আবিষ্কৃত হয়। (এই আবিষ্কারের দৃষ্টান্ত হচ্ছে রুচিমান ও কল্পনাশীলদের—বিশেষ বিশেষ অভিমত—শিল্পীমনোভাবাপন্ন ভ্রমণকারীরা তীর্থদর্শনে বেরিয়ে যার শরণ নিয়ে থাকে এবং তার ফলে এক ধরনের সামষ্টিক নির্দেশ গড়ে উঠে); কল্পনার সহযোগিতা ছাড়া প্রকৃতির কোন অংশই সুন্দর নয় এবং ঐ সহযোগিতাতেই একই প্রাকৃতিক বস্তু, মনের অবস্থানুসারে কখনও তাৎপর্যপূর্ণ, কখনও তাৎপর্যহীন, কখনও এক বস্তুর, কখনও অন্য বস্তুর ব্যঞ্জনা বহন করে—বিষণ্ণ বা প্রফুল্ল, মহীয়ান বা হাস্যোদ্দীপক, মধুর বা হাস্যকর হয়। বলা হয়—যে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য কোন শিল্পীর মনের ছোঁওয়া পায় নি তার কোন অস্তিত্বই নাই।

এই সমস্ত মন্তব্য ঠিক এবং এই বিষয়কেই সম্পূর্ণ সমর্থন করে যে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য শৈল্পিক পুনরুস্থাপনের নিছক উদ্দীপক বিশেষ, আর পুনরুস্থাপনের বললেই তো পূর্বসৃষ্ট কোন উপস্থাপনের অস্তিত্ব বুঝায়। কল্পনার পূর্বকৃত শৈল্পিক প্রতিভান ছাড়া প্রকৃতি নিজে কোনও প্রতিভানই জাগাতে পারে না। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের ব্যাপারে মানুষ যেন নির্ঝরের-সামনে-বসে-থাকা সেই পৌরাণিক নার্সিসাস্। লিওপার্ডি বলেছিলেন—প্রাকৃতিক সৌন্দর্য—"দুর্লভ ইতস্ততো-বিচ্ছিন্ন, এবং পলাতক।" সে অসম্পূর্ণ, দ্ব্যর্থক, পরিবর্তনশীল; প্রত্যেকেই নিজ নিজ মনের ভাব আরোপ করে প্রাকৃতিক ঘটনাকে দেখেন। কোন শিল্পী স্মিতহাস্যে মধুর দৃশ্য দেখে আত্মহারা হয়ে পড়েন, কেউ বা পুরোনো জিনিসের দোকান দেখে, কেউ বা যুবতীর সুন্দর মুখ দেখে, কেউ বা ঝানু শয়তানের বীভৎস চেহারা দেখে আত্মহারা হন। প্রথম ব্যক্তি হয়তো বলবেন—পুরোনো ভাঙাচুরা জিনিসের দোকান ও ঝানু শয়তানের

কুৎসিত মুখ 'ঘৃণার উদ্রেক' করে ; দ্বিতীয় বলবেন—স্মিতহাস্যমধুর দৃশ্য এবং যুবতীর সুন্দর মুখ—'স্বাদহীন'। তাঁদের এই বাদ-প্রতিবাদ চিরকাল চলতে পারে, কিন্তু যতদিন তাঁদের শিল্পতত্ত্বের জ্ঞান যথেষ্ট মাত্রায় না দেওয়া হচ্ছে এবং তাঁরা উভয়েই ঠিক—এ কথাটা বুঝে উঠার মতো শক্তি না হচ্ছে, ততদিন তাঁরা কিছুতেই একমত হবেন না। মনুষ্যসৃষ্ট 'কৃত্রিম সৌন্দর্য' যে সাহায্য করে তা' আরো নমনীয় ও হিতকর।

* * * এই দুই শ্রেণীর সৌন্দর্য ছাড়া, শিল্পতত্ত্ববিদ্‌গণ, তাঁদের গ্রন্থে 'মিশ্র' সৌন্দর্য নামে আর এক প্রকার সৌন্দর্যের কথা বলে থাকেন। কিসের মিশ্রণ? নিশ্চয়ই প্রাকৃতিকের এবং কৃত্রিমের। যিনিই স্থায়ী রূপ ও বাহ্যাকার দেন তিনিই প্রাকৃতিক বস্তু ব্যবহার করেন, আর সে বস্তু তিনি নিজে তৈরি করেন না, শুধু সম্মিলিত ও রূপান্তরিত করেন। এই অর্থে প্রত্যেক কৃত্রিম পদার্থই প্রকৃতি ও প্রয়োগকৌশলের মিশ্রণ এবং 'মিশ্র সৌন্দর্য' বলে কোন স্বতন্ত্র শ্রেণী-কল্পনার কোন অবকাশই থাকবে না। কিন্তু কোন কোন সময় এমন হয় যে প্রকৃতিতে যেভাবে বিন্যাসটি আছে, তাকে শিল্পে অনেকটা সেই ভাবেই ব্যবহার করা যায়; যেমন, যখন আমরা একটি সুন্দর উদ্যানের পরিকল্পনা করি এবং তার মধ্যে গাছগুলি ও পুকুরগুলি প্রকৃতিতে তারা যে-স্থানে আছে সেই স্থানেই রাখি। অন্যান্য ক্ষেত্রে বহিরাকরণ বা বহিরানয়ন ব্যাপারটি,—কৃত্রিম উপায়ে কতকগুলি ফল সৃষ্টি করতে না পারার দরুন, সীমাবদ্ধ হয়ে থাকে। যেমন, আমরা বিভিন্ন বর্ণকে মিশ্রিত করতে পারি বটে, কিন্তু কোন নাটকের ভিন্ন ভিন্ন চরিত্রের উপযোগী কণ্ঠস্বর, মুখের চেহারা ও আকৃতি সৃষ্টি করতে পারি নে। অতএব আমরা, যে সমস্ত বস্তু আগে থেকেই আছে, তাদের মধ্যেই সেগুলিকে সন্ধান করব এবং পেলে তাদেরই ব্যবহার করব, সুতরাং যখন আমরা প্রকৃতিতে অবস্থিত বিন্যাসকেই অর্থাৎ যে বিন্যাসকে আমরা কৃত্রিম উপায়ে কিছুতেই সৃষ্টি করতে পারতাম না যদি না তার অস্তিত্ব থাকতো—সেই বিন্যাসকে অধিক সংখ্যায় ব্যবহার করি, তা'হ'লে যা' হয় তারই নাম 'মিশ্র সৌন্দর্য'।

* * * অবশ্যই আমরা, 'কৃত্রিম সৌন্দর্য' থেকে 'লেখন' নামে অভিহিত

পুনরুপস্থাপনার উপায় বা কারণগুলি—বর্ণমালা, স্বরগ্রাম, চিত্রলিপি এবং ফুলের ভাষা, পতাকার ভাষা থেকে বর্ণলেপের ভাষা অবধি যত ছদ্ম-ভাষা আছে, তাদের সকলকেই পৃথক করব। লেখনগুলি এমন কোন বস্তু সত্তা নয়,যা' প্রত্যক্ষভাবে শৈল্পিক প্রকাশনের মতো কোন সংবিদকে জাগায়, তারা নিছক 'সংকেত'—ঐরূপ বস্তু-সত্তা সৃষ্টি করতে হলে যা' করণীয় তারই সংকেত। নির্দিষ্ট কতকগুলি ধ্বনি উচ্চারণ করতে বাগযন্ত্রের যে আলোড়ন আমাদের করতে হয়, রেখাময় চিহ্নগুলি সেই আলোড়নের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। অভ্যাসবশে যদি আমরা মুখ না খুলেই শব্দগুলি শুনতে সক্ষম হই এবং (আরও কঠিন কাজ) স্তবকটিতে চোখ বুলিয়ে ধ্বনিগুলি শুনতে পারি, তা' হ'লেও তাতে লেখনের প্রকৃতি কিছু বদলায় না; কারণ, প্রত্যক্ষ বাস্তব সুন্দর থেকে তা' সম্পূর্ণ পৃথক। যে গ্রন্থে 'ডিভাইন কমেডি' লিখিত, অথবা যে গণনা-চিহ্ন 'ডন জিওভান্নি' সূচিত, তাদের কেউই সেই অর্থে সুন্দর বলবে না যে অর্থে, সেই প্রস্তরখণ্ডকে যাতে মাইকেল এঞ্জেলোর 'মোজেস্' অথবা সেই রঞ্জিত কাষ্ঠখণ্ডকে যাতে 'ট্র্যানস্‌ফিগারেশন' খোদিত, সুন্দর বলা যায়;

উভয়েই সুন্দরের পুনরুপস্থাপনের উপায়; প্রথমটি দ্বিতীয়টির চেয়ে অনেক দীর্ঘ এবং ঘোরালো রাস্তায় চলে।

* * * সুন্দরের আরো একটি বিভাগ শিল্পশাস্ত্রে দেখা যায়—মুক্ত এবং অমুক্ত সৌন্দর্য। অমুক্ত সৌন্দর্য বলতে বুঝায় সেই সব যা' দুই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে—এক শৈল্পিক-অতিরিক্ত উদ্দেশ্য, অন্যটি শৈল্পিক উদ্দেশ্য (প্রতিভানের উদ্দীপক)। যেহেতু প্রথম উদ্দেশ্যটি দ্বিতীয় উদ্দেশ্যের পথে বাধাস্বরূপ, দ্বিতীয় উদ্দেশ্যকে সীমায়িত করে, সেইহেতু যে সুন্দর বস্তুটি উৎপন্ন হয় তাকে 'অমুক্ত সৌন্দর্য' বলা যায়।

বিশেষতঃ স্থাপত্য-কর্মগুলির দৃষ্টান্ত দেওয়া হয় এবং এই কারণেই স্থাপত্যকে চারুশিল্পের তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়। মন্দির, সর্বোপরি ধর্মসম্প্রদায়ের ব্যবহারের জন্যই নির্মাণ করা হয়, গৃহে বাসোপযোগী কক্ষ থাকা চাই এবং বসবাসের দিকে লক্ষ্য রেখেই কক্ষের বিন্যাস করা দরকার। দুর্গ এমনভাবে নির্মাণ করতে হবে যাতে সৈন্যের আক্রমণ এবং বিশেষ শ্রেণীর

যুদ্ধাস্ত্রের আঘাত প্রতিহত করতে সমর্থ হয়। অতএব সিদ্ধান্ত করা হয়েছে স্থপতির ক্ষেত্রটি সংকীর্ণ; তিনি মন্দিরকে,গৃহকে, দুর্গকে কারুকার্যখচিত করতে পারেন বটে, কিন্তু ঐগুলি নির্মাণের উদ্দেশ্য দ্বারা তাঁর হাত বাঁধা। সৌন্দর্য ধ্যানের সেই অংশকেই শুধু তিনি ব্যক্ত করতে পারেন যে অংশে শৈল্পিক-অতিরিক্ত তথা মূল বস্তুটির ক্ষতিসাধন না করে।

অন্যান্য দৃষ্টান্ত নেওয়া হয়—কারুশিল্পের ক্ষেত্র থেকে। প্লেট, গ্লাস, ছুরি, বন্দুক এবং চিরুনী সুন্দর করে গড়া যেতে পারে, কিন্তু সেখানে এই কথা বলা যায় যে সৌন্দর্য সৃষ্টি করতে তাদের এমন পর্যায়ে নিয়ে গেলে চলবে না, যে পর্যায়ে গেলে প্লেট থেকে খাওয়ার কাজ হবে না, গ্লাসে জল খাওয়া যাবে না, ছুরি দিয়ে কাটার কাজ হবে না, বন্দুক দিয়ে গুলি ছোঁড়ার কাজ হবে না, এবং চিরুনী দিয়ে চুল আঁচড়ানোর কাজ হবে না। মুদ্রণশিল্প সম্পর্কেও এই একই কথা—ছাপা সুন্দর হবে বটে কিন্তু তাই বলে এমন হবে না যে অক্ষর পড়তে কষ্ট হয় বা পড়াই যায় না।

* * * এই সব সম্বন্ধে আমাদের প্রথম বক্তব্য এই যে বাহ্যিক উদ্দেশ্য থাকলেই যে শৈল্পিক পুনরুস্থাপনের উদ্দীপক হতে সে পারবে না এমন কোন কথা হতে পারে না। সুতরাং এ কথা বলা সম্পূর্ণ ভুল যে স্থাপত্য-কর্ম স্বভাবতঃই অন্য উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে বলে অসম্পূর্ণ এবং অমুক্ত। বস্তুতঃ সুন্দর সুন্দর স্থাপত্য-কর্মের অস্তিত্বই এই মিথ্যা ধারণাকে অপসারিত করার পক্ষে যথেষ্ট।

দ্বিতীয়তঃ ঐ দু'টো উদ্দেশ্য স্বতোবিরুদ্ধ নয় শুধু তাই নয়, এ কথাও আমরা বলতে চাই যে বিরোধ যাতে না দেখা দেয় শিল্পীরা তার ব্যবস্থাও করতে পারেন। কি করে? প্রয়োজনীয় বস্তুকে শৈল্পিক প্রতিভানের এবং বহিঃপ্রকাশনের উপাদান রূপে অঙ্গীভূত করে নিয়ে। শৈল্পিক প্রতিভানের উপায়ে বা বিষয়ে পরিণত করতে, বিষয়বস্তুর সঙ্গে আর কিছুই তাকে যোগ করতে হবে না। প্রয়োজনের সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে খাপ খাইয়ে চললেও, সে শৈল্পিক প্রতিভানই থাকবে।

গ্রাম্য কুটীর ও প্রাসাদ, গীর্জা এবং সেনাবাস, অসি ও লাঙল সুন্দর বটে,

কিন্তু কারুকর্মের অলংকরণের জন্য অতটা নয় যতটা উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যকে ব্যক্ত করার জন্যই সুন্দর। একটি পরিচ্ছদ এই কারণেই সুন্দর যে একটি বিশেষ অবস্থায়, একটি বিশেষ ব্যক্তির পক্ষে তা উপযোগী। প্রেমমুগ্ধা আর্মিডা বীর যোদ্ধা রিনাল্‌ডোর কটিবন্ধে যে অসি বেঁধে দিয়েছিল তা' সুন্দর ছিল না—"এত কারুকার্যময় যে অপ্রয়োজনীয় অলংকার বলে মনে হয় না।"; অথবা বলতে পার, সুন্দর ছিল সেই মায়াবিনীর চোখে ও কল্পনায় যে তার প্রেমাস্পদকে ঐরূপ স্ত্রৈণের বা কাপুরুষের মতো সজ্জিত দেখতে চেয়েছিল। শৈল্পিক ক্রিয়ার সঙ্গে প্রয়োজনের কোন বিরোধ নেই, কারণ প্রকাশনই সত্য।

এ কথা, অবশ্য, অস্বীকার করা চলে না যে, শৈল্পিক অনুধ্যান কখনো কখনো প্রয়োগ ব্যাপারকে ব্যাহত করে। অনেকেই এ দেখেছেন যে কোন কোন বস্তু উদ্দেশ্যের সঙ্গে এত সুন্দরভাব খাপ খেয়ে যায় অর্থাৎ এত সুন্দর মনে হয় যে তাদের ধ্যানের স্তর থেকে নামিয়ে এনে কাজে লাগাতে লোকে কুণ্ঠা বোধ করে। এই কারণেই প্রুসিয়ার রাজা ফ্রেডেরিক উইলিয়াম তার সুসজ্জিত এবং সুনিপুণ পদাতি-প্রহরী সেনাদলকে কাদায় বা যুদ্ধের আগুনের মধ্যে পাঠাতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন, আর তাঁরই কম-রুচিশীল পুত্র ফ্রেডারিক দি গ্রেট তাদের থেকে চমৎকার কাজ আদায় করেছিলেন।

* * * বাস্তব সুন্দরকে আন্তর সুন্দরের বা প্রকাশনের পুনরুস্থাপনার উপায় মাত্র বলে ব্যাখ্যা করার বিরুদ্ধে এই আপত্তি উঠতে পারে যে শিল্পীরা প্রকাশনকে সৃষ্টি করেন চিত্রণের দ্বারা, তক্ষণের দ্বারা, লেখার দ্বারা বা স্বরলিপি রচনার দ্বারা এবং সেইহেতু, বাস্তব সুন্দর বা সুন্দর বস্তুটি মানস সুন্দরের পরবর্তী হওয়ার পরিবর্তে, অগ্রবর্তীই হয়ে থাকে। এইভাবে দেখা শিল্পীর সৃষ্টিপ্রক্রিয়াকে অতি-ভাসা ভাসা ভাবে দেখা কারণ, কল্পনায় মূর্তিটি না দেখা পর্যন্ত, শিল্পী কখনই তুলির টান দিতে যান না। আর যদি কোন মূর্তি প্রত্যক্ষ করে থাকেন, তা' হ'লেও তুলির টান দিতে পারেন এবং দেন প্রকাশনকে (এখনও তার কোন অস্তিত্ব নেই), বাইরে ব্যক্ত করার জন্য নয়, পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য—আরো গভীর ধ্যানে প্রবেশ করবার 'প্রস্থান' বা বিদায় বিন্দুটি পাওয়ার জন্য,মানসিক একাগ্রতা আনবার জন্য। ঐ প্রস্থান-বিন্দুর বাস্তব

চিহ্নটি পুনরুদ্বোধনের সুন্দর বাস্তব উপায় নয় ;—সে এমন একটি উপায় যাকে বলা চলে 'পেডাগোগিক' ; যেমন নির্জন স্থানে যেয়ে বসা বা ঐ ধরনের অন্যান্য অদ্ভুত অদ্ভুত খেয়াল যা' শিল্পীদের ও বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে বিচিত্র ব্যক্তিকের তারতম্য অনুসারে দেখা দিয়ে থাকে। প্রাচীন শিল্পতত্ত্ববিদ্ বোমগার্টেন শিল্পীদের প্রেরণা পাওয়ার জন্য ঘোড়ায় চড়তে, পরিমিত মদ পান করতে এবং সুন্দরী রমণীর দিকে চাইতে (সুন্দরীরা সতী হওয়া চাই) পরামর্শ দিয়েছিলেন।

———

চতুর্দশ অধ্যায়

পদার্থতত্ত্ব ও শিল্পতত্ত্বের স্বরূপ বুঝতে না পারায় কতকগুলি ভুল

শৈল্পিক ঘটনা বা শৈল্পিক রূপ এবং বস্তুসত্তা বা শৈল্পিক রূপ—উপস্থাপনার সহায়ক বস্তুটির মধ্যে যে শুধু বাহ্যিক সম্পর্কই রয়েছে এই কথাটি বুঝতে না পারার জন্য যে সকল ভুল বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত দেখা দিয়েছে এখানে তাদের উল্লেখ করব এবং সঙ্গে সঙ্গে যে-সব কথা আগে বলা হয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে সিদ্ধান্তগুলির সমালোচনাও করব।

* * * যে অনুষঙ্গ-বাদ (অনুবন্ধবাদ ?) শৈল্পিক ব্যাপারকে দু'টি প্রতিরূপের অনুবন্ধিতার সঙ্গে এক করে ফেলে, তার সমর্থন আসে ঐ ধরনের ভুল ধারণা থেকেই। যে শিল্প-চেতনায় পরিপূর্ণ ঐক্য ছাড়া দ্বৈতের কোন স্থান নেই, আমাদের সেই শিল্প-চেতনার কাছে যে ভুল অতি হেয়, সেই ভুলটিতে কোন্ পথে উপস্থিত হওয়া সম্ভব ? ঠিক এই কারণেই যে বাস্তব রূপ ও শৈল্পিক সামগ্রীটিকে পৃথক পৃথক দু'টি প্রতিরূপ রূপে কল্পনা করা হয়েছে—তারা মনে বা আত্মায় প্রবেশ করে এবং এমনভাবে করে যে একটি যেন অন্যটিকে টেনে নিয়ে আসে, প্রথমে প্রথমটি পরে দ্বিতীয়টি আসে। একখানা ছবিকে, 'ছবির প্রতিরূপে'—এবং 'ছবির অর্থের প্রতিরূপে' ভাগ করা হয়েছে, কবিতাকে ভাগ করা হয়েছে—'শব্দের প্রতিরূপে' এবং 'শব্দগত অর্থের প্রতিরূপে'।

কিন্তু প্রতিরূপের এই দ্বৈতভাবের কোন অস্তিত্ব নেই। প্রাকৃত বস্তু প্রতিরূপ রূপে আত্মায় প্রবেশ করে না। যে পরিমাণে তা' অন্ধভাবে মনকে উত্তেজিত করে এবং পূর্ব-কল্পিত শৈল্পিক প্রকাশনের অনুরূপ সংবিদ্ সৃষ্টি করে সেই পরিমাণে তা' প্রতিরূপের পুনরুদ্বোধনের নিমিত্তকারণ হয় মাত্র (প্রতিরূপ,—শৈল্পিক বিষয়)। অনুবন্ধবাদীরা (শিল্পতত্ত্বের ক্ষেত্রে যারা আজ অনধিকার প্রবেশ করেছে) বাধা এড়ানোর জন্য এবং অনুবন্ধবাদ-বিনষ্ট ঐক্যকে কোন

প্রকারে ফিরিয়ে আনার জন্য যে চেষ্টা করেছেন, তা' খুবই শিক্ষাপ্রদ। কেউ কেউ বলেছেন—যে প্রতিরূপ পুনরুদ্বোধিত হয় "নির্জ্ঞান" (আনকন্‌সাস্‌), কেউ কেউ আবার নির্জ্ঞানকে বাদ দিয়ে রেখেই বলেন যে ঐ প্রতিরূপ অস্পষ্ট বাম্পাকার, এলোমেলো, তথা শৈল্পিক ব্যাপারটির শক্তিকে স্মৃতির দুর্বলতায় পরিণত করেন। এই উভয় সংকটের কোন সমাধান নেই। হয় অনুষঙ্গকে রাখ, ঐক্যকে ত্যাগ কর, না হয় ঐক্যকে রাখ, অনুষঙ্গকে ত্যাগ কর। সমস্যা থেকে মুক্ত হওয়ার তৃতীয় কোন পন্থা নেই।

* * * প্রাকৃত সৌন্দর্যকে সম্পূর্ণরূপে বিশ্লেষণ না করতে পারার জন্য এবং তা' যে শুধু শৈল্পিক পুনরুদ্বোধনের নিমিত্তমাত্র—একথা বুঝতে না পারায় এবং প্রাকৃত সৌন্দর্যকে প্রকৃতি-নিহিত বলে মনে করার জন্যই, শিল্পতত্ত্বের গ্রন্থে 'প্রকৃতির সৌন্দর্য' বা 'শৈল্পিক পদার্থতত্ত্ব' নামক অধ্যায় রচিত হয়েছে। অনেক সময় আবার শৈল্পিক ধাতুবিদ্যা, শৈল্পিক উদ্ভিদবিদ্যা এবং শৈল্পিক জীববিদ্যা প্রভৃতি উপবিভাগও কল্পিত হয়েছে।

এ কথা আমরা অস্বীকার করতে চাইনে যে ঐ সকল গ্রন্থে অনেক খাঁটি কথা আছে এবং যে পরিমাণে তারা গ্রন্থকারের কল্পনা ও উৎকল্পনা বা প্রত্যয়রাজি সুন্দরভাবে রূপ দিতে পেরেছে সেই পরিমাণে তারা নিজেরাই সাহিত্য-কর্ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু আমরা বলব একটি কুকুর সুন্দর কিনা, একটি শকুনি কুৎসিত কিনা, 'লিলি' সুন্দর কিনা, আর্টিচোক বিশ্রী কিনা—এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে ভুল। বাস্তবিক এখানে দ্বিগুণ ভুল। একদিকে 'শৈল্পিক পদার্থতত্ত্ব' 'শিল্পের ও সাহিত্যের শ্রেণীবিভাগতত্ত্বের' এবং বুদ্ধিকৃত নৈর্ব্যক্তিক ধারণাতে শৈল্পিক রূপ আরোপ করার চেষ্টার দ্ব্যর্থকতার আবর্তে গিয়ে পড়ে, অন্যদিকে—তথাকথিত প্রাকৃত সৌন্দর্যের, প্রাকৃত গঠনের স্বরূপ—যে গঠনে, কোন বিশেষ প্রাণী, ফুল বা মানুষ সুন্দর কি অসুন্দর এ প্রশ্নের কোনও অবকাশ নেই—তার স্বরূপ কি তা' উপলব্ধি করতে পারে না। শৈল্পিক বৃত্তি দ্বারা যা' সৃষ্ট নয় বা তার সঙ্গে যার কোন যোগ নেই—তা' সুন্দরও নয়, অসুন্দরও নয়। শৈল্পিক প্রক্রিয়ার সূচনা হয় প্রাকৃত বস্তুর সঙ্গে চৈতন্যের সংযোগ ঘটার পরেই।

এই দ্বিগুণ ভুলের আর একটি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়, মানব দেহের সৌন্দর্য বিষয়ক প্রশ্নে। এ নিয়ে গোটা গোটা বই লেখা হয়েছে। এখানে প্রথমেই আমরা তাঁদের সমালোচনা করি যাঁরা, মানব-দেহ বলতে, পুরুষদেহ বলতে, নারীদেহ বলতে, উভলিঙ্গ জীব বলতে কি বুঝায়?—এই সব প্রশ্ন তুলে সামান্য থেকে বিশেষে পৌঁছানোর চেষ্টার ভিতর দিয়ে বিষয়টির আলোচনা করেছেন।

ধরে নেওয়া যাক তাঁরা পুরুষ-সৌন্দর্য এবং নারী-সৌন্দর্য এই দুই পৃথক বিষয়ে প্রশ্নটিকে ভাগ করে নিয়ে উত্তর দিচ্ছেন (এমন সব লেখক সত্যিই আছেন যারা পুরুষ বেশী সুন্দর না নারী বেশী সুন্দর এ প্রশ্ন নিয়ে গুরুগম্ভীর আলোচনা করেছেন), আমরা বলতে পারি—পুরুষ-সৌন্দর্য বা নারী-সৌন্দর্য! কোন্ জাতির নারী-পুরুষ? শ্বেতকায়, পীতকায় বা কৃষ্ণকায় অথবা অন্য কোন বর্ণের? মনে করা যাক তাঁরা শ্বেতকায় জাতির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকছেন এবং তারপর আবার প্রশ্ন তোলা যাক—শ্বেতকায় জাতির কোন গোষ্ঠী? এমনি করে ক্রমশঃ গণ্ডী সংকীর্ণ করতে করতে শ্বেত-জগতের এক কোণে এসে আবদ্ধ হওয়ার পরে, ধরা থাক, ইতালীয়ান থেকে টাসকান সিয়েনিজ,পোটা ক্যাম্পোলিয়া প্রদেশে পৌঁছে আবার আমরা বলব—"বেশ কথা কোন্ বয়সের শরীর? কোন্ অবস্থার ও পর্যায়ের শরীর? সদ্যোজাতের? শিশুর? বালকের? যুবকের? মধ্যবয়সীর? বিশ্রামরত শরীরের বা শ্রমরত শরীরের? অথবা যে ব্যক্তি পল পোট্টারে ষাঁড়ের মতো বা রেমব্রান্তের গ্যানিমিডের মতো কর্মরত, তার শরীরের?

ক্রমশ বাদ দিতে দিতে, সংকুচিত করতে করতে—ব্যক্তিগত "ওমনিমোড্ ডিটারমিনেটাম"-এ পৌঁছানোর পরে—আঙ্গুল দিয়ে বিশেষ কোন লোককে—'এই যে এখানে যে লোক' বলে নির্দেশ করার স্তরে এসে দাঁড়ানোর পরে আর একটি ভুলেরও মুখোস খুলে ফেলা সহজ হবে এবং তা' হবে—প্রাকৃতিক ঘটনা সম্বন্ধে—যে ঘটনা শিল্পীর মনের অবস্থা ও ধারণা অনুসারে কখনও সুন্দর কখনও অসুন্দর বলে প্রতিভাত হয়, (সেই ঘটনা সম্বন্ধে) আগে যা বলেছি তা স্মরণ করলেই। নেপেল্সের উপসাগরেরও যদি নিন্দুক থেকে থাকে,

এমন শিল্পীও যখন আছেন যাঁরা উত্তর সাগরের "অন্ধকারাচ্ছন্ন দেবদারুবন" "মেঘপুঞ্জ ও নিয়ত উত্তর বায়ু" পছন্দ করেন—নেপল্‌সের উপসাগরকে অসুন্দর বলেন, তখন যে মানব-শরীর নিয়ে এত বিচিত্র ব্যঞ্জনার সৃষ্টি হয়েছে তার বিষয়ে কোন আপেক্ষিকতা থাকবে না—এ কি সম্ভব?

* * * জ্যামিতিক চিত্র বা ক্ষেত্রগুলির সৌন্দর্যের প্রশ্নটি শৈল্পিক পদার্থ-তত্ত্বের সঙ্গে যুক্ত। জ্যামিতিক চিত্র বা ক্ষেত্র বলতে যদি জ্যামিতির সংজ্ঞা (ত্রিভুজ চতুর্ভুজ সূচীঘন ক্ষেত্র) বুঝায়—তা'হ'লে সেগুলি সুন্দরও নয়, অসুন্দরও নয়, কারণ তারা সংজ্ঞা। অন্যপক্ষে, ঐ সব চিত্র বলতে যদি জ্যামিতিক ক্ষেত্রানুরূপ মূর্তি বা দেহ বুঝায়, তা' হ'লে তারা প্রত্যেকটি প্রাকৃতিক বস্তুর মতোই ভাবানুষঙ্গ অনুসারে সুন্দর অথবা অসুন্দর। কেউ কেউ বলেন যে সেই সব জ্যামিতিক চিত্রগুলি সুন্দর যেগুলি ঊর্ধ্বদিকে উচ্ছ্রিত, কারণ তারা দৃঢ়তার এবং শক্তির ব্যঞ্জনা বহন করে। এমন হ'তে পারে না—এ কথা আমরা অস্বীকার করিনে, কিন্তু অন্যপক্ষে এও অস্বীকার করা চলবে না যে যেগুলি শৈথিল্যব্যঞ্জক এবং দুর্বলতাব্যঞ্জক—যেগুলিতে অস্থিরতা ও ক্ষীণতা ব্যঞ্জিত হয়, সেগুলিতেও সৌন্দর্য থাকতে পারে। এই শেষোক্ত ক্ষেত্রগুলিতে, সরলরেখার দৃঢ়তা, সূচীঘন ক্ষেত্রের (মোচাকৃতি-ক্ষেত্রের) অথবা সমবাহু ত্রিভুজের লঘুতা কুশ্রীতার উপাদান বলেই মনে হবে।

অবশ্য, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মতো অন্যান্য সৌন্দর্যের প্রশ্ন সহানুভব্য-বাদী শিল্পতত্ত্বের কাছে কোন মিথ্যা বা অবাস্তর প্রশ্ন নয়, কারণ তার কাছে, 'শৈল্পিক সৌন্দর্য' কথাটির অর্থ—আনন্দদায়কের উপস্থাপনা কিন্তু কোন্ বিষয়বস্তু প্রেয় বা প্রীতিকর, কোন্‌টি নিরতিশয় অপ্রীতিকর বা হেয় তা' বৈজ্ঞানিক উপায়ে নির্ধারণ করবার দাবি মিথ্যা দাবি—এই ধরনের প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যেতে পারে—পুনশ্চ হিসাবে হোরেসের প্রথম গ্রন্থের প্রথম কবিতা এবং কার্লো পেপোলির কাছে লেখা লিওপার্ডির পত্রের'হাব্ বি চি' পুনরাবৃত্তি করে। প্রত্যেকের মনের মানুষ যেমন ভিন্ন, তেমনি প্রত্যেকের 'সুন্দর'ও (প্রীতিকর) ভিন্ন। "ফিলোগ্রাফি" বিজ্ঞান নয়।

শিল্পবস্তু বা বাস্তব সুন্দর সৃষ্টি করবার সময়, অনেক সময়, শিল্পীদের

চোখের সামনে প্রাকৃতিক বস্তু উপস্থিত থাকে। এইগুলিকে 'মডেল' বলে। দেহ, বস্তুসামগ্রী, ফুল প্রভৃতি। শিল্পীদের নিজেদের মন্তব্য, স্মারক টীকা, এবং পরিকল্পনা সূচীর উপর দিয়ে একবার চোখ বুলিয়ে যাওয়া যাক।

লিওনার্ডো যখন 'শেষ ভোজন'-এর ছবি তৈরি করছিলেন তখন তাঁর 'পকেট বই'তে এই কথা কয়টি টুকে রেখেছিলেন—জিওভানিনা, ক্লান্ত মুখমণ্ডল, সেণ্ট ক্যাথারিনের—হাসপাতালে, ক্রিস্টোফেমো ডি কস্টিগালয়োন 'পাইয়েতা'য়, সুন্দর তার মাথাটি, খ্রীষ্ট, জিওভান কোণ্টে, কার্ডিনাল মোরতাবোর আবাসের" এমনি আরো অনেক কথা। এ থেকেই এই ভুল ধারণা জন্মেছে যে শিল্পীরা প্রকৃতির অনুকরণ করে। বরং এই ধারণা হওয়াই উচিত ছিল যে প্রকৃতি শিল্পীদের অনুকরণ করে এবং তাদের আজ্ঞা মেনে চলে। শিল্প প্রকৃতির অনুকরণ—এই মিথ্যা ধারণার জন্ম ও প্রশ্রয় হয়েছে এই ধারণা থেকে এবং এই ধারণারই সমগোত্রীয় এবং অধিকতর প্রচলিত—শিল্প-প্রকৃতিকে আদর্শায়িত করে,—এই ধারণা থেকে। এই শেষোক্ত মতবাদটির ব্যাপারটির যথার্থ ক্রম-পর্যায় বদলে দিয়ে উলটো করে উপস্থাপিত করেছে। কারণ শিল্পী বস্তুকে আদর্শায়িত করার উদ্দেশ্যে, বাহ্যিক বস্তু থেকে অগ্রসর হন না। তিনি বাহ্য প্রকৃতির প্রত্যয় থেকে প্রকাশনে অর্থাৎ তার আদর্শে উপস্থিত হন এবং তা' থেকেই বস্তুরূপী শিল্পকর্মে—যাকে তিনি আদর্শের পুনরুদ্বোধন করবার উপায় হিসাবে প্রয়োগ করেন সেই শিল্পবস্তুতে—উপস্থিত হন।

* * * *

শৈল্পিক ধ্যান এবং বস্তুরূপ কল্পনার মধ্যে গণ্ডগোল করে ফেলার আর একটি পরিণত হচ্ছে—"সুন্দরের মৌলিক উপাদান"-মতবাদটি।

প্রকাশন বা সুন্দর যেখানে অবিভাজ্য, সেখানে, যে বস্তুরূপটিতে তা' ব্যক্ত হয় তাকে সহজেই বিভাগে-উপবিভাগে ভাগ করা যায়। যেমন কোন চিত্র-কর্মকে রেখায়, বর্ণে, রেখাগুচ্ছে, বাঁকা রেখায়, বর্ণভেদে; কোন একটি কবিতাকে স্তবকে, পংক্তিতে, চরণে, অক্ষরে এবং কোন গদ্যাংশকে অধ্যায়, পরিচ্ছেদ, শিরোনামা, যুগ, বাক্যাংশ, শব্দ প্রভৃতিতে ভাগ করা চলে। ভাগের যে অংশগুলি পাওয়া যায় তারা কোন শৈল্পিক বিষয় নয়, তারা কতক-

গুলি ছোট ছোট বস্তুসত্তা—খেয়াল অনুসারে বিভক্ত। এই পথে যদি চলা হতো এবং গণ্ডগোল যদি থেকেই যেতো তা' হ'লে আমাদের এই কথা বলেই উপসংহার করা উচিত যে সুন্দরের খাঁটি মৌলিক উপাদান হচ্ছে—'পরমাণু'।

সৌন্দর্য আয়তনবিশিষ্ট হাওয়া চাই—এই শিল্পসূত্রটি বহুবার বিঘোষিত হয়েছে; এবং তাকে 'পরমাণু' (এতবাদের?) বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা যেতে পারে। সৌন্দর্যে অতিক্ষুদ্রের অদৃশ্যতা বা অতিবিশালের অবোধগম্যতা থাকতে পারবে না। কিন্তু যে আয়তন পরিমাপের দ্বারা নয়, দৃশ্যত্বের দ্বারা নির্ধারিত, তার কথা বলা মানেই এমন একটি সংজ্ঞার কথা বলা যা' গাণিতিক সংজ্ঞা থেকে বহু দূরে অবস্থিত। বাস্তবিকই, যা' অদৃশ্য এবং অবোধগম্য, তা' কোন সংবিদই সৃষ্টি করে না, কারণ তা' কোন বস্তুর সত্তা নয়, তা' সংজ্ঞাবিশেষ। সুতরাং সৌন্দর্যে আয়তনের যে দাবি তার তাৎপর্য—সৌন্দর্যব্যঞ্জক বস্তুসত্তার উপস্থিতির চাহিদায় পর্যবসিত।

সৌন্দর্যের পদার্থতাত্ত্বিক সূত্র বা বাস্তব ভিত্তি খুঁজতে যেয়ে প্রশ্ন করা হয়েছে—কোন্ বস্তুসংস্থায় সুন্দরের অধিষ্ঠান? কোন বস্তুতে কুৎসিতের? কোন্ গণিত-পরিমেয় স্বর-সংযোগ, বর্ণ-সমাবেশ, আয়তন সুন্দর? এই প্রশ্নগুলি করা আর রাজনৈতিক-অর্থনীতি শাস্ত্রে, বিনিময়িত দ্রব্যগুলির বস্তুপ্রকৃতির মধ্যে বিনিময়-তত্ত্বের সূত্র খুঁজতে যাওয়া একই কথা। নিয়ত নিষ্ফল চেষ্টা থেকে, অনেক আগেই এর মিথ্যাভিমান সম্বন্ধে সন্দেহ জাগা উচিত ছিল। বিশেষ আমাদের এই যুগে, আরোহী শিল্পতত্ত্বের আবশ্যকতা—যা' কোন সিদ্ধান্তে লাফিয়ে না পড়ে প্রকৃত বিজ্ঞানের মতো তলদেশ থেকে গেঁথে গেঁথে তুলবে—এমন একটি শিল্পতত্ত্বের আবশ্যকতা প্রায়ই ঘোষণা করা হয়েছে। আরোহ-ন্যায়ী? শিল্পতত্ত্ব কিন্তু প্রত্যেক দার্শনিক বিজ্ঞানের মতোই সর্বদাই আরোহ-অবরোহ দুই ন্যায়কেই আশ্রয় করেছে। আরোহ-ন্যায় ও অবরোহ-ন্যায়কে পৃথক করা চলে না, এবং পৃথক পৃথক ভাবে তারা কোন যথার্থ বিজ্ঞান সৃষ্টি করতে পারে না। 'আরোহ-ন্যায়' শব্দটি এখানে হঠাৎ ব্যবহার করা হয়নি, এই কথাটি বুঝাতেই ব্যবহার করা হয়েছে যে শৈল্পিক ব্যাপার আসলে শিল্পবস্তু ছাড়া আর কিছুই নয়,—এমন একটি বস্তুসংস্থা

যাকে প্রকৃতি-বিজ্ঞানের পদ্ধতি প্রয়োগ করে বিচার-বিশ্লেষণ করা যেতে পারে।

এমন একটি সংস্কার বা বিশ্বাস নিয়েই আরোহ-ন্যায়ী শিল্পতত্ত্ব বা 'মূল থেকে গেঁথে তোলা শিল্পতত্ত্ব' (এই বিনয়ে কত স্পর্ধা ?) কাজ সুরু করেছে। বুদ্ধি বিবেচনা করেই এ কতকগুলি 'সুন্দর বস্তু',—যেমন বিভিন্ন আকারের ও আয়তনের খাম,—সংগ্রহ করেছে এবং তাদের কোন্‌টি সুন্দর, কোনটি অসুন্দর মনে হয় এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছে। যেমনটি প্রত্যাশা করা গিয়েছিল তেমনটিই হয়েছে—আরোহী-ন্যায়ী শিল্পতত্ত্বজ্ঞরা অনতিবিলম্বেই বাধার সম্মুখীন হয়েছেন, কারণ একই বস্তু, একদিক থেকে দেখে অসুন্দর বলে মনে হ'লেও অন্য দিক থেকে দেখায় সুন্দর বলে মনে হয়েছে। হলুদবর্ণের একখানি খসখসে খাম (লেফাফা) প্রেমপত্রের আবরণ হিসাবে হয়তো খুবই বিশ্রী, কিন্তু শীলমোহরাঙ্কিত কোন লেখা পাঠানোর পক্ষে সবচেয়ে উপযোগী। অন্যপক্ষে, ঐ লেখাকে ইংলিশ কাগজে তৈরি চতুষ্কোণ লেফাফার ভিতরে ভরলে, দেখতে খুবই খারাপ হবে। অতি সরল স্বাভাবিক বুদ্ধির এই বিচার-বিবেচনাই, সুন্দরের কোন বাস্তব-সত্তা নেই—এই কথাটিকে আরোহ-ন্যায়ী শিল্পতত্ত্ববিদ্‌দের ভালো করে বুঝিয়ে দেওয়ার এবং হাস্যকর ও নিষ্ফল চেষ্টা থেকে বিরত করবার পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু না, তা' হয়নি। তাঁরা যে কৌশলের শরণাপন্ন হলেন, তাকে আমরা কোন মতেই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি বলতে পারিনে। তাঁরা চারিদিকে ঐ খাম পাঠিয়ে দিলেন এবং ভোটের দ্বারা কোন্‌টি সুন্দর কোনটি কুৎসিত তা' নির্ধারণ করতে চেষ্টা করলেন।

এই বিষয়ের আলোচনায় সময়ের অপচয় করা ঠিক হবে না, অবশ্য যদি আমরা শিল্পতত্ত্ব ও তার সমস্যার প্রবক্তা না হয়ে হাসির গল্পের গল্পকার হতে চেষ্টা করি সে ভিন্ন কথা। এ অতি বাস্তব সত্য যে আরোহ-ন্যায়ী শিল্পতত্ত্ববিদেরা আজ পর্যন্ত একটি সূত্রও আবিষ্কার করতে পারেন নি।

* * যে ডাক্তারের উপরে আস্থা হারিয়ে ফেলে, হাতুড়ের হাতে ধরা দেওয়ার সম্ভাবনা তারই বেশী। সুন্দরের প্রাকৃত সূত্রে যাঁরা বিশ্বাসী তাঁদের সেই অবস্থাই হয়েছে। শিল্পীরা অনেক সময় ভূয়োদর্শনলব্ধ নিয়ম বা সূত্র—,

যেমন মানব-দেহের অনুপাত-সাম্য—"গোলডেন সেকশান" অর্থাৎ একটি রেখাকে এমন ভাবে দুইভাগে ভাগ করা যে ছোট অংশের সঙ্গে বড় অংশের অনুপাত এবং বড অংশের সঙ্গে সমগ্রের অনুপাত একই—(খগ : কগ = কগ : কখ)। এইরূপ সূত্র সহজেই কুসংস্কারে পরিণত হয় এবং তাকেই শিল্পীরা সাফল্যের কারণ বলে মনে করেন। মাইকেল এঞ্জেলো তার শিষ্য মার্কো ডেল পিনো ডা সিয়েনাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন—'সর্বদাই মিরামিডের মতো সর্পিল, এক-দ্বি ত্রি-গুণ মূর্তি তৈরি করবে", কিন্তু (নেপলস-এ এখনও তাঁর যে সব চিত্র দেখতে পাই তা থেকে পরিষ্কার বুঝতে পারা যায় যে ঐ নির্দেশ মার্কো ডা সিয়েনাকে মধ্যম শ্রেণীর চিত্রকরের বেশী আর কিছুই করতে পারে নি।

'সর্পিল তরঙ্গায়িত রেখাই প্রকৃত সুন্দর রেখা'—এই নিদেশের স্থানে মাইকেল এঞ্জেলোর কথাকেই আর সকলে প্রামাণিক বলে স্বীকার করেছিলেন। সৌন্দর্য-সূত্র, গোলডেন সেকশান এবং সর্পিল ও তরঙ্গায়িত রেখা বিষয়ে বড বড় বই লেখাও হয়েছে। আমাদের মতে—এই সব ব্যাপারকে 'শিল্পতত্ত্বের জ্যোতিষ বিদ্যা' বলা চলে।

———

পঞ্চদশ অধ্যায়

বহিঃপ্রকাশন বা বহিরানয়ন ব্যাপার। প্রয়োগ-বিজ্ঞান (টেকনিক) এবং শিল্পকলার তত্ত্ব

সুন্দর বস্তু নির্মাণ করতে, আগেই বলা হইয়াছে, সদাসতর্ক ইচ্ছাশক্তি চাই—যে ইচ্ছাশক্তি প্রতীতি, প্রতিভান বা রূপকল্পনাকে হারিয়ে যেতে দেয় না। এই ইচ্ছাশক্তি যেমন অত্যন্ত দ্রুত গতিতে, নির্বিকল্পকভাবে কাজ করতে পারে, তেমনি দীর্ঘ এবং শ্রমসাপেক্ষ বিকল্পনার ভিতর দিয়ে অগ্রসর হতে পারে। সে যাই হোক, এই ভাবেই কর্মাত্মিকা ক্রিয়া শৈল্পিক ক্রিয়ার সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত হতে পারে, অর্থাৎ আনুষঙ্গিক রূপে নয়, স্বতন্ত্র একটি পর্যায় হিসাবে। শৈল্পিক ভানকে আমরা ইচ্ছা করে সৃষ্টি বা নিরোধ করতে পারিনে, কিন্তু ইচ্ছা করে আমরা প্রতিভানকে বাইরে আনতে পারি, আবার নাও আনতে পারি বা বাহ্যীকৃত বস্তুটিকে রক্ষা করতে বা জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দিতে পারি, আবার নাও পারি।

এই ইচ্ছামূলক বহিঃপ্রকাশন ব্যাপারটির মূলে বহু প্রকার জ্ঞানের সংস্কৃতি কাজ করে থাকে। সেইগুলিকেই বলা হয়—"টেকনিক" (প্রয়োগ-বিজ্ঞান), প্রত্যেক কর্মের মূলেই প্রয়োগ-বিজ্ঞান বর্তমান। 'শরীরী সুন্দর' সম্পর্কে যে ভাবে রূপক ও লোপালংকার ব্যবহার করে বলা হয়েছে—'শৈল্পিক প্রয়োগ বিজ্ঞান' সম্বন্ধেও আমরা ঠিক তেমনি বলতে পারি—বলতে পারি (সুনির্দিষ্ট ভাষায়)—শৈল্পিক পুনরুদ্বোধনের 'উদ্দীপক' সৃষ্টি করবার জন্য যে কর্মাত্মিকা ক্রিয়া প্রযুক্ত হয় তার সহায়ক রূপে যে জ্ঞান থাকে, তাকেই বলে প্রয়োগ-বিজ্ঞান। এত দীর্ঘ বাক্য প্রয়োগ না করে আমরা প্রচলিত পরিভাষাই ব্যবহার করব। তার অর্থটি এতক্ষণে আমরা জেনে ফেলেছি।

শৈল্পিক রূপ পুনরুদ্বোধনের সহায়ক স্বরূপ প্রয়োগ-বিজ্ঞানের অস্তিত্বের সম্ভাবনা, মনকে বিভ্রান্ত ক'রে, আভ্যন্তরীণ প্রকাশনের শৈল্পিক প্রয়োগ-বিজ্ঞান

আছে—এমন একটি ধারণা পোষণ করতে প্ররোচিত করেছে। আর এ ধারণা করার অর্থ "আভ্যন্তরীণ প্রকাশনের উপায়"(মিনস্ অফ ইণ্টারনাল একস্‌প্রেশান) নামক একটি অকল্পনীয় মতবাদ প্রতিষ্ঠা করা। কেন অকল্পনীয় তার কারণ আমরা জানি। প্রকাশন-ব্যাপারটি স্বরূপে একটি প্রথম পর্যায়ের জ্ঞানাত্মিকা ক্রিয়া, কাজেই কর্মের এবং যে জ্ঞান কর্মের পথ আলোকিত করে এবং কর্ম ও প্রকাশন উভয় ব্যাপার থেকেই স্বতন্ত্র, সেই বৌদ্ধিক জ্ঞানের প্রাক্‌ভাবী। এ কতকাংশে কর্মকে আলোকিত করে বটে, কিন্তু কর্মের দ্বারা আলোকিত হয় না। প্রকাশনের কোন "উপায়" নেই, কারণ তার কোন "লক্ষ্য"ও নেই। সে শুধু বস্তুর প্রতিভান, তার কোন 'ইচ্ছা' নেই, তাই তাকে 'সংকল্প, উপায় ও লক্ষ্য' এই সব ধারণার অধীনে বিশ্লেষণ করা চলে না।

কখনো কখনো বলা হয়—অমুক অমুক লেখক উপন্যাসের বা নাটকের নতুন প্রয়োগ-বিজ্ঞান (আঙ্গিক ?) উদ্ভাবন করেছেন, অমুক চিত্রকর আলোক-বণ্টনের নতুন প্রয়োগ-বিজ্ঞান আবিষ্কার করেছেন। শব্দটি এখানে নিরর্থক। কারণ তথাকথিত নতুন প্রয়োগ-বিজ্ঞান আসলে সেই উপন্যাসটি বা সেই নতুন চিত্রটি ছাড়া আর কিছুই নয়। আলোক-বণ্টন চিত্রের ধ্যান বা ভানের সঙ্গেই ওতপ্রোত ভাবে যুক্ত, যেমন কোন নাট্যকারের প্রয়োগ-বিজ্ঞান বা আঙ্গিক তাঁর নাট্য-ধ্যানেরই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। অনেক ক্ষেত্রে, "টেকনিক" (প্রয়োগ বিজ্ঞান) শব্দটি অসার্থক শিল্পকর্মের দোষ-গুণ বুঝাতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে এবং মোলায়েম ভাষায় নিন্দা করতে বলা হয়—ধ্যানটি স্পষ্ট নয়, তবে আঙ্গিক খুব ভালো, বা ধ্যানটি ভালো, কিন্তু আঙ্গিক ভালো না।

আবার যখন আমরা চিত্রের ভিন্ন ভিন্ন উপকরণের কথা,—তৈল দ্বারা চিত্রণের অথবা ধাতুফলকের উপরে প্রথমে রেখাপাত করে, পরে দ্রাবকাদি দিয়ে তা ক্ষয় করে চিত্রাদি উৎপাদন করার প্রক্রিয়ার কথা বলি, অথবা এলাবেস্টারে মূর্তি নির্মাণের কথা বলি, তখনও 'টেকনিক' শব্দটি ব্যবহার করে থাকি। কিন্তু সে ক্ষেত্রে 'শৈল্পিক' বিশেষণটি লাক্ষণিক অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। 'নাট্যিক আঙ্গিক বা প্রয়োগ-বিজ্ঞান' কথাটি শিল্পতত্ত্বসম্মত নয় বটে, কিন্তু কোন শিল্পকর্মের বহিঃপ্রকাশন-প্রক্রিয়ার 'অভিনয়-আঙ্গিক' (থিয়েট্রিকাল

টেকনিক) অসম্ভব কিছু নয়। যেমন ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে যখন ইতালীর রঙ্গমঞ্চে নারী-বেশী পুরুষ অভিনেত্রীর পরিবর্তে নারী-অভিনেত্রীর প্রচলন ঘটেছিল তখন সেই প্রথাটি অভিনয় প্রয়োগ-বিজ্ঞানে প্রকৃত ও যথার্থ একটি আবিষ্কারে পরিণত হয়েছিল। ঠিক যেমনটি হয়েছিল পরবর্তী শতাব্দীতে ভেনিসের নাট্য-প্রযোজকদের দ্বারা দৃশ্যের দ্রুত পরিবর্তন করবার জন্য যন্ত্রের উন্নতি বিধানে।

বহিঃপ্রকাশনকামী শিল্পীর প্রয়োগ-বিজ্ঞানের জ্ঞান সংগ্রহকে কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে। তাদের বলা যেতে পারে—বিভিন্ন শিল্পকলার তত্ত্ব (থিওরিজ অফ দি আর্টস্)। এমনি ভাবে—স্থাপত্য-তত্ত্ব দেখা দিয়েছে, তাতে যান্ত্রিক সূত্র, নির্মাণের বা পরিবেষ্টনের উপাদান-সামগ্রীর ওজন ও প্রয়োগ-বাধা বিষয়ে নানা তথ্য, চুন বা আস্তর মিশ্রণের পদ্ধতি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে; ভাস্কর্য-তত্ত্ব—তাতে বিভিন্ন ধরনের পাথর খোদাই করবার জন্য ব্যবহৃত যন্ত্রের প্রয়োগ-বিধি, ব্রোঞ্জের সুষ্ঠু মিশ্রণবিধি, বাটালি ব্যবহার বিধি, মাটির বা প্লাস্টারের ঢালাই-বিধি, মৃত্তিকার আর্দ্রকরণ বিধি প্রভৃতি রয়েছে; চিত্রতত্ত্ব—তাতে বর্ণ-প্রকৃতি, তৈলচিত্র-বিধি ওয়াটারকালার-বিধি-মানব-শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সংস্থান ও তার অনুপাত, পরিপ্রেক্ষিত-সূত্র, প্রভৃতি রয়েছে; বক্তৃতা তত্ত্ব—তাতে স্বর-সৃষ্টি, স্বরের অনুশীলন এবং বলাধান পদ্ধতির নির্দেশ, ব্যক্তিত্বারোপ ও অঙ্গভঙ্গী বিষয়ক নির্দেশ রয়েছে; সংগীততত্ত্ব—তাতে ধ্বনি ও স্বরের সংযোজন ও মিশ্রণ এবং অন্যান্য প্রক্রিয়ার নির্দেশ রয়েছে। সব সাহিত্যেই ঐরূপ 'বিধি-বিধান সংগ্রহ' আছে। কোন্‌টা জানা আবশ্যক আর কোন্‌টি জানা অনাবশ্যক—জোর করে যখন এ বিষয়ে কিছু বলা চলে না, এই জাতীয় গ্রন্থগুলি প্রায় বিশ্বকোষ জাতীয় কিছু—বা বিধি-নিষেধের তালিকা হয়ে দাঁড়ায়। ভিত্রুভিয়াস তাঁর স্থাপত্য-শাস্ত্রে নির্দেশ দিয়েছেন—স্থপতিকে অঙ্কনবিদ্যা, জ্যামিতি, গণিত, দর্শন ও আলোক-বিজ্ঞান, ইতিহাস, প্রকৃতি-দর্শন, নীতিদর্শন, বিধি-বিধান, চিকিৎসা-বিদ্যা, জ্যোতিষ-বিদ্যা, সংগীত প্রভৃতি জানতে হবে। প্রত্যেকটি বিদ্যাই জানবার বিষয় : কলা-কৌশল শেখো এবং জানার কাজ শেষ করে ফেলো।

স্পষ্টই বুঝা যায় যে ঐ ধরনের ভূয়োদর্শন-লব্ধ বিধি-নিষেধের সংগ্রহকে বিজ্ঞানে পরিণত করা সম্ভব নয়। বিভিন্ন বিজ্ঞান এবং শাস্ত্র থেকে ধারণা সংগ্রহ করে করে ঐগুলি তৈরী করা হয়েছে। বিভিন্ন শিল্পকে নিয়ে একটি বৈজ্ঞানিক সূত্র রচনা করবার প্রস্তাব করা আর স্বভাবে-বহু ও স্বভাব-বিচিত্র বস্তুকে এক এবং অখণ্ড বস্তুতে পরিণত করার চেষ্টা—বৈচিত্র্যময় সৃষ্টিকে ধ্বংস করা। স্থপতির, সংগীতকারের বা চিত্রকরের সূত্রগুলিকে বৈজ্ঞানিক রূপ দেওয়ার চেষ্টা আমরা যদি করি তা'হ'লে, বলা-বাহুল্য, আমাদের হাতে, বলবিদ্যার, দৃষ্টি ও আলোক-বিদ্যার এবং ধ্বনি-বিজ্ঞানের সূত্র ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। এবং তার ভিতরকার ইতস্ততোবিক্ষিপ্ত শিল্প-সম্পর্কিত রচনাগুলি বেছে ও পৃথক করে নিয়ে একটি বৈজ্ঞানিক তন্ত্র গড়বার চেষ্টা যদি আমরা করি তা'হ'লে—বিশেষ শিল্পের ক্ষেত্র ছেড়ে শিল্পতত্ত্বের ক্ষেত্রে প্রবেশ করতে হবে। কারণ শিল্পতত্ত্ব সর্বদাই সাধারণ শিল্পতত্ত্ব; সেখানে সাধারণ-বিশেষ কোন প্রভেদ নেই। এই শেষোক্ত অবস্থার (এমন একটি প্রয়োগ-বিজ্ঞান তৈরী করবার চেষ্টা যা শেষ পর্যন্ত শিল্পতত্ত্ব রচনায় পর্যবসিত হয়) সৃষ্টি হয় তখনই যখন, বৈজ্ঞানিক প্রবৃত্তিসম্পন্ন এবং দার্শনিক প্রবৃত্তিসম্পন্ন ব্যক্তিরা ঐরূপ তত্ত্ব বা প্রয়োগ সূত্র তৈরি করতে চেষ্টা করেন।

*** কিন্তু, পদার্থতত্ত্ব ও শিল্পতত্ত্বের স্বরূপ সম্বন্ধীয় অস্পষ্ট ধারণা চূড়ান্ত অবস্থায় পৌঁছেচে—যখন নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দেওয়ার জন্য—বিশেষ বিশেষ শিল্পের তত্ত্ব কল্পনা করা হয়েছে। প্রত্যেক শিল্পের সীমা কোথায়? বর্ণ-দ্বারা কি কি বস্তু এবং শব্দ দ্বারা কি কি বস্তুর রূপ দেওয়া যায়? শুধু এক-রঙা রেখার দ্বারাই বা কি কি, আর রঙের প্রলেপ দ্বারাই বা কি কি রূপ দেওয়া যায়? সুরের দ্বারা কোন্ কোন্ বস্তু এবং ছন্দ ও ভাষার দ্বারা কোন্ কোন্ বস্তুর রূপ দেওয়া যায়? দৃষ্টিমূলক শিল্প এবং শ্রুতিমূলক শিল্পের, চিত্রের ও ভাস্কর্যের এবং কাব্যের ও সংগীতের পার্থক্য কোথায়?

বৈজ্ঞানিক ভাষায় অনুবাদ করে বলা মানে এই জিজ্ঞাসাই করা—শৈল্পিক প্রকাশনের এবং শব্দতত্ত্বের মধ্যে সম্পর্ক কি? শৈল্পিক প্রকাশনের সঙ্গে দৃষ্টি ও আলোক-বিজ্ঞানের সম্বন্ধ কি? এখন, প্রাকৃতিক ঘটনা থেকে শৈল্পিক

ঘটনায় যাওয়ার যদি কোন পথই না থেকে থাকে, তা'হ'লে শৈল্পিক ঘটনা থেকে বিশেষ জাতীয় প্রাকৃতিক ঘটনায়—শব্দতত্ত্বাশ্রিত বা আলোক-বিজ্ঞানাশ্রিত ঘটনায় পৌছানো সম্ভব হবে কি করে?

* * * তথাকথিত শিল্পগুলির কোনরূপ শৈল্পিক সীমানা নেই, কারণ তা' থাকতে গেলেই, তাদের বিশিষ্ট শৈল্পিক সত্তার অস্তিত্ব থাকা চাই। আর আগেই আমরা দেখিয়েছি যে শিল্পের শ্রেণীবিভাগ সম্পূর্ণ ভূয়োদর্শনের ভিত্তির উপরে নির্ভর করে সম্পন্ন হয়েছে। এই কারণে, শিল্পগুলির শৈল্পিক শ্রেণী বিভাগের চেষ্টা মাত্রই নিরর্থক। তাদের সীমানা যদি নাই থেকে থাকে, তবে তারা সুনির্দিষ্টভাবে নির্ধারণীয় নয়, তথা দার্শনিক শ্রেণীবিভাগে বিভাজ্যও নয়। শ্রেণীবিভাগ এবং বিশেষ শিল্পের স্বরূপ বিচার নিয়ে যত গ্রন্থ লেখা হয়েছে, তাদের সব কথানা পুড়িয়ে ফেল্‌লেও কোন ক্ষতি হবে না (যাঁরা এর জন্য প্রচুর শ্রম ব্যয় করেছেন, তাঁদের প্রতি ঐকান্তিক শ্রদ্ধা রেখেও আমরা একথা বলছি।)

এরূপ শ্রেণীবিভাগ যে অসম্ভব তার বড় প্রমাণ, শ্রেণীবিভাগের বিচিত্র চেষ্টার মধ্যেই দেখা যায়। প্রথম এবং অতি-প্রচলিত বিভাগ—শিল্পকে, শ্রোতশিল্প, চাক্ষুষ শিল্প এবং কল্পনাজ শিল্পে ভাগ করা। যেন চক্ষু, কর্ণ ও কল্পনা একই পর্যায়ের বস্তু এবং একই নৈয়ায়িক বিভাজক থেকে মৌলিক ভাজক রূপে (ফাণ্ডামেণ্টাম ডিভিশানিস) তাদের নিষ্পন্ন করা যায়। কেউ কেউ আবার শিল্পকে স্থানিক শিল্প এবং কালিক শিল্প, স্থিতির শিল্প ও গতির শিল্প এই দু'শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। যেন, স্থান-কাল, স্থিতি-গতি প্রভৃতি সংজ্ঞাগুলি বিশেষ বিশেষ শৈল্পিক রূপের নিয়ামক হতে পারে এবং শিল্পের স্বরূপের সঙ্গে তাদের যেন কোন যোগ আছে। কেউ কেউ শিল্পকে ক্লাসিক ও রোমাণ্টিক বা প্রাচ্য (ওরিয়েণ্টাল), ক্লাসিক ও রোমাণ্টিক —এই ভাবে ভাগ করে, তথা সাধারণ ঐতিহাসিক ঘটনার উপরে বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞার মূল্য আরোপ করে বা প্রকাশিত রূপগুলিকে নানা অলংকারে ভাগ ভাগ করে, অথবা চিত্রশিল্পের মতো যে শিল্পকে একদিক থেকে দেখা যায় এবং ভাস্কর্যের মতো যে শিল্পকে সব দিক থেকে দেখা যায়—এই দুই ভাগে এবং

অনুরূপ অবাস্তব বিভাগে—যা স্বর্গে বা মর্ত্যে কোথাও নেই এমনি ভাবে—ভাগ করে করে আনন্দ পেয়েছেন।

শিল্পগুলির সীমা নিরূপণের চেষ্টা বা তত্ত্ব খুব সম্ভব তাঁদেরই বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া হিসাবে দেখা দিয়েছিল যাঁরা মনে করতেন—এক শিল্পের প্রকাশনকে অন্য শিল্পের রূপে রূপান্তরিত করা চলে—'ইলিয়াড্'কে বা 'প্যারাডাইস লস্ট'কে কতকগুলি চিত্রে রূপান্তরিত করা চলে, মনে করতেন কবিতার মূল্য বেশী বা কম সেই অনুপাতেই যে অনুপাতে তাকে কোন চিত্রকর বেশী বা কম রূপান্তরিত করতে পারে। বিদ্রোহটি ন্যায়সঙ্গত এবং শেষ পর্যন্ত জয়ী হলেও এ কথা, কিন্তু সত্য নয় যে উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে যে যুক্তি দেওয়া হয়েছে এবং যে তন্ত্র গড়ে তোলা হয়েছে তা' খুব শক্তিশালী।

শিল্পের শ্রেণীবিভাগ এবং সীমানির্দেশ-বিষয়ক মতবাদের আর একটি অনুসিদ্ধান্ত, ঐ মতবাদের পতনের সঙ্গেই পতিত হয়। অনুসিদ্ধান্তটি হচ্ছে—"শিল্পগুলির মিলন" (ইউনিয়ন অফ দি আর্টস্)। বিশেষ বিশেষ কয়েকটি স্বতন্ত্র ও সীমাবদ্ধ শিল্পকে সামনে রেখে, জিজ্ঞাসা করা হয়েছে—কোন্‌টি সবচেয়ে শক্তিশালী? একাধিক শিল্পকে মিলিত করে আমরা কি আরো বেশী শক্তি পাইনে? আমাদের উত্তর—আমরা এর কিছুই জানিনে। আমরা শুধু এইটেই জানি যে প্রত্যেকটি বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষ শৈল্পিক প্রতিভানের পুনরুদ্বোধনের জন্য বিশেষ বিশেষ আঙ্গিক উপায় চাই। কোন কোন নাটকের আবেদন-শক্তি আমরা শুধু পাঠের দ্বারাই উপলব্ধি করতে পারি, আবার কোন কোন নাটকের জন্য অভিনয় ও দৃশ্যযোজনা আবশ্যক হয়। এমন এমন শৈল্পিক প্রতিভান আছে যাদের পূর্ণ বহিঃপ্রকাশনের জন্য ভাষা, সংগীত, বাদ্যযন্ত্র, বর্ণ, মূর্তি, প্রাসাদ, অভিনেতা প্রভৃতি আবশ্যক; আবার কোন কোন প্রতিভান আছে যাদের অঙ্গ দেওয়ার জন্য কলমের বা পেন্‌সিলের সামান্য কয়েকটি টানই যথেষ্ট।

তাই বলে একথা মনে করা ভুল যে অভিনয়, দৃশ্যসজ্জা এবং উল্লিখিত অন্যান্য আনুষঙ্গিক উপায়গুলি, শুধু পাঠ বা কলমের বা পেন্‌সিলের-আঁকা রেখারূপের চেয়ে বেশী শক্তিশালী। কারণ, প্রত্যেকটি বিষয়ের বা বিষয়-

গুচ্ছের, বলতে গেলে, ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্য। সুতরাং যেখানে উদ্দেশ্য ভিন্ন ভিন্ন সেখানে উপায়ের শক্তি নিয়ে তুলনামূলক আলোচনা চলে না।

* * * বিশেষতঃ, প্রকৃত এবং যথার্থ শৈল্পিক ক্রিয়ার সঙ্গে বহিঃপ্রকাশন বা 'রূপের মাঝারে অঙ্গ' দেওয়া-রূপ কর্মাত্মিকা ক্রিয়ার পরিষ্কার পার্থক্যটি চোখের উপরে রাখতে পারলেই, 'শিল্প ও উপযোগের' এবং 'শিল্প ও নীতি'র সম্বন্ধ-বিষয়ে যে জটিল ও বিভ্রান্তিকর প্রশ্ন উঠেছে, তা' আমরা সমাধান করতে পারব।

আগেই আমরা প্রমাণ করেছি যে, শিল্প, খাঁটি শিল্প হিসাবে, উপযোগ, নীতি এবং অন্যবিধ প্রযোজন-মূল্যের অপেক্ষা রাখে না। এই নিরপেক্ষতা স্বীকার না করলে, শিল্পের স্বকীয় মূল্য সম্বন্ধে যেমন কোন কথা বলা সম্ভব হবে না, তেমনি সম্ভব হবে না শৈল্পিক বিজ্ঞানের ধারণা করা—কারণ শৈল্পিক বিজ্ঞানের ধারণার জন্য স্বাধীন অর্থাৎ নিরপেক্ষ শৈল্পিক ব্যাপার অবশ্য অপেক্ষিত।

কিন্তু,তাই বলে এ কথা বললে ভুল হবে যে শিল্পীর ধ্যানের বা প্রতিভানের বা অভ্যিন্তরীণ প্রকাশনের এই নিরপেক্ষতাকে বহিঃপ্রকাশন ও সঞ্চারণ-রূপ কর্মাত্মিকা ক্রিয়াতেও—শৈল্পিক প্রকাশনের পরে যে ক্রিয়া ঘটতে বা না-ঘটতেও পারে—সম্প্রসারিত করা উচিত। * শিল্পকর্ম ব'লতে যদি শিল্পের বহিঃপ্রকাশনই বুঝায় তা'হ'লে শিল্পে উপযোগের ও নীতির অবশ্যই প্রবেশাধিকার, অর্থাৎ নিজের গৃহে প্রভু হওয়ার অধিকার আছে।

বাস্তবিকই আমাদের মনে যত প্রকাশন ও প্রতিভান গঠিত হয়, তাদের সবগুলিকে আমরা বাইরে এনে রূপদান করিনে, প্রত্যেকটি চিন্তাকে আমরা উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিনে বা লিখে রাখিনে বা ছাপিনে বা আঁকিনে বা দশের কাছে প্রকাশ করিনে। আমাদের মনের মধ্যে যে সব প্রতিভান গঠিত হয় বা অন্ততঃ রেখারূপ পায়, তাদের থেকে আমরা 'নির্বাচন' করি এবং ঐ নির্বাচন নিয়ন্ত্রিত হয় জীবনের আর্থনৈতিক অবস্থা এবং নৈতিক প্রবণতা দ্বারা। অতএব, মনের মধ্যে প্রতিভান স্থিরীকৃত হওয়ার পরেও, আমাদের বিচার করতে হবে—, দশের কাছে তা' প্রকাশ করা উচিত কি উচিত নয় ;

কাদের কাছে কখন এবং কি ভাবে প্রকাশ করতে হবে এবং এই সব বিচার-বিবেচনা উপযোগের ও নীতির আওতায় অবশ্যই পড়বে।

সুতরাং শিল্পের ক্ষেত্রে নির্বাচনের প্রশ্ন, রমণীয়ত্বের প্রশ্ন, নীতির প্রশ্ন, লোক শিক্ষার প্রশ্ন, জনপ্রিয়তার প্রশ্ন কিছু পরিমাণে সমর্থনযোগ্য, যদিও শিল্পের স্বরূপ-বিচারের ক্ষেত্রে ঐ সব প্রশ্নের উত্থাপন সম্পূর্ণ অসমর্থনীয় এবং আগেই আমরা বিশুদ্ধ শিল্পের ক্ষেত্র থেকে ঐগুলিকে বাদ দিয়েছি। প্রত্যেক ভুলের মধ্যেই সত্যের কিছুটা উপাদান থাকে। যিনি ঐ সকল ভুল শৈল্পিক সিদ্ধান্ত করেছিলেন, আসলে তাঁর চোখ ছিল ঐ প্রয়োগ ব্যাপারটির উপরে—যে প্রয়োগ ব্যাপারটি শৈল্পিক ঘটনার সঙ্গে বাহ্যতঃ যুক্ত এবং আর্থনৈতিক ও নৈতিক জীবনেরই মধ্যে অন্তর্ভুক্ত

তবু শৈল্পিক পুনরুদ্ধোধনের উপায়কে রূপ দেওয়ার ব্যাপারে, অধিকতর মুক্তির বা স্বাধীনতার প্রস্তাব করা ভালো; আমরাও তার পক্ষপাতী এবং দুর্নীতিপূর্ণ শিল্পের জন্য বিধি-বিধান রচনা করার বা আইনের আশ্রয় নেওয়ার পরিকল্পনাকে আমরা ভণ্ডদের, উদারদের এবং কালক্ষেপকদের হাতে তুলে দিচ্ছি। কিন্তু এই স্বাধীনতার ঘোষণা এবং তার সীমা বেঁধে দেওয়ার চেষ্টা—যত বড়োই সে সীমা হোক না কেন—সর্বদাই নীতির দায়িত্ব। অবশ্য তাই বলে সেই মূল সূত্রের—শিল্পের নিরপেক্ষতার—দোহাই পাড়া এবং তা' থেকে, যে শিল্পী বহিঃপ্রকাশনের সময় দুর্নীতিপরায়ণ ব্যবসায়ীর মতো পাঠকের অস্বাস্থ্যকর রুচির উপর নির্ভর করে তার নির্দোষতা প্রমাণ করার চেষ্টা করা বা ফেরিওয়ালাদের প্রকাশ্য স্থানে কুরুচিপূর্ণ মূর্তি বিক্রয় করার স্বাধীনতা সমর্থন করা, ঠিক হবে না। এই শেষোক্ত ব্যাপারটি পুলিসের আওতার মধ্যে পড়বে, যেমন প্রথমটিকে হাজির করতে হবে নৈতিক বিচারের সামনে। শিল্পের শৈল্পিক বিচারের সঙ্গে শিল্পীর ব্যক্তিগত নৈতিক চরিত্রের, বা বিশুদ্ধ জ্ঞানাত্মক ব্যাপার শিল্প যাতে অসদুদ্দেশ্যে প্রযুক্ত না হয় তার জন্য অবলম্বিত বিধি-বিধানের, কোন সম্পর্ক নেই।

———

ষোড়শ অধ্যায়

রুচি এবং শিল্পের পুনরুপস্থাপনা

যখন সমগ্র শৈল্পিক এবং বহিঃপ্রকাশন প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হয়েছে, যখন সুন্দর একটি প্রকাশন প্রস্তুত এবং বস্তুরূপের আধারে সঞ্চিত হয়েছে, তখন প্রশ্ন আসে—তার বিচার বলতে কি বুঝায়? সমস্ত সমালোচক প্রায় সমস্বরে উত্তর করেন—নিজের মনের মধ্যে তাকে পুনঃসৃষ্টি করে। ভাল কথা। এই ব্যাপারটি ভালো করে বুঝতে চেষ্টা করা যাক এবং তা' করবার উদ্দেশ্যে, পরিকল্পিত ভাবে তাকে উপস্থাপিত করা যাক।

কোন ব্যক্তি—"ক"—তার অনুভূত কোন প্রত্যয়কে রূপ দিতে চায়, কিন্তু এখনো রূপ দিতে পারেনি। সে বিভিন্ন শব্দ ও বাক্য দ্বারা আকাঙ্ক্ষিত রূপটিকে—যে রূপটি আছে অথচ যাকে সে ধরতে পারে নি—তাকে ব্যক্ত করতে চায়। সে "ম" নামক কোন রূপ কল্পনা করেছে বটে, কিন্তু অনুপযুক্ত, অব্যক্ত, অসম্পূর্ণ ও অসুন্দর বলে তাকে খারিজ করে দিয়েছে, "ন" রূপটিকেও উদ্ভাবন করে, একই কারণে পরিহার করেছে। সে কোন রূপকেই প্রত্যক্ষ করতে পারছে না, স্পষ্টরূপে দেখতে পারছে না। এখনও তার মনে প্রকাশন ঘটেনি। এমনি করে একবার লক্ষ্যের কাছাকাছি পৌছানো, একবার অনেক দূরে সরে পড়া—এরূপ অনেক ব্যর্থ চেষ্টার পরে সে সহসা (যেন স্বতঃস্ফূর্তভাবেই গড়ে উঠলো) আকাঙ্ক্ষিত প্রকাশনকে লাভ করে—এবং "lux facta est"……সে মুহূর্তকাল শৈল্পিক আনন্দ বা সৌন্দর্যজনিত আনন্দ উপভোগ করে। অসুন্দর তথা বেদনাজনক ছিল সেই শৈল্পিক ক্রিয়া যা' বাধাকে জয় করতে সমর্থ হয়নি। সুন্দর হলো সেই শৈল্পিক ক্রিয়া যা বিজয়ীর রূপে আত্মপ্রকাশ করল।

এই দৃষ্টান্তটি নিয়েছি আমার ভাষার ক্ষেত্র থেকে, কারণ ভাষা আমাদের বেশী নিকটবর্তী, বেশী অধিগম্য, এবং সকলেই অঙ্কনাদি না করলেও আমরা

সকলেই ভাষা ব্যবহার করে থাকি। এখন যদি অন্য একটি ব্যক্তিকে—বলা যাক তার নাম "খ"—ঐ প্রকাশনের মূল্য-বিচার করতে হয় এবং প্রকাশনটি সুন্দর কি অসুন্দর তা' নির্ধারণ করতে হয়, তা'হ'লে তাকে অবশ্যই—"ক" এর দৃষ্টিকোণে নিজেকে দাঁড় করাতে হবে এবং "ক" যে বস্তু-সংকেত তার সামনে এনে দিয়েছে—তার সাহায্যে তাকে সমগ্র প্রক্রিয়াটির ভিতর দিয়ে চলতে হবে। "ক" যদি স্পষ্টতঃ দেখে থাকেন তা' হ'লে "খ"ও (যিনি "ক"-এর দৃষ্টিকোণে নিজেকে স্থাপন করেছেন) স্পষ্টাকারে দেখতে পাবেন এবং প্রকাশনটিকে 'সুন্দর'ই দেখবেন। "ক" যদি স্পষ্ট না দেখে থাকেন, তবে "খ"ও স্পষ্ট দেখবেন না, এবং প্রকাশনটিকে বেশী-কম তেমনি অসুন্দরই দেখবেন—যেমনটি "ক" দেখেছেন।

বলা যেতে পারে,—অন্য যে দু'রকম অবস্থা হতে পারে তা' বিবেচনা করা হয়নি : সেই দুই অবস্থা :—"ক"-এর দৃষ্টি পরিষ্কার কিন্তু "খ"-এর দৃষ্টি আচ্ছন্ন ; অন্যপক্ষে "ক"-এর দৃষ্টি আচ্ছন্ন' কিন্তু "খ"-এর দৃষ্টি পরিষ্কার। ঠিক ভাবে বলতে গেলে—এই দুই অবস্থা অসম্ভব।

প্রকাশন-ক্রিয়া যেহেতু তা' ক্রিয়া, সেইহেতু খামখেয়াল নয়, আত্মিক প্রয়োজন। এক ভাবে ছাড়া অন্য কোন ভাবে সে নির্দিষ্ট শৈল্পিক সমস্যার সমাধান করতে পারে না এবং সেই ভাবটিই হচ্ছে—খাঁটি ভাব। এই সরল মন্তব্যে আপত্তি করে বলা যেতে পারে—শিল্পীর কাছে যে শিল্পকর্ম সুন্দর বলে মনে হয়, পরবর্তী কালে সমালোচকের কাছে তা' অসুন্দর মনে হতে পারে ; অন্যপক্ষে যে শিল্পকর্ম সৃষ্টি করে শিল্পী সন্তুষ্ট হতে পারেননি শিল্পীর কাছে যা' অসম্পূর্ণ বা ব্যর্থসৃষ্টি বলে মনে হয়েছে, সেই শিল্পকর্মকে সমালোচকরা সম্পূর্ণ ও সুন্দর বলে ঘোষণা করেছেন। কিন্তু এক্ষেত্রে দু'য়ের একটি মিথ্যা হবেই। কোন ক্ষেত্রে সমালোচকের ভুল, কোন ক্ষেত্রে শিল্পীর ভুল। বাস্তবিক প্রকাশনের স্রষ্টা তাঁর আত্মার মধ্যে কি ঘটছে সব সময় তা' বুঝে উঠতে পারেন না। অতি ত্বরা, গর্ব, বিচারের অভাব, জ্ঞানের কুসংস্কার প্রভৃতির মানুষকে এমন কথা বলায় এবং কাউকে কাউকে বিশ্বাসও করায় যে আমাদের সৃষ্টি খুব সুন্দর—একটু তলিয়ে দেখলেই হয়তো আমরা দেখতে

পেতাম যে আসলে সেই সৃষ্টি অসুন্দর। বেচারা ডন কুইকজোট্ যে (Vizor) প্রথম আঘাতেই অতিক্ষীণ প্রতিরোধ-শক্তির পরিচয় দিয়েছে তাকেই যখন ঐকান্তিক আগ্রহে শিরস্ত্রাণের সঙ্গে বাঁধবার চেষ্টা করেছিলেন, তখন তাকে আর কোন সুপ্রদত্ত অস্ত্রাঘাত দিয়ে পরীক্ষা করেননি, শুধু এই ঘোষণা করেই ক্ষান্ত হয়েছিলেন—(লেখক বলেছেন)—por celada finisima de encase. অন্য ক্ষেত্রে একই কারণ বা বিপরীত অথচ অনুরূপ কারণ শিল্পীদের মনকে পীড়া দেয় এবং নিজের সার্থক সৃষ্টির মূল্যকে ভুলভাবে যাচাই করায় অথবা স্বতঃস্ফূর্তভাবে যাকে সুন্দর করে শিল্পী সৃষ্টি করেছেন তাকে সংশোধন করায় এবং আগের চেয়ে অসুন্দর করে তোলে। এর অন্যতম দৃষ্টান্ত ট্যাসো এবং তার "জেরুজালেম্মি লিবারেতা"থেকে—"জেরুজালেম্মি কনকুইস্তেতা"তে পরিবর্তন। তেমনি ভাবেই ত্বরা, আলস্য, বিচারক্ষমতার অভাব, কুসংস্কার, ব্যক্তিগত রাগদ্বেষ, এবং অনুরূপ মতলব প্রভৃতি কখনো কখনো সমালোচকদের সুন্দরকে অসুন্দর বলে এবং অসুন্দরকে সুন্দর বলে ঘোষণা করতে প্ররোচনা দিয়ে থাকে। এই সব বাধা থেকে মনকে মুক্ত রাখতে পারলেই সমালোচক শিল্পের স্বরূপটি প্রত্যক্ষ করতে পারবেন এবং সেই পরিশ্রমী এবং নির্বিকার বিচারক ভাবী কালের উপর পুরস্কার দেওয়ার এবং বিচারের ভার অর্পণ করবেন না।

* * * পরবর্তী প্রতিপাদ্য থেকে স্পষ্টই বুঝা যাচ্ছে যে বিচার-ক্রিয়া—যা' সমালোচনা করে, সুন্দরকে আবিষ্কার করে এবং যে ক্রিয়া শিল্পকে সৃষ্টি করে, উভয়ে একই ক্রিয়া। উভয়ের একমাত্র পার্থক্য—অবস্থা ভেদের মধ্যে নিহিত রয়েছে ; একের ক্ষেত্রে শিল্পের সৃষ্টির প্রশ্ন অন্যের ক্ষেত্রে, পুনঃসৃষ্টির প্রশ্ন। যে ক্রিয়া বিচার করে তার নাম রুচি (টেস্ট) এবং সৃষ্টি-ক্রিয়ার নাম 'প্রতিভা'—অতএব প্রতিভা ও রুচি আসলে একই।

সমালোচকের মধ্যে শিল্পীর প্রতিভা থাকা দরকার এবং শিল্পীর মধ্যে সমালোচকের রুচি থাকা দরকার—এই প্রচলিত মন্তব্যের মধ্যে—অথবা এই মন্তব্যের মধ্যে যে রুচি দু'রকম, এক সক্রিয় (উৎপাদক) রুচি, অন্যটি নিষ্ক্রিয় (অনুৎপাদক) রুচি এই ঐক্যেরই আভাস পাওয়া যায়। আবার কতকগুলি মন্তব্যে এই ঐক্যকে অস্বীকার করা হয়েছে ; যেমন লোকে যখন

প্রতিভাবিহীন রুচি বা রুচিবিহীন প্রতিভার কথা বলেছে। এই শেষের মন্তব্যগুলি নিরর্থক,--যদি না তারা কোন মাত্রাগত বা মনস্তাত্ত্বিক পার্থক্য বুঝাতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। 'রুচিহীন প্রতিভা' বলা হচ্ছে তাদেরকে যাদের শিল্পকর্মের প্রধান প্রধান অংশ প্রেরণার সৃষ্টি এবং অপ্রধান অংশ ত্রুটিপূর্ণ ও অবহেলিত আর প্রতিভাহীন রুচি বলা হচ্ছে তাঁদেরকে যাঁরা গৌণ অংশের রূপায়ণে মোটামুটি কৃতিত্ব দেখালেও, বড় রকমের শৈল্পিক সংশ্লেষণ করবার শক্তির অধিকারী নন। অন্যান্য সদৃশ মন্তব্যের অনুরূপ ব্যাখ্যা সহজেই দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু প্রতিভা ও রুচির মধ্যে, সৃষ্টি ও পুনঃসৃষ্টির মধ্যে, বাস্তবিক কোন পার্থক্য নির্দেশ করলে,—দর্শের কাছে সঞ্চারণ এবং মূল্যবিচার উভয়ই সমানভাবে অকল্পনীয় হয়ে দাঁড়াবে। যা' আমাদের কাছে বাহ্যিক, তাকে আমরা বিচার করব কি করে? যা' বিশেষ একটি বৃত্তির সৃষ্টি, তাকে ভিন্ন বৃত্তি দিয়ে বিচার করব কি ক'রে? সমালোচক প্রতিভায় ক্ষুদ্র হতে পারেন, শিল্পী হতে পারেন অনেক বড়, সমালোচকের শক্তির মাত্রা যদি হয় দশ, শিল্পীর শক্তির মাত্রা সেখানে হয়তো একশো, বিশেষ একটি পর্যায়ে পৌছতে সমালোচককে অন্যের সাহায্যও নিতে হতে পারে, কিন্তু তা' সত্ত্বেও উভয়ের ধর্ম একই থাকবে। দান্তের মূল্য বিচার করতে আমাদের দান্তের স্তরে পৌছতে হবে। বলা বাহুল্য আমরা বস্তুতঃ দান্তে নই, বা দান্তেও আমরা নন, কিন্তু ধ্যানের ও বিচারের মুহূর্তে— কবির চিত্তের সঙ্গে আমাদের চিত্ত এক হয়ে যায় এবং সেই মুহূর্তে আমরা ও তিনি একই সত্তা। এই সহৃদয়তা সম্ভব বলেই আমাদের ক্ষুদ্র হৃদয় মহান আত্মার সুরকে প্রতিধ্বনিত করতে পারে এবং আত্মার উদার পরিব্যাপ্তির সঙ্গে একাত্মক হয়ে মহান ও বিরাট হয়ে উঠতে পারে। প্রসঙ্গত বলা যাক— শিল্পবিচার সম্বন্ধে যে কথা বলা হয়েছে, অন্যান্য ক্রিয়ার বিচারকের সম্বন্ধেও একই কথা বলা চলে। বলা চলে—বৈজ্ঞানিক, আর্থনৈতিক এবং নৈতিক বিচারও একইভাবে করা হয়ে থাকে। শুধু নৈতিক বিচারের ক্ষেত্রে নিজেদের সীমাবদ্ধ রেখে বলতে পারা যায়। কোন সংকল্পকারী যে অবস্থায় থেকে সংকল্প গ্রহণ করেছে, সেই অবস্থায় নিজেদের মনে মনে স্থাপন না করা

পর্যন্ত, তার সিদ্ধান্ত ন্যায় কি অন্যায় হয়েছিল কিছুতেই আমরা তা' বলতে পারব না। এভাবে কার্যকে না দেখলে কার্যের স্বরূপ বুঝাই যাবে না, অতএব কার্যের বিচারও সম্ভব হবে না। কোন নরহত্যাকারী দুর্বৃত্ত অথবা বীর হতে পারে; তা'ই যদি হয়,—আপাততঃ সমাজরক্ষার বিষয়ে উদাসীন থাকা যাক, কারণ সমাজ উভয়কেই একই দণ্ড দেবে—তবে যিনি ঘটনাটিকে নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করতে এবং উভয়ের মধ্যে পার্থক্য দেখাতে চান,তাঁর পক্ষে কারণ-সম্বন্ধে উদাসীন থাকা সম্ভব নয়; অতএব নরহত্যাকারীর কার্যের প্রকৃত স্বরূপটিকে আইনগত ভাবে এবং নীতিগত ভাবে নিরূপণ করবার জন্য ব্যক্তিগত মনস্তত্ত্ব পুনর্গঠন করার দায়িত্ব আমরা কিছুতেই এড়াতে পারিনে। নীতিশাস্ত্রে, মাঝে মাঝে 'নৈতিক রুচি'র উল্লেখ করা হয়ে থাকে—কথাটি 'নৈতিক চেতনা' অর্থাৎ সদিচ্ছার ক্রিয়া বুঝাতেই ব্যবহৃত।

* * * শৈল্পিক বিচার বা পুনঃসৃষ্টি সম্বন্ধে যে ব্যাখ্যা উল্লিখিত হয়েছে তা' পারমার্থিক-বাদী ও আপেক্ষিকবাদী—যাঁরা রুচির পারমার্থিকতা স্বীকার করেন এবং যাঁরা অস্বীকার করেন—উভয়কেই একদিকে সমর্থন অন্যদিকে খণ্ডন করে।

সুন্দরের মূল্যবিচার সম্ভব একথা বলে, পারমার্থিকবাদীরা ঠিক কথাই বলেন, কিন্তু যে তত্ত্বের ভিত্তির উপরে তাঁরা তাঁদের সিদ্ধান্তকে দাঁড় করান তা' মেনে নেওয়া যায় না, কারণ তাঁরা সুন্দরকে অর্থাৎ শৈল্পিক মূল্যকে শৈল্পিক ক্রিয়া-বহির্ভূত কোন বস্তু বলে—শিল্পী যে ধারণা বা বস্তু-আদর্শকে রূপায়িত করেন এবং যার সঙ্গে তুলনা ক'রে সমালোচকরা বিচার-কার্য সমাধা করেন সেইরূপ কোন ধারণা বা বস্তু-আদর্শ বলে—মনে করেন। শিল্পে এরূপ ধারণার বা বস্তু-আদর্শের কোন অস্তিত্ব নেই। কারণ একথা যখন বলা হয়েছে যে শিল্পকে শুধু শিল্পের আদর্শেই বিচার করা সম্ভব, তার আদর্শ তার নিজের মধ্যেই নিহিত তখন সঙ্গে সঙ্গেই সৌন্দর্যের বাস্তব আদর্শের অস্তিত্বকে—সে আদর্শ বৌদ্ধিক সংজ্ঞাই হোক, বা পরাতত্ত্বের-স্বর্গে-ঝুলে-থাকা ভাবাদর্শই হোক—অস্বীকার করা হয়েছে।

এই যুক্তি দেখিয়ে প্রতিপক্ষ আপেক্ষিকবাদীরা ঠিক কাজই করেছেন এবং পারমার্থিকবাদীদের চেয়ে বেশ খানিকটা এগিয়ে গেছেন। কিন্তু গেলে কি হবে?—তাঁদের প্রতিপাদ্যের প্রারম্ভিক যুক্তিযুক্ততা শেষ পর্যন্ত মিথ্যা মতবাদে পরিণত হয়েছে।

রুচির কোন ধরা-বাঁধা নিয়ম নেই—এই পুরাতন কথার পুনরাবৃত্তি করেন তাঁরা এবং বিশ্বাস করেন যে শৈল্পিক প্রকাশন সর্বজনস্বীকৃত আনন্দ-বেদনার মতোই ব্যক্তি-অনুভবগম্য বিষয়। কিন্তু আমরা জানি—আনন্দদায়ক এবং বেদনাদায়ক উপযোগ আশ্রয়ী, কর্মাত্মক বিষয়। এইভাবে আপেক্ষিকবাদীরা শৈল্পিক বস্তুর বিশেষত্বকে অস্বীকার করে এবং প্রকাশনকে প্রত্যয়ের সঙ্গে, জ্ঞানাত্মিকা ক্রিয়াকে কর্মাত্মিকা ক্রিয়ার সঙ্গে গুলিয়ে ফেলেন।

প্রকৃত সমাধান নিহিত রয়েছে—আপেক্ষিক-বাদ এবং মিথ্যা পারমার্থিক-বাদ, উভয়কেই অস্বীকার করার মধ্যে এবং রুচির মানদণ্ড যে পারমার্থিক —অবশ্য বিকল্পাত্মক বুদ্ধির পারমার্থিকতা থেকে স্বতন্ত্র এই পারমার্থিকতা—এই কথা স্বীকার করার মধ্যে। রুচির মানদণ্ড পারমার্থিক—কল্পনার প্রাতিভানিক পারমার্থিকতা সম্ভব বলেই পারমার্থিক। সুতরাং যে প্রকাশন-ক্রিয়া প্রকাশন-ক্রিয়া হিসাবে সার্থক, তাকে সুন্দর বলেই গণ্য করতে হবে এবং যে ক্রিয়ায় প্রকাশন-ক্রিয়ার এবং জড়তার পারস্পরিক দ্বন্দ্বের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি ঘটে না, সেই ক্রিয়া কুৎসিত।

* * * পারমার্থিকবাদীর এবং আপেক্ষিকবাদীর মধ্যবর্তী তৃতীয় একটি শ্রেণী আছে, তাকে বলা চলে—সাপেক্ষ আপেক্ষিকবাদী (রিলেটিভ রিলেটিভিস্ট)। এঁরা ন্যায়শাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র প্রভৃতি ক্ষেত্রে পারমার্থিক মূল্যের অস্তিত্ব স্বীকার করেন বটে, কিন্তু শিল্পশাস্ত্রের ক্ষেত্রে ঐ মূল্যকে অস্বীকার করেন। বিজ্ঞান বা নীতি নিয়ে বাদবিতণ্ডা করা তাঁদের কাছে যুক্তিযুক্ত ও সমর্থনযোগ্য কাজ, কারণ বিজ্ঞান সার্বজনীন সত্যের উপর দাঁড়িয়ে আছে এবং নীতি দাঁড়িয়ে আছে কর্তব্যের উপরে—মনুষ্যস্বভাবের নিয়মের উপরে। কিন্তু যার ভিত্তি হচ্ছে কল্পনা সেই শিল্প নিয়ে বাদ-বিচার হবে কি করে? কিন্তু কথা হচ্ছে—কল্পনা-ক্রিয়া, নৈয়ায়িক সংজ্ঞা ও কর্তব্য কর্ম থেকে কম সার্বজনীন

কম মনুষ্যস্বভাবনিহিত নয়। তা'ছাড়াও প্রস্তাবের বিরুদ্ধে প্রাথমিক আপত্তি রয়েছে। কল্পনার পারমার্থিকতা অস্বীকার করলে, আমরা বৌদ্ধিক বা সংজ্ঞাত্মক সত্যকে তথা নীতিকেও অস্বীকার করব। নৈয়ায়িক বিচার বিবেচনা বাদ দিয়ে নীতির অস্তিত্ব কোথায়? প্রকাশে বা শব্দে ছাড়া অর্থাৎ কল্পনার রূপে ছাড়া আর কিভাবে তাদের জানা সম্ভব? কল্পনার পারমার্থিকতা বাদ দিলে, আত্মার জীবনের ভিত্তর পর্যন্ত কেঁপে উঠবে। এক ব্যক্তি আর অন্য ব্যক্তির কথা বুঝবে না, যে সত্তা পরমুহূর্তের তুলনায় ভিন্ন সত্তা সে নিজেরই পূর্ব মুহূর্তের সত্তাকে চিনতে পারবে না।

অবশ্য, বিচারে মতভেদ ঘটে—এ অনস্বীকার্য। নৈয়ায়িক, নৈতিক এবং আর্থনৈতিক মূল্যায়নে মানুষের মধ্যে যেমন মতভেদ ঘটে, শৈল্পিক মূল্যায়নেও তেমনি—বা তদপেক্ষা বেশী—মতভেদ ঘটে থাকে। যে কয়টি কারণ পূর্বেই আমরা উল্লেখ করেছি—যেমন ত্বরা, কুসংস্কার, আবেগ, রাগদ্বেষ প্রভৃতি, তারা অবশ্য এই মতভেদের মাত্রা কমিয়ে দিতে পারে বটে, কিন্তু মতভেদকে একেবারে বন্ধ করতে পারে না। পুনঃসৃজনের উদ্দীপক সম্বন্ধে আলোচনা করবার সময় আমরা একটি সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছি—বলেছি যে অন্যান্য সব অবস্থা এক রূপ থাকলেই তবে পুনঃসৃজন সম্ভব হয়। অবস্থা এক রূপ থাকে কি? বাস্তবের সঙ্গে প্রকল্পের (হাইপোথিসিস) মিল হয় কি?

মনে হয়, হয় না। উপযুক্ত বস্তু-উদ্দীপক দ্বারা একটি সংবিদকে বহুবার জাগাতে হলে যেমন উদ্দীপককে অপরিবর্তিত রাখা চাই, তেমনি যে অবস্থায় মনে ঐ সংবিদ প্রথম জেগেছিল, সেই একই অবস্থায় মনকে রাখা চাই। বলা বাহুল্য, বস্তু-উদ্দীপক অবিরাম পরিবর্তিত হচ্ছে তেমনি ভাবেই পরিবর্তিত হচ্ছে মানসিক অবস্থা।

তৈলচিত্র কালো হয়ে যায়, দেওয়ালের কাঁচা জমাটের উপর উৎকীর্ণ চিত্র (ফ্রেস্কো) মিলিয়ে যায়, মূর্তির নাক হাত পা ভেঙ্গে যায়, স্থাপত্য-কর্ম সম্পূর্ণত বা অংশতঃ ধ্বংস হয়ে যায়, সংগীতের প্রথা হারিয়ে যায়, কাব্যের পাঠ মন্দ লিপিকারের বা মুদ্রাকরের হাতে পড়ে বিকৃত হয়। শিল্পবস্তুতে বা বস্তুর উদ্দীপকে দৈনন্দিন পরিবর্তন ঘটছে—এ তারই অতি স্পষ্ট দৃষ্টান্ত। মানসিক

অবস্থার সম্বন্ধে বলতে যেয়ে, আমরা বধির বা অন্ধদের কথা অর্থাৎ ইন্দ্রিয়হানিজনিত প্রত্যয়ের সামগ্রিক অভাবের কথা তুলব না, কারণ আমাদের চারিপাশের সমাজে এবং ব্যক্তি-জীবনের ভিতরে প্রতিদিন যে অবিরাম, অনিবার্য এবং মৌলিক পরিবর্তন ঘটে চলেছে তার তুলনায় ঐগুলি অপেক্ষাকৃত গৌণ। দান্তের 'কমেডিয়া'র ছন্দ ও ধ্বনিগত অভিব্যক্তি বা শব্দগুলি, কবির নিকট-সমসাময়িকের কাছে যে আবেদন সৃষ্টি করেছিল, তৃতীয় রোমের রাজনীতি-মনা নাগরিকের কাছে সেই আবেদন সৃষ্টি করবে না; ভিন্ন আবেদন সৃষ্টি করবে। 'সান্টা মেরিয়া নোভেলা'র গীর্জায়; এখনও 'কিমাবু'র (Cimabue) 'ম্যাডোনা' মূর্তি রয়েছে; কিন্তু ত্রয়োদশ শতাব্দীর ফ্লোরেন্স-বাসীদের কাছে সে যতখানি আবেদন বহন করেছে, আজকের দর্শকের কাছে ততখানি করে কি? কাল যদি তাকে কালো করে নাও দিয়ে থাকে, তবু কি আমরা এ কথা মনে করি না যে আজ সে যে-আবেদন জাগাচ্ছে আগের যুগের আবেদন থেকে তা' ভিন্ন? এমন কি একই কবি, যৌবনে রচিত কবিতাকে যখন তিনি বার্ধক্যের সম্পূর্ণ পরিবর্তিত মানসিক অবস্থায় পাঠ করেন, অতীতের সেই আস্বাদ পান কি?

* * একথা সত্য যে কোন কোন শিল্পতত্ত্ববিদ্ উদ্দীপক বস্তুকে—প্রাকৃত এবং প্রথাসম্মত বা সাংকেতিক চিহ্ন এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করতে চেষ্টা করেছেন।

প্রথমটির অর্থাৎ প্রাকৃতটির আবেদন সার্বজনীন, দ্বিতীয়টির আবেদন বিশিষ্ট গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ। তাঁদের মতে, চিত্রে যে চিহ্ন ব্যবহৃত হয় তা' প্রাকৃত, আর কাব্যে যা' ব্যবহৃত হয় তা' প্রথাকৃত। তাদের মধ্যে যে পার্থক্য তা' বড় জোর মাত্রাগত পার্থক্য। অনেক সময়েই এ কথা বলা হয়েছে যে, চিত্রের ভাষা সকলেই বুঝতে পারে, কবিতার ভাষা বুঝে অতি অল্পলোকেই। এখানেই, লিওনার্ডো চিত্রশিল্পের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে বড় একটা প্রমাণ খুঁজে পেয়েছিলেন—দেখেছিলেন, তাঁর শিল্পের ব্যাখ্যার জন্য কাব্যের মতো বহু ভাষাভাষী সমালোচকের প্রয়োজন নেই। পশু ও মানুষকে তাঁর শিল্প সমান ভাবে আনন্দ দেয়। কোন এক গৃহকর্তার চিত্র সম্বন্ধে যে গল্পটি আছে সেই

গল্পটি তিনি বলেছেন —বলেছেন—"চিত্রটিকে দেখে অতি শিশু পৌত্র-পৌত্রীরা এবং বাড়ীর কুকুর ও বিড়াল একইভাবে আদর দেখিয়েছে।" আবার অন্যান্য গল্পও আছে—যেমন সেই বন্যদের গল্প যারা সৈনিকের ছবিকে 'নৌকা' বলে মনে করেছিল বা অশ্বারূঢ় ব্যক্তির ছবি দেখে, লোকটিকে একপদযুক্ত বলে মনে করেছিল—যে-সব গল্প শুনে, দুগ্ধপোষ্য শিশু, বিড়াল-কুকুরেও চিত্রের ভাষা বুঝতে পারে—এ বিশ্বাস ভেঙ্গে যাবে। সৌভাগ্যেরই কথা যে, চিত্র, কবিতা, প্রভৃতি শিল্পকর্ম শুধু গ্রহণোন্মুখ মনের কাছেই আবেদন সৃষ্টি করে—এ কথা প্রমাণ করতে কোন দুঃসাধ্য গবেষণার প্রয়োজন নেই। প্রাকৃত চিহ্ন বলে কোন কিছু নেই, কারণ সব কিছুই প্রথাকৃত বা আরো নির্দিষ্টভাবে বললে —ইতিহাস-নিয়ন্ত্রিত।

এ কথা স্বীকার করা গেল বটে কিন্তু প্রাকৃত বস্তুর সাহায্যে প্রকাশনের পুনঃসৃষ্টি করা যাবে কি করে? অবস্থা যেখানে এক নয়, সেখানে একই আবেদন জাগানো সম্ভব হবে কি করে? বরং এই সিদ্ধান্ত করাই কি সমীচীন হবে না যে, বস্তুরূপ তৈরি করা সত্ত্বেও প্রকাশনকে পুনঃসৃষ্টি করা সম্ভব নয় এবং যাকে পুনঃসৃষ্টি বলা হয় তা' আসলে সম্পূর্ণ নতুন প্রকাশনই? বাহ্যিক পরিস্থিতির এবং মানসিক অবস্থার বৈচিত্র্য বা পার্থক্য মূলতঃ অলঙ্ঘনীয় হলেও ঐরূপ সিদ্ধান্তই অনিবার্য হতো। কিন্তু, যেহেতু এই অলঙ্ঘনীয়তার মধ্যে অপরিহার্যত্বের কোন বৈশিষ্ট্য নেই, সেইহেতু আমরা এই সিদ্ধান্তই করব যে, যখন আমরা যে অবস্থায় উদ্দীপক (সুন্দর বস্তুটি) নির্মিত হয়েছিল সেই অবস্থায় নিজেদের স্থাপনা করতে পারব তখন পুনঃসৃষ্টি হবেই।

আমরা যে শুধু ঐরূপ কোন আদর্শ অবস্থায় নিজেদের স্থাপন করিতে পারি তাই নয়, আসলে অবিরাম আমরা তা' করেই থাকি। অন্যথা, ব্যক্তি-জীবনে —যা আমাদের অতীত সত্তার সঙ্গে সম্মিলন এবং সামাজিক জীবন যা' আমাদেরই মতো দশজনের সঙ্গে মিলন, সম্ভব হতো না।

* * * প্রাকৃত বস্তুটি বা শিল্পপদার্থটি সম্বন্ধে বলা যায়, প্রত্নলিপিবিদ্ এবং ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণ যাঁরা মূল লিপি উদ্ধার করার চেষ্টা করেন,—চিত্র ও মূর্তি উদ্ধারক এবং অন্যান্য শ্রমশীল প্রত্নসন্ধানীরা শিল্পবস্তুটিকে যথাযথভাবে রক্ষা

করতে যা তার পুরাতন দিনের সজীবতা বা ঔজ্জ্বল্য রক্ষা করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করে থাকেন। অবশ্যই, চেষ্টা সর্বদা এবং সম্পূর্ণ সফল হয় না; কারণ, খুঁটিনাটি সব বিষয়ের সংস্কারসহ সম্পূর্ণ উদ্ধার সম্ভব নয় বা কদাচিৎ সম্ভব হয়। তবে অলঙ্ঘনীয়তা এখানে আকস্মিক (আবশ্যিক নয়) এবং তা' যেন আমাদের অর্জিত সাফল্যকে উপলব্ধি করতে নিরুৎসাহিত না করে।

ঐতিহাসিক ব্যাখ্যার বা সমালোচনার কাজ এই যে ইতিহাসের ক্রম-গতিতে মানসিক অবস্থার যে পরিবর্তন ঘটেছে, তাকে সে পুনরন্বিত বা পুনর্গঠিত করতে চেষ্টা করে। সে মৃতকে পুনর্জীবিত করে, খণ্ডিতকে সমগ্র করে এবং সৃষ্টিমুহূর্তে স্রষ্টা তার সৃষ্ট বস্তুকে যে রূপে দেখেছিলেন, সেই রূপটিকে দেখতে সমর্থ করে।

ঐতিহ্যের ধারা যেখানে বিচ্ছিন্ন, সেখানে সমালোচনাও ব্যাহত। সেক্ষেত্রে অতীতের সৃষ্টি আমাদের কাছে মূকের মতো দাঁড়িয়ে থাকে। তাই তো এট্রুসকান বা মেক্‌সিকান শিলালিপির বাণী অনধিগম্য. তাই আজও প্রত্ন-লিপিবিদ্‌রা, আদিম জাতির কতকগুলি শিল্পবস্তুকে ছবি অথবা লেখা বলে গণ্য করা হবে কিনা, তা নিশ্চিতভাবে বুঝতে পারছেনা; প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌ এবং প্রাগৈতি-হাসিক ইতিহাস-বিশেষজ্ঞরা ঠিকভাবে বলতে পারছেন না—বিশেষ প্রদেশের মৃৎশিল্পের এবং অন্যান্য জিনিসের গায়ে যে-সব মূর্তি পাওয়া গেছে, তাদের উৎপত্তির মূলে ধর্মের বা অন্য কোন প্রেরণা কাজ করছে কি না।

কিন্তু সমালোচনার এবং উদ্ধার-কার্যের ব্যাঘাত কখনই অলঙ্ঘনীয় কোন বাধা নয়। প্রতিদিন যে সব নতুন নতুন ঐতিহাসিক উৎস আবিষ্কৃত হচ্ছে এবং পুরাতন আবিষ্কারকে প্রয়োগ করার নতুন নতুন যে সব পদ্ধতি দেখা দিচ্ছে এবং আশা করি যাদের আরো উন্নতি হতে থাকবে, ঐতিহ্যের বিচ্ছিন্ন ধারাকে তারা আবার যুক্ত করে দেবে।

এ অবশ্য অস্বীকার করিনে যে অনেক সময় ভুল ঐতিহাসিক সমালোচনায় —যাকে বলা হয় "palimsests"—পুরাতনের উপরে নতুন রূপের আরোপ— ইতিহাসের পুনরুস্থাপনের পরিবর্তে—শৈল্পিক উৎকল্পনা দেখা দেয়। ঐতিহাসিক ঘটনার বা বস্তুর সঙ্গে কল্পনা জুড়ে আমরা যে-সব মূর্তি তৈরি

করি তাঁদের উপরেই, আমাদের তথাকথিত অতীত মোহ নির্ভর করে। এই কারণেই গ্রীক মূর্তিশিল্পের মধ্যে সেই সমস্ত লোকের শান্ত সমাহিত ভাব আবিষ্কার করা হয়েছে, যারা কোনদিনই সার্বজনীন লোককে অতো গভীর ভাবে উপলব্ধি করেনি, বাইজেন্তিয়ার সন্তদের মুখে সম্প্রতি "১০০০ অব্দের আতঙ্ক" আরোপ করা হয়েছে—এই আতঙ্ক একটি ভুল কল্পনা অথবা পণ্ডিতদের দ্বারা পরবর্তীকালে কল্পিত একটি মিথ্যা কাহিনী। ঐতিহাসিক সমালোচনার উদ্দেশ্য—উৎকল্পনাকে সংযত করা এবং উপযুক্ত দৃষ্টিকোণ গঠন করা।

উল্লিখিত প্রক্রিয়ার সাহায্যে আমরা বর্তমান এবং অতীত কালের মানুষের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে থাকি। এবং যেহেতু কোন কোন সময় বা অনেক সময় আমরা অপরিচিত বা অস্পষ্ট-পরিচিতের দেখা-সাক্ষাৎ পাই, সেই হেতু এ সিদ্ধান্ত করব না যে যখন আমরা অপরের সঙ্গে কথাবার্তা বলছি বলে মনে করছি, তখন আমরা একা একাই কথা বলছি, অথবা মনে মনে আমরা আগে যে কথা বলেছিলাম সে কথাগুলির পুনরাবৃত্তি করতে আমরা অক্ষম।

সপ্তদশ অধ্যায়

সাহিত্যের ও শিল্পের ইতিহাস

এই অধ্যায়ে ক্রোচের আলোচ্য বিষয় :—

(ক) সাহিত্যে ও শিল্পে ঐতিহাসিক সমালোচনা ও তার গুরুত্ব।

(খ) সাহিত্যিক ও শৈল্পিক ইতিহাস—ঐতিহাসিক সমালোচনা ও শৈল্পিক রসবিচারের সঙ্গে তার পার্থক্য।

(গ) সাহিত্যিক ও শৈল্পিক ইতিহাসের পদ্ধতি

(ঘ) 'শিল্পের উৎপত্তি'-সমস্যার সমালোচনা

(ঙ) প্রগতির ও ইতিহাসের মানদণ্ড

(চ) সাহিত্যিক ও শৈল্পিক ইতিহাসে প্রগতির একটিমাত্র ধারা নেই

(ছ) ঐ সূত্র না মানার ফলে কি কি ভুল হয়

(জ) শিল্পশাস্ত্রে 'প্রগতি' শব্দের অন্যান্য অর্থ।

* * * যে অবস্থায় শিল্পটি প্রথম সৃষ্ট হয়েছিল সেই মূল অবস্থাটিকে যে উপায়ে পুনর্গঠিত বা পুনর্গ্রথিত করা যায় অর্থাৎ যে উপায়ে পুনরুপস্থাপন ও বিচার সম্ভব নয়, তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হয়েছে এবং তা' থেকেই বুঝা যায়, শিল্প ও সাহিত্যকর্মের সম্পর্কে ঐতিহাসিক গবেষণা—ঐতিহাসিক সমালোচনা বা 'শিল্প-সাহিত্যের পদ্ধতি' যাকে সাধারণতঃ বলা হয়—কত গুরুত্বপূর্ণ।

ঐতিহ্য এবং ঐতিহাসিক সমালোচনা ব্যতিরেকে মানুষের তৈরি শিল্পকর্মসমূহের রসাস্বাদন কিছুতেই সম্ভব হতো না। আমরা স্বল্পোন্নত প্রাণিবিশেষে পরিণত হতাম, কেবলমাত্র বর্তমানের গণ্ডীতেই আমরা অতি-নিকট অতীতের গণ্ডীর মধ্যেই আবদ্ধ থাকতাম। যিনি মূল পাঠ উদ্ধার করবার চেষ্টা করেন, বিস্মৃত শব্দের ও আচারের অর্থ ব্যাখ্যা করেন, লেখকের জীবনযাপন-প্রণালী অনুসন্ধান করেন এবং শিল্পের মূল রূপ ও গুণ উদ্ধার করবার জন্য শ্রম করেন, তাঁকে উপহাস করা নির্বুদ্ধিতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

অনেক ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক গবেষণা শিল্পকর্মের যথার্থ পরিচয় দিতে পারে না বলে, ঐতিহাসিক সমালোচনাকে অনেক সময় নিন্দা বা নস্যাৎ করে দেওয়া হয়। কিন্তু এ কথা বলতেই হবে যে, ঐতিহাসিক গবেষণা শুধু শিল্পকর্মের পুনরুদ্ভবে এবং বিচারকার্যেই সাহায্য করে না, লেখকের বা শিল্পীর জীবনচরিত এবং যুগের আচার-বিচারের অনুসন্ধানের বা অধ্যয়নের নিজেরই একটা মূল্য আছে,—অর্থাৎ শিল্পের ইতিহাসে না থাকলেও, অন্যান্য ইতিহাসে আছে। যে সমস্ত গবেষণা আপাতত মূল্যহীন বা উদ্দেশ্যসাধক নয়, যদি, তাদের উল্লেখ করা হয়, তা'হ'লে উত্তরে বলা যায়—ইতিহাসের ছাত্রকে অনেক সময়েই তথ্যসংগ্রাহকের প্রয়োজনীয় অথচ অগৌরবের কাজ করতে হয়। এই তথ্যগুলি কিছুকাল এলোমেলো, অর্থহীন ও খাপছাড়া ভাবে থাকে বটে, কিন্তু তারা ভাবীকালের ঐতিহাসিকদের পক্ষে এবং যাঁরাই যে উদ্দেশ্যে তাদের ব্যবহার করতে চান তাঁদের পক্ষে—সঞ্চিত ধন বা আকর স্বরূপ। যেমন, গ্রন্থাগারে দেখা যায়, যে-সব বই কেউই চায় না তাদেরও তাকে সাজিয়ে রাখা হয়, তালিকাবদ্ধ করা হয়, কারণ কোন-না-কোন দিন কেউ হয়তো চাইতে পারে। অবশ্য বিচক্ষণ গ্রন্থাগারিক যেমন সেই সব গ্রন্থই সংগ্রহ ও তালিকাভুক্ত করেন যে সব গ্রন্থকে তিনি অধিকতর প্রয়োজনীয় বলে মনে করেন, তেমনি বুদ্ধিমান ছাত্র সহজ বুদ্ধিতেই সংগৃহীত তথ্যের কোন্‌টি প্রয়োজনীয় তা বুঝতে পারে। আর যারা কম বুদ্ধিমান, কম শক্তিমান এবং ক্ষিপ্রস্রষ্টা, তারা অপ্রয়োজনীয় জঞ্জাল এবং হঠাৎ সিদ্ধান্ত জড়ো করে তথ্যের অরণ্যে পথ হারিয়ে বসে এবং তুচ্ছ আলোচনায় শক্তিক্ষয় করে। কিন্তু এ হ'ল গবেষণা-সংযমের কথা এবং এর সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। যদি কোন সম্পর্ক থেকে থাকে তা' আছে সেই সব শিক্ষকদের সঙ্গে যাঁরা বিষয়বস্তু নির্বাচন করেন, সেই সব প্রকাশকের সঙ্গে, যাঁরা ছাপানোর খরচ বহন করেন এবং সেই সব সমালোচকের সঙ্গে, যাঁদের ডাক পড়ে গবেষকদের নিন্দা বা প্রশংসা করবার জন্য।

অন্যপক্ষে, এও খুব পরিষ্কার যে শিল্পকর্মকে আলোকিত করবার জন্য ব্যবহৃত ঐতিহাসিক গবেষণা আমাদের মনের মধ্যে শিল্পের রূপটিকে পুনরু-

দ্বোধিত করতে এবং শিল্পটিকে বিচার করবার শক্তি দিতে পারে না; সে শুধু পারে রুচিকে অর্থাৎ সতর্ক ও অনুশীলিত কল্পনাকে প্রস্তুত করতে। সর্বোৎকৃষ্ট ইতিহাস-পাণ্ডিত্যের সঙ্গে স্থূল বা বিকৃত রুচি, মন্থর কল্পনা বা লোকে যাকে বলে—শীতল নীরস শিল্পবিমুখ হৃদয়—থাকতে পারে। বিকৃত রুচি-সহ মহাপাণ্ডিত্য এবং অশিক্ষিত পটুত্ব—এ দুয়ের মধ্যে কোন্‌টি কম ক্ষতিকর? প্রশ্নটি বহুবার করা হয়েছে এবং এই কথা বললেই ভালো হবে যে প্রশ্নটি অর্থহীন, কারণ দুয়ের মধ্যে কোন্‌টি কম ক্ষতিকর—এর উত্তর কেউই দিতে পারেন না তেমনি কেউই বলতে পারেন না—তার যথার্থ তাৎপর্য কি। যিনি শুধুই শিক্ষিত, তিনি কখনই মহান শিল্পীর আত্মার সঙ্গে একাত্মক বা সহৃদয় হতে পারেন না, তিনি প্রাসাদের বহিঃকক্ষে সোপান শ্রেণীর কাছে এবং বহিরঙ্গনেই বিচরণ করেন, আর যিনি অশিক্ষিতপটু সহৃদয় তাঁর কাছে মহান শিল্পকর্মগুলি হয় অনধিগম্য হয়ে থাকে, নতুবা শিল্পকর্মের স্বরূপটি ধরতে না পেরে, কল্পনা দিয়ে তার মধ্যে তিনি নতুন কিছু আবিষ্কার করেন। প্রথম জনের পরিশ্রম অন্ততঃ অন্যকে আলোক দিতে পারে, কিন্তু দ্বিতীয় জনের প্রতিভা জ্ঞানদান বিষয়ে সম্পূর্ণ বন্ধ্যা। এরূপ অবস্থায়, যে অশিক্ষিত-পটু ব্যক্তি ভুল ধারণাতেই তার তন্ময়ীভবন শক্তিকে নিযুক্ত করে আছে, তাকে পছন্দ না করে, শিক্ষিত-অপটু ব্যক্তিকে বেশী পছন্দ করা ছাড়া উপায় কি?

* * * যে সব ঐতিহাসিক অধ্যবসায়ে শিল্পকর্মগুলিকে অবান্তর প্রয়োজনে (জীবন চরিত, সামাজিক, ধর্মনৈতিক এবং রাজনৈতিক ইতিহাস প্রভৃতি) ব্যবহার করা হয় তা' থেকে এবং শিল্পরূপের পুনরুদ্বোধনের প্রস্তুতিকল্পে যে ঐতিহাসিক পাণ্ডিত্য নিযুক্ত করা হয়—তা' থেকে, শিল্পের ও সাহিত্যের ইতিহাসকে সুনির্দিষ্টভাবে পৃথক করতে হবে।

প্রথম দু'টির পার্থক্য সুস্পষ্ট। শিল্প-সাহিত্যের ইতিহাসে উপজীব্য হচ্ছে—স্বয়ং শিল্পকর্মগুলি। আর অন্যান্য ঐতিহাসিক চেষ্টায়, শিল্পকর্মগুলিকে আহ্বান ও প্রশ্ন করা হয় সাক্ষী হিসাবে এবং অশৈল্পিক সত্য আবিষ্কারের উদ্দেশ্যে। উল্লিখিত দ্বিতীয় পার্থক্য কম গভীর বলে মনে হতে পারে,

কিন্তু আসলে খুবই গভীর। শিল্পকর্মকে সম্যক বুঝবার জন্য যে ঐতিহাসিক পাণ্ডিত্য প্রয়োগ করা হয়, তার উদ্দেশ্য একটি আভ্যন্তরিক ঘটনা—শৈল্পিক পুনরুদ্বোধন ঘটানো; অন্যপক্ষে শিল্প-সাহিত্যের ইতিহাস, ঐরূপ পুনরুদ্বোধন না ঘটা পর্যন্ত সম্ভবই নয়। অতএব তা' অতিরিক্ত একটা শ্রম-পর্যায়।

অন্যান্য ইতিহাসের মতো, শিল্প-সাহিত্যের ইতিহাসের উদ্দেশ্য—যে সব ঘটনা সত্যই ঘটেছে—এক্ষেত্রে শৈল্পিক বা সাহিত্যিক ঘটনা—তাদের যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করা। যথেষ্ট ঐতিহাসিক পাণ্ডিত্য অর্জন করার পরেও যে ব্যক্তি শিল্পরূপটিকে মনের মধ্যে পুনঃপ্রতিভাত করেন তথা আস্বাদন করেন, তিনি শুধু রুচিমান ব্যক্তিরূপেই থেকে যেতে পারেন, অথবা তার আবেগকে তিনি নিন্দা বা প্রশংসাসূচক ধ্বনিতে ব্যক্ত করেই ক্ষান্ত হতে পারেন। শিল্প-সাহিত্যের ইতিহাস-লেখক হওয়ার পক্ষে এইটুকুই যথেষ্ট নয়। আরো কিছু চাই,—চাই পুনর্ভানের পরে নতুন একটি মানসিক ব্যাপার। এই নতুন মানসিক ব্যাপারটি আসলে প্রকাশনই—পুনর্ভানের প্রকাশন, ঐতিহাসিক বিবরণ, ব্যক্তীকরণ বা পুনরুপস্থাপন। এই হ'ল, তা'হ'লে, রুচিমান ব্যক্তি ও ইতিহাসকারের পার্থক্য। প্রথম ব্যক্তি, তার মনের মধ্যে শিল্পকর্মটিকে শুধু পুনরুদ্বোধিত করে; দ্বিতীয় জন, পুনরুদ্বোধনের পরে, ঐতিহাসিক পৌর্বাপর্য রক্ষা করে তাদের উপস্থাপিত করে অথবা বিশুদ্ধ শিল্প থেকে ইতিহাস যে কারণে পৃথক, সেই কারণ বা নিয়মটিকে প্রয়োগ করে। অতএব শিল্প-সাহিত্যের ইতিহাস হচ্ছে—এক বা একাধিক শিল্পকর্মের উপরে প্রতিষ্ঠিত ঐতিহাসিক শিল্প।

'শিল্প-সমালোচক' বা 'সাহিত্য-সমালোচক' শব্দটি নানা অর্থে ব্যবহৃত হয়। কখনো কখনো শিল্প-সমালোচক বলতে বুঝায়, সেই পণ্ডিত ব্যক্তিকে যিনি সাহিত্যের সেবায় নিজেকে নিযুক্ত করেন, কখনো কখনো বুঝায় ঐতিহাসিককে যিনি অতীত শিল্পের বিবরণ দেন এবং অনেক সময় উভয়কেই বুঝায়।

'সমালোচক' বলতে সংকীর্ণ অর্থে বুঝায়—তাঁকে যিনি সমসাময়িক সাহিত্য কর্মের পরিচয় দেন এবং মূল্য বিচার করেন এবং ইতিহাসকার বলতে বুঝায়

তাঁকে যিনি অসাম্প্রতিক অর্থাৎ অতীত সাহিত্যকর্মের পরিচয় দেন। এগুলি ভাষাব্যবহার মাত্র এবং বহিরঙ্গ পার্থক্য—অতএব উপেক্ষণীয় ; কারণ আসল পার্থক্য রয়েছে—"পণ্ডিত", "রুচিমান সহৃদয়" এবং "শিল্প-ইতিহাসকারে"র মধ্যে। এই শব্দগুলি তিনটি ক্রমপর্যায়ের দ্যোতক—এর প্রত্যেকটি পর্যায় পরবর্তী পর্যায় থেকে অপেক্ষাকৃত স্বাধীন ; কিন্তু পূর্ববর্তী পর্যায়ের সাপেক্ষ। আমরা দেখেছি—কোন ব্যক্তি শুধু বিদ্বান বা পণ্ডিত হতে পারে এবং শিল্পবোধ তাঁর নাও থাকতে পারে ; কোন ব্যক্তি একাধারে পণ্ডিত এবং সহৃদয় হতে পারেন, কিন্তু শিল্প ও সাহিত্যের ইতিহাসের একটি পৃষ্ঠাও না লিখতে পারেন। কিন্তু যিনি প্রকৃত ইতিহাসকার, তিনি একাধারে পণ্ডিত ও সহৃদয় তো হবেনই, অধিকন্তু হবেন ঐতিহাসিক বোধের এবং উপস্থাপনার অধিকারী।

* * * 'শিল্প-সাহিত্যের ঐতিহাসিক পদ্ধতি'-মতবাদটির (দি থিওরি অফ আর্টিস্টিক এ্যাণ্ড লিটারারি হিস্টোরিকাল মেথড্) মধ্যে এমন সব সমস্যা ও বাধা আছে, যার কতকগুলি ঐতিহাসিক পদ্ধতির সঙ্গে স্বাভাবিক যোগে যুক্ত, এবং কতকগুলি বিলক্ষণ, কারণ শিল্পের সংজ্ঞা থেকে ব্যুৎপন্ন।

* * * ইতিহাসকে সাধারণতঃ মানবের ইতিহাস, প্রকৃতির ইতিহাস এবং উভয়ের মিশ্র ইতিহাস, এই তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। এই বিভাগের যাথার্থ্যের প্রশ্নটি বিচার না করেও, এ কথা বলা যায় যে শিল্প সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত, কারণ, এ চৈতন্য-ক্রিয়ার ফল অর্থাৎ মানসিক ক্রিয়া। যেহেতু এই ক্রিয়াই এর বিষয়বস্তু, সেইহেতু শিল্পের উৎপত্তি বিষয়ে সমস্যার উত্থাপন নিরর্থক চেষ্টা। এ কথাও আমরা জানি যে এই কথাটি নানা সময়ে অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে। অনেক সময় "উৎপত্তি" বলতে বুঝিয়েছে—শৈল্পিক ব্যাপারের 'প্রকৃতি' বা 'বৈশিষ্ট্য' এবং সেক্ষেত্রে, প্রকৃত বৈজ্ঞানিক এবং এবং দার্শনিক সমস্যা নিয়েই—এই গ্রন্থে যে সমস্যার সমাধান করতে চেষ্টা করেছি সেই সমস্যা নিয়েই—আলোচনা করার চেষ্টা হয়েছে। অন্য সময়ে 'উৎপত্তি' বলতে বুঝিয়েছে—উৎপত্তির নিমিত্ত-কারণের অনুসন্ধান—সচ্চিন্ময় পরম সত্তা থেকে শিল্পের উৎপত্তি প্রমাণ করার চেষ্টা। এও অবশ্য দার্শনিক

সমস্যা, আগের সমস্যার পরিপূরক—বলা চলে আগের সমস্যারই অনুরূপ, যদিও কখনো কখনো কাল্পনিকপ্রায় খামখেয়ালী পরাতত্ত্বের সাহায্যে একে ব্যাখ্যা করবার এবং সমাধান করবার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু যখনই শিল্পোৎপত্তির ইতিহাসকে একটু তলিয়ে দেখতে যাওয়া হয়েছে, তখনই ফল হয়েছে এই যে, যে ভুলের কথা আগে বলেছি, সেই ভুল করা হয়েছে।

প্রকাশনকে আমরা যদি চৈতন্যের প্রথম রূপ বলে স্বীকার করি, তা হ'লে যে বস্তু প্রকৃতির সৃষ্টি নয় এবং যা' মানুষেরই ইতিহাসের সঙ্গে জড়িত, তার ঐতিহাসিক উৎপত্তি খুঁজব কি করে? যে বস্তুকে মৌল ভিত্তি করে সমস্ত ঐতিহাসিক ব্যাপার ও ঘটনাকে জানা হয়, তার ঐতিহাসিক উৎপত্তি কি করে কল্পনা করব? মানুষের যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান ইতিহাসের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে গড়ে উঠেছে, বিলুপ্ত হয়ে গেছে এবং কালক্রমে বিলুপ্ত হয়ে যেতে পারে, সেই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তুলনা করতে যেয়েই এই ভুল দেখা দিয়েছে। শৈল্পিক ব্যাপার এবং মানব-প্রতিষ্ঠানের (মধ্যে যেমন এক বিবাহ-প্রথা বা জায়গীর প্রথার মধ্যে) যে পার্থক্য তাকে রসায়নের সরল ও যৌগিক পদার্থের পার্থক্যের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। প্রথমটির গঠন কি করে হয় তা' নির্দেশ করা অসম্ভব—কারণ নির্দেশ করতে পারলে তাকে আর 'সরল' বলা চলবে না, সে তখন আর সরল থাকবে না, 'যৌগিক' হয়ে যাবে।

শিল্পোৎপত্তি-সমস্যাকে ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে, তখনই শুধু স্বীকার করা যাবে, যখন তার উদ্দেশ্য হবে, শিল্পরূপের গঠন সম্বন্ধে গবেষণা নয়,কোথায়, কবে পৃথিবীর কোন্ দেশে, কোন যুগে প্রথম শিল্পের উদ্ভব ঘটেছে এই গবেষণা করা, অর্থাৎ, শিল্পের জন্ম নয়, শিল্পের আদিম ইতিহাস তার গবেষণার বিষয় হবে।

এই সমস্যা পৃথিবীতে মানব-সভ্যতার উদ্ভবের সমস্যার সঙ্গে এক হয়ে আছে। সমাধানের জন্য যে সব তথ্য আবশ্যক, তা' আমাদের হাতে না থাকলেও, সমাধানের সম্ভাবনা আমরা কল্পনা করতে পারি এবং গ্রহণযোগ্য এবং অনুমান-প্রমাণ সমাধান অবশ্যই অনেক আছে।

* * * * * প্রগতির (প্রোগ্রেস) ধারণাকে ভিত্তি করেই মানব-ইতিহাস

গড়ে উঠেছে। কিন্তু প্রগতি বলতে আমরা তেমন কোন কাল্পনিক প্রগতি সূত্রে বুঝব না, যা অদম্য শক্তিবলে এক যুগের মানুষকে অজ্ঞাত লক্ষ্যের অভিমুখে চালিত করে নিয়ে যাচ্ছে এবং নিয়ে যাচ্ছে সেই দৈব বিধান অনুসারে যাকে আমরা প্রথম সহজ উপলব্ধিতে পাই, পরে সবিকল্পক জ্ঞানে লাভ করি। এরূপ কোন সূত্রের কল্পনা—ইতিহাসের অস্তিত্বেরই অস্বীকার—নির্বিশেষ সূত্র থেকে বাস্তব ঘটনাকে যে যে ধর্ম পৃথক করে সেই, আকস্মিকতা সম্ভাবত্তা এবং অনিশ্চিতত্বই অস্বীকার করা। এই একই কারণে প্রগতির সঙ্গে ক্রমবিবর্তন-সূত্রের কোন সম্পর্ক নেই—যদি ক্রমবিবর্তন বলতে এই বুঝায় যে প্রকৃতি বা বস্তুসত্তা (রিয়েলিটি) বিবর্তিত হচ্ছে (বিবর্তিত হচ্ছে বলেই বস্তুসত্তা), তা' হ'লে তাকে 'সূত্র' (ল) বলা চলবে না, আর যদি সূত্র বলেই ধরা হয় তা' হ'লে—যে অর্থে 'প্রগতি-সূত্র'কে গ্রহণ করা হয়েছে, সেই অর্থের সঙ্গে একার্থক।

এখানে আমরা যে প্রগতির কথা বলছি—মানবিক ক্রিয়ার ধারণা ছাড়া তা' আর কিছুই নয়। তা' প্রকৃতিপ্রদত্ত বস্তু নিয়ে কাজ করে, তার প্রয়োগ বাধা অপসারিত করে এবং নিজের প্রয়োজনের উপযোগী করে তোলে।

প্রগতির অর্থাৎ বিশেষ কোন বস্তুতে মানবিক ক্রিয়া-প্রয়োগের এরূপ ধারণা, মানব-ইতিহাস রচয়িতার বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী। অসম্বদ্ধ ঘটনার নিছক সংগ্রাহক—নিছক অতীতবস্তু-সঞ্চয়ী বা বেহিসাবী বিশ্লেষক ছাড়া আর কেউই মানুষের কাব্যের অতিক্ষুদ্র অংশের বিবরণ দিতে যায় না—যদি না তাঁর নিজের কোন নির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী থাকে, অর্থাৎ যে ঘটনার ইতিহাস বিবৃত করতে তিনি চান, তার সম্বন্ধে তাঁর ব্যক্তিগত কোন বিশ্বাস থাকে। এলোমেলো ও একাকার ঘটনা যে নির্দিষ্ট আকারে সাজাতে পারে, সেই মনোনয়ন (এপারসেপ্‌শান) ব্যাপারটি ছাড়া কেউই এলোমেলো ও অসমঞ্জস ঘটনাপিণ্ড থেকে ইতিহাস-রূপ শিল্পকর্মে পৌঁছতে পারে না। ক্রিয়াত্মক কর্মের ইতিহাসকারকে—অর্থনীতি কি এবং নীতি কি তা জানতে হবে; গণিতের ইতিহাস-রচয়িতাকে জানতে হবে—গণিত কাকে বলে, উদ্ভিদতত্ত্বের কি, দর্শনের ইতিহাসকারকে—উদ্ভিদ্‌তত্ত্ব ইতিহাসকারকে দর্শন কি, তা' জানতে হবে।

এই সব বিষয়কে তিনি যদি যথার্থত না-ও জানেন, অন্ততঃ জানেন বলে অভিমান তাঁকে রাখতে হবে। তা' না রাখলে, তিনি যে ইতিহাস লিখছেন এ বিশ্বাসে নিজেকে আশ্বস্ত রাখতে পারবেন না।

মানুষের কাজের ও ঘটনার প্রত্যেকটি বর্ণনায় ব্যক্তিগত অনুরঞ্জন যে অবশ্যম্ভাবী (বাস্তব ঘটনার তথ্য উপস্থাপনায়, বস্তুর স্বরূপরক্ষা, অপক্ষপতিত্ব এবং সুবিবেচনার সঙ্গে এর কোন বিরোধ নেই) তা' সবিস্তারে প্রমাণ করবার কোন প্রয়োজন নেই। যে কোন ইতিহাসে গ্রন্থ পড়লেই সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থকারের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যাবে—অবশ্য তিনি যদি যথার্থ ঐতিহাসিক হন এবং তাঁর নিজের কর্তব্য সম্বন্ধে অবহিত থাকেন। রাজনৈতিক বা সামাজিক ইতিহাস যাঁরা লেখেন তাঁদের কেউ বা উদার, কেউ বা প্রতিক্রিয়াশীল, কেউ যুক্তিবাদী, কেউ গোঁড়া ; যাঁরা দর্শনের ইতিহাস লিখেছেন তাঁদের কেউ পরাতত্ত্ববাদী, কেউ প্রত্যক্ষবাদী, কেউ সন্দেহবাদী, কেউ ভাববাদী এবং অধ্যাত্মবাদী। বিশুদ্ধ ঐতিহাসিক—'ইতি+হ+আস'-এর ঐতিহাসিক নেই এবং থাকতেও পারে না। থুকিডাইডিস ও পোলিবিয়াস, লিভি ও ট্যাসিটাস, মেকিয়াভেলি ও গুইকিয়ার্ডিনি, গিয়ানো ও ভল্‌তেয়ার—এবং আমাদের কালের গিজো বা থিয়ের, মেকলে বা বালবো, রাঙ্কে বা মমসেন সম্পূর্ণ রাজনীতি-নিরপেক্ষ ও নীতিনিরপেক্ষ ছিলেন কি ?

এবং দর্শনের ইতিহাসের ক্ষেত্রে, দর্শনকে যিনি উন্নত করেছিলেন সেই হেগেল থেকে আরম্ভ করে, রাইত্তের জেল্‌লার, কুঁজা, লিয়ুইস এবং আমাদের স্পাভেন্তা পর্যন্ত, এমন কে আছেন যাঁর নিজের প্রগতির ধারণা ও বিচারের মানদণ্ড না আছে ? শিল্পতত্ত্বের ইতিহাস বিষয়ে, এমন একখানি মূল্যবান গ্রন্থ আছে কি—যা' কোন-না—কোন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বা বিশেষ কোন ঝোঁক দিয়ে লেখা হয়নি ? ঐতিহাসিক যদি পক্ষ গ্রহণ করার অনিবার্য আবশ্যকতাকে এড়িয়ে যেতে চান তা' হ'লে নিশ্চয়ই তিনি একটি রাজনৈতিক বা বৈজ্ঞানিক নপুংসকে পরিণত হবেন। ইতিহাস নপুংসকদের কোন ব্যাপার নয়। তা' বড় জোর প্রয়োজনীয় পাণ্ডিত্যের 'elumbis atque fracta'—যাকে

উপযুক্ত কারণেই—'monkish' বলা হয়—বিরাট বিরাট পর্ব সংকলন করার কাজে লাগতে পারে।

তা' হ'লে যদি প্রগতির ধারণা, দৃষ্টিকোণ, মানদণ্ড, অবশ্যগ্রাহ্যই হয়, তা' থেকে পালানোর চেষ্টা না করা বা না পালানোই ভালো, বরং উত্তম ধারণাদি গ্রহণ করাই উচিত। ঐকান্তিক ভাবে এবং অধ্যবসায় সহকারে যখন কোন আত্মপ্রত্যয় গঠন করার প্রয়োজন হয়, তখন প্রত্যেকেই ঐরূপ করে থাকে। যে ঐতিহাসিক নিজের মত না দিয়ে ঘটনাকে শুধু প্রশ্ন করেই চলেন, তিনি বিশ্বাসযোগ্য নন।

তাঁদের সম্বন্ধে বড় জোর এই কথা বলা চলে যে তাঁরা সরল এবং সংস্কারের অধীন। প্রকৃত ঐতিহাসিক হ'লে নিশ্চয়ই তাঁরা তাঁদের নিজের কিছু তাতে যোগ করবেন—এবং করবেন এমন কি অজ্ঞাতসারেই। অথবা আভাসে ইঙ্গিতে যা' বলার তা' বলেছেন বলে তাঁরা এই কথাই বিশ্বাস করবেন যে তাঁরা ঐরূপ কিছু করেন নি। এই আভাসে-ইঙ্গিতে বলাই হচ্ছে সব চেয়ে উত্তেজক, বহু দূরপ্রসারী এবং সার্থক বলা।

* * * যেমন—অন্যান্য ইতিহাস প্রগতির মানদণ্ডকে পরিহার করতে পারে না, তেমনি শিল্প-সাহিত্যের ইতিহাসও তা' পরিহার করতে পারে না। কোন আলোচ্য শিল্পকর্ম শিল্প হিসাবে কতখানি সার্থক হয়েছে তা' আমরা ততক্ষণ দেখাতে পারব না যতক্ষণ না আমরা শিল্পের সংজ্ঞা স্থির করে নেবো এবং নেবো গ্রন্থকার যে শৈল্পিক সমস্যাটির সমাধান করতে চেষ্টা করেছেন তাকে নির্ধারণ করবার জন্যই এবং যতক্ষণ না আমরা এই নিরূপণ করতে পারব যে গ্রন্থকার তার সমাধান করতে পেরেছেন কি পারেননি, বা কি পরিমাণে এবং কোন্ দিক দিয়ে তিনি ব্যর্থকাম হয়েছেন। কিন্তু বিশেষ উল্লেখযোগ্য কথা এখানে এই যে, প্রগতির মানদণ্ড বিজ্ঞানের ইতিহাসে যে রূপ পরিগ্রহ করে, শিল্প-সাহিত্যের ইতিহাসে তার চেয়ে ভিন্ন রূপ গ্রহণ করে।

জ্ঞানের সমগ্র ইতিহাসকে একটিমাত্র প্রগতির ও প্রত্যাগতির রেখা দ্বারা সূচিত করার নিয়ম প্রচলিত আছে। বিজ্ঞান হচ্ছে সামান্য-জ্ঞান। তার সমস্যাগুলি একটিমাত্র বিরাট তন্ত্রের বা সর্বব্যাপী সমস্যার মধ্যে বিন্যস্ত করে

রাখা হয়। সব ভাবুকরাই—সত্তার স্বরূপ এবং জ্ঞানের প্রকৃতি—এই একই সমস্যার সমাধান করতে চেষ্টা করছেন—ধ্যানী ভারতবাসী, গ্রীক দার্শনিক, খ্রীষ্ট-ধর্মাবলম্বী এবং মহম্মদ-পন্থী, মুণ্ডিত-মস্তক ও শিরোবন্ধযুক্ত মস্তক, পরচুলা পরিহিত মস্তক এবং কলেজটুপি-পরিহিত মস্তক (হাইনে'র কথা) সকলেই। বর্তমান যুগের ভাবুকরা করছেন এবং ভাবী যুগের ভাবুকরাও করবেন এবং করে করে শ্রান্ত হবেন। বিজ্ঞানের সম্পর্কে এ সত্য কি মিথ্যা—এখানে সেই প্রশ্নের মীমাংসা করার অবকাশ নেই, কিন্তু শিল্পের পক্ষে যে এ কথা সত্য নয়—এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। শিল্প হচ্ছে প্রতিভান এবং প্রতিভান হচ্ছে ব্যক্তিত্ব এবং ব্যক্তিত্বের কখনো পুনরাবৃত্তি হয় না। সুতরাং মানব-জাতির শিল্পসৃষ্টির ইতিহাস প্রগতির ও প্রত্যাগতির একটি মাত্র রেখা ধরে এগিয়ে যাচ্ছে—এ কথা বলা সম্পূর্ণ ভুল।

বড জোর এবং বিমূর্ত সামান্য-সিদ্ধান্ত করতে গেলে এই কথাই বলা যায় যে শিল্পের ইতিহাসে প্রগতির স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বৃত্ত দেখা যায়—প্রত্যেক প্রগতি-বৃত্তের সমস্যা স্বতন্ত্র এবং ঐ সমস্যার সঙ্গে তুলনা করেই প্রত্যেকের প্রগতির মাত্রা বিচার্য। একই বিষয় অবলম্বন করে যেখানে বহু ব্যক্তি কাজ করে এবং উপযুক্ত রূপ না দিতে পারলেও, খাঁটি রূপটির কাছে পৌঁছাতে চেষ্টা করে, সেখানেই প্রগতির অস্তিত্ব সম্ভব; যখনই কেউ এসে পূর্ণ রূপটি দান করেন, তখনই বৃত্তটি সম্পূর্ণ হয় এবং প্রগতির শেষ হয়। এর খাঁটি একটি দৃষ্টান্ত হবে—ইতালীয় রেনেসাঁসের সময়ে পুলকি থেকে আরিয়োস্টো পর্যন্ত শিভালরি-বিষয়বস্তুটিকে নানাভাবে বিস্তার করবার চেষ্টা—পুনরাবৃত্তি ও অনুকরণ, সংক্ষেপণ বা সম্প্রসারণ আগে যা' করা হয়েছে তাকে নষ্ট করা ছাড়া আর কিছুই করা হয়নি; সংক্ষেপে বলা যায়, আরিয়োস্টোর পরে একই বিষয়বস্তুকে বার বার ব্যবহারের ফল দাঁড়িয়েছে—'অবনতি' (ডেকাডেন্স)। আরিয়োস্টোর 'এপিগোনি' এর প্রমাণ। নতুন বৃত্তের আরম্ভ থেকে প্রগতির আরম্ভ হয়। সার-ভান্তিসের খোলাখুলি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ এর দৃষ্টান্ত। ষোড়শ শতাব্দীর শেষে ইতালীয় সাহিত্যে যে সর্বাঙ্গীন অবনতি দেখা দিয়েছিল, তার কারণ কি? কারণ এই যে নতুন আর কিছুই বলার ছিল না, পুরাতনেরই পুনরাবৃত্তি ও বিস্তার করা

হচ্ছিল। ঐ যুগের ইতালীরা যদি নিজেদের অবনতিকেও ব্যক্ত করতে পারত, তা' হ'লেও তারা একেবারে ব্যর্থ হত না, 'রিসোরজিমেণ্টোর' (Risorgi mento) সাহিত্যিক আন্দোলনের পূর্বাভাস সৃষ্টি করতে পারত। যেখানে বিষয়বস্তু এক নয়, সেখানে প্রগতি-বৃত্ত থাকতে পারে না।

শেকস্‌পীয়র দান্তের চেয়ে উন্নত বা গেটে শেকস্‌পীয়র থেকে উন্নত,—এ কথা বলা চলে না। দান্তে, মধ্যযুগের দ্রষ্টা-কবিদের মধ্যে সব চেয়ে উন্নত, শেক্‌স্‌পীয়র এলিজাবেথীয় নাট্যকারদের চেয়ে উন্নত, গেটে তাঁর বাদের (Werther) এবং ফাউস্টের প্রথম পর্বের জন্য, "স্টার্ম উণ্ড ড্রাঙ্গ" যুগের লেখকদের চেয়ে উন্নত। অবশ্য আগেই আমরা বলেছি শিল্প-সাহিত্যের ইতিহাসকে এই ভাবে উপস্থাপিত করার মধ্যে বেশ খানিকটা বিমূর্তভাব—কোন রকমে কাজ-চালানো-গোছের একটা কিছু রয়েছে, এর খাঁটি দার্শনিক মূল্য কিছু নেই। অসভ্য জাতির শিল্প যদি অসভ্যদের সংবিদকে সুষ্ঠুভাবে প্রকাশ করে থাকে তবে সভ্য জাতির শিল্পের চেয়ে খারাপ নয়; বস্তুতঃ প্রত্যেক ব্যক্তির—ব্যক্তির আত্মিক ক্রিয়ার প্রত্যেকটি মুহূর্তের নিজস্ব একটি শিল্পের জগৎ আছে, এর কোন জগতকেই অন্য জগতের সঙ্গে শিল্পমূল্যের দিক দিয়ে তুলনা করা চলে না।

শিল্প-সাহিত্যের প্রগতি—পরিমাপের এই বিশেষ মানদণ্ডটি না মেনে অনেকেই অপরাধ করেছেন এবং এখনও করে চলেছেন। যেমন কেউ কেউ বলেন, গিয়োত্তোর (Giotto) মধ্যে ইতালীয় শিল্পের শৈশব, রাফেলে বা তিতিয়ানে প্রৌঢ়কাল; যেন গিয়োত্তোর মন আবেগে পূর্ণ থাকা সত্ত্বেও পূর্ণাঙ্গ ও সার্থক রূপ তৈরি করতে পারেননি, রাফেলের মতো মূর্তি গঠন করতে বা তিতিয়ানের মতো বর্ণ বিন্যাস করতে তিনি পারেন নি। কিন্তু প্রশ্ন, রাফেল বা তিতিয়ান্ "দারিদ্র্যের সঙ্গে সন্ত ফ্রান্‌সিসের বিবাহ" বা "সন্ত ফ্রানসিসের মৃত্যু" সৃষ্টি করতে সমর্থ ছিল কি? রেনেসাঁস সুন্দর দেহকে যত মর্যাদা দিয়েছে, যত আগ্রহে বিষয়বস্তু হিসাবে গ্রহণ করেছে, গিয়োত্তো সুন্দর দেহের আকর্ষণে তত আকৃষ্ট হননি। চতুর্দশ শতাব্দীর কাছে যে কয়টি বিশেষ ভাব ও রূপ প্রিয়

ছিল, রাফেলের বা তিতিয়ানের কাছে তারা তত প্রিয় ছিল না। সুতরাং যেখানে তুলনীয় ধর্মই নেই সেখানে তুলনা হবে কি করে ?

শিল্পের ইতিহাসের সেই বিখ্যাত পর্ববিভাগ—প্রাচ্য পর্ব—যাতে ভাব ও রূপের সামঞ্জস্য নেই—ভাবের চেয়ে রূপের প্রাধান্য বেশী, ক্লাসিকাল-পর্ব—যাতে ভাব ও রূপের পূর্ণ সামঞ্জস্য এবং রোমান্টিক-পর্ব—যাতে নতুন করে ভাব ও রূপের সামঞ্জস্যের অভাব দেখা যায়—রূপের চেয়ে ভাবের প্রাধান্য বেশী,—একই দোষে দোষী। তারপর যে বিভাগে প্রাচ্যের (ওরিয়েন্টাল) লক্ষণ করা হয়, রূপের অপূর্ণাঙ্গতা, ক্লাসিকালের—রূপের পূর্ণাঙ্গতা এবং রোমান্টিকের বা আধুনিকের লক্ষণ করা হয়—ভাব ও রূপের পূর্ণ সামঞ্জস্য—সেই বিভাগ সম্বন্ধেও একই কথা প্রযোজ্য। এমনি ভাবে, ক্লাসিক ও রোমান্টিক অনেক অর্থের মধ্যে—প্রগতির যুগ বা "প্রত্যাগতির যুগ"—এ অর্থও রয়েছে।

* * * সুতরাং শৈল্পিক প্রগতি বলে কোন কিছু নেই। অবশ্য শৈল্পিক প্রগতি বলতে অনেক সময় বুঝায়—ঐ দু'টি শব্দ যুক্ত হ'লে যে অর্থ বুঝায় তা' নয়,—বুঝায় ক্রমবর্ধমান ঐতিহাসিক জ্ঞানের সঞ্চয় যা' সকল জাতির ও সকল যুগের শিল্পকর্মকে ভালোবাসতে শেখায়, তথা, আমাদের রুচিকে উদারতর করে তোলে। আমরা যদি অষ্টাদশ শতাব্দীর সঙ্গে আমাদের এই যুগের—যা' গ্রীক-রোমান শিল্পকে সমান ভাবে উপভোগ করছে, বাইজ্যান্টিয়ার, মধ্য-যুগের আরবের ও রেনেসাঁস যুগের শিল্পকে, ব্যারোক শিল্পকে, অষ্টাদশ শতাব্দীর শিল্পকে আরো ভাল ভাবে বুঝতে পেরেছে,—তুলনা করি, তা' হ'লেই পার্থক্যটি কত বড় তা' বুঝতে পারব। এখন প্রত্যহ, মিশরীয়, ব্যাবিলোনীয়, 'এট্রুস্কান', এমনকি প্রাগৈতিহাসিক শিল্প গভীর ভাবে অনুশীলন করা হচ্ছে। অসভ্য ও সভ্য মানুষের পার্থক্য নিশ্চয়ই বৃত্তির সম্ভাব বা অসদ্ভাবের মধ্যে নিহিত নেই। সভ্যদের মতো অসভ্যদেরও ভাষা আছে, বুদ্ধি আছে, ধর্ম আছে এবং নীতিবোধ আছে—অসভ্যরাও পরিপূর্ণ মানুষ। একমাত্র পার্থক্য এই যে সভ্য মানুষ তার জ্ঞানবৃত্তি ও কর্ম-বৃত্তির দ্বারা বিশ্বের অনেক বেশী অংশে প্রবেশ করেছে, আধিপত্য বিস্তার করেছে।

পেরিক্লিসের সমসাময়িকদের চেয়ে আমরা মনের দিক দিয়ে বেশী সতর্ক, এ দাবি করতে পারিনে। কিন্তু এ কথাও কেউ অস্বীকার করতে পারবে না যে, আমরা তাদের চেয়ে সমৃদ্ধতর—তাদেরই ধনে এবং আরো অন্যান্য যুগের মানুষের ধনে ধনী।

'শৈল্পিক প্রগতি' বলতে আর একটি অর্থও বুঝায় এবং সে অর্থটিও ঠিক নয়—বুঝায়, এক যুগের শিল্পকর্মের উৎকর্ষ ও সংখ্যা থেকে অন্য যুগের শিল্পের সংখ্যার উৎকর্ষের আপেক্ষিক আধিক্য। এই হিসাবে বলা যেতে পারে যে ত্রয়োদশ শতাব্দীর বা পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে ইতালীতে শৈল্পিক প্রগতি দেখা দিয়েছিল।

পরিশেষে, শৈল্পিক প্রগতির তৃতীয় অর্থ এবং এই অর্থটি করা হয়েছে, অসভ্য ও বর্বরদের শিল্পকর্মের তুলনায় সভ্যদের শিল্পকর্মে মানসিক ক্রিয়ার যে সূক্ষ্মতা ও জটিলতা ব্যক্ত হয়, তার দিকে লক্ষ্য রেখে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে, প্রগতি মানসিক ও সামাজিক অবস্থার প্রগতি—শৈল্পিক ক্রিয়ার প্রগতি নয়। কারণ শৈল্পিক ক্রিয়ার প্রগতি বিষয়বস্তুর ধার ধারে না।

শিল্পের ও সাহিত্যের ইতিহাসের পদ্ধতি সম্পর্কে এইগুলিই প্রধান লক্ষণীয় বিষয়।

অষ্টাদশ অধ্যায়

উপসংহার

ভাষাতত্ত্ব ও শিল্পতত্ত্বের ঐক্য

এ পর্যন্ত যতখানি পথ আমরা বিচরণ করে এসেছি, তার দিকে ফিরে তাকালেই দেখা যাবে যে আমরা এই গ্রন্থের সমস্ত বিষয়-সূচী শেষ করেছি। আমরা প্রতিভানিক বা প্রাকাশনিক জ্ঞান তথা শৈল্পিক সৃষ্টি সম্বন্ধে আলোচনা করেছি (১ম ও ২য় অধ্যায়) এবং অন্যবিধ জ্ঞানের অর্থাৎ বৌদ্ধিক জ্ঞানের স্বরূপ ব্যাখ্যা করেছি এবং ঐ সব জ্ঞানের নানা জটিলতা নিয়ে আলোচনা করেছি (৩য় অধ্যায়)। তাই আমরা সমস্ত ভুল শৈল্পিক মতবাদকে— যেগুলি বিভিন্ন জ্ঞানকে গুলিয়ে ফেলার জন্য, একের বিশেষত্বকে অন্যে আরোপ করার জন্য, দেখা দিয়েছে—সমালোচনা করতে পেরেছি। (৪র্থ অধ্যায়)। সেই প্রসঙ্গেই—বৌদ্ধিক জ্ঞানের এবং ইতিহাসতত্ত্বের ধারণা থেকে যে সব ভুল জন্মেছে তাদের নির্দেশ করেছি (৫ম অধ্যায়)। শৈল্পিক ক্রিয়ার সঙ্গে অন্যবিধ ক্রিয়ার সম্বন্ধ অর্থাৎ যা' জ্ঞানাত্মিকা ক্রিয়া নয় 'কর্মাত্মিকা ক্রিয়া'—পরীক্ষা করতে যেয়ে আমরা কর্মাত্মিকা ক্রিয়ার প্রকৃত বৈশিষ্ট্য এবং জ্ঞানাত্মিকা ক্রিয়ার সঙ্গে তার সম্পর্ক কি তা' নির্দেশ করেছি এবং সেই সূত্রে শৈল্পিক মতবাদে কর্মাত্মিকা ক্রিয়ার ধারণার অনুপ্রবেশকে সমালোচনা করেছি (৬ষ্ঠ অধ্যায়)।

আমরা কর্মাত্মিকা ক্রিয়াকে আর্থনৈতিক এবং নৈতিক এই দুইভাগে ভাগ করেছি এবং তাদের পার্থক্য বিচার করেছি (৭ম অধ্যায়): এবং এই সিদ্ধান্তেই পৌছেছি যে পূর্ব-বিশ্লেষিত চার রকম রূপ ছাড়া চৈতন্যের বা আত্মার (স্পিরিট) আর কোন রূপ নেই (৮ম অধ্যায়)। সুতরাং প্রত্যেক অতিপ্রাকৃত-ভিত্তিক বা কাল্পনিক শিল্পতত্ত্বের সমালোচনা করেছি।

এবং যেহেতু, এই চার প্রকার আত্মিক ক্রিয়ার সদৃশ কোন ক্রিয়ারূপ নেই সেইহেতু ঐ প্রতিষ্ঠিত চার প্রকারের মধ্যে বিশেষতঃ শৈল্পিক ক্রিয়ার মধ্যে কোন উপবিভাগ কল্পনা করা চলে না। এর থেকেই এই সিদ্ধান্ত এসেছে যে প্রকাশনের মধ্যে শ্রেণীবিভাগ—অলংকারশাস্ত্রীয় সমালোচনা অর্থাৎ কোন প্রকাশনকে সালংকার বা নিরলংকার এই দুই ভাগে ভাগ করে দেখা এবং অন্যান্য অনুরূপ বিভাগ ও উপবিভাগ অসম্ভব (৯ম অধ্যায়)। কিন্তু আত্মা যেহেতু একক সেইহেতু শৈল্পিক ব্যাপার কর্মাত্মক ব্যাপারও বটে এবং সেই কারণেই তা' আনন্দের ও বেদনার উদ্রেক করে। এই প্রসঙ্গেই আমরা সাধারণ ভাবে মূল্যগত আবেগ সম্বন্ধে এবং বিশেষভাবে শৈল্পিক মূল্য বা সৌন্দর্য সম্বন্ধে আলোচনা করেছি (১০ম অধ্যায়)। সমালোচনা করেছি—শৈল্পিক সুখবাদের বিভিন্ন রূপকে ও জটিলতাকে (১১শ অধ্যায়), শিল্পতত্ত্ব-শাস্ত্র থেকে মনস্তত্ত্বের পরিভাষা বা সংজ্ঞাগুলিকে বহিষ্কৃত করতে চেষ্টা করেছি (১২শ অধ্যায়)। শৈল্পিক সৃজনের পর্যায় থেকে পুনঃসৃজনের পর্যায় পর্যন্ত আসতে, আমরা প্রথম শৈল্পিক রূপগুলিকে বাহ্যিক রূপে প্রতিষ্ঠিত করার ব্যাপারটি নিয়ে আলোচনা করেছি। তাকেই বলা হয়েছে—বাস্তব বা শরীরী সুন্দর—প্রাকৃতিক বা কৃত্রিম যা'ই সে হোক না কেন (১৩শ অধ্যায়)। এই পার্থক্য বিচার থেকে আমরা পাচ্ছি সেই ভুলের সমালোচনা যে ভুল শৈল্পিক রূপ ও বস্তুরূপকে একাকার করার ফলে দেখা দেয় (১৪শ অধ্যায়)। শৈল্পিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার (টেকনিক) বা পুনঃসৃজন কল্পে যে প্রক্রিয়া অবলম্বন করা হয় তার অর্থ কি তা' নির্ধারণ করেছি তথা, বিশেষ বিশেষ শিল্পের শ্রেণীবিভাগ, গণ্ডী এবং উপবিভাগ কল্পনাকে সমালোচনা করেছি এবং শিল্প, অর্থনীতি ও নীতির সম্পর্ক নিরূপণ করেছি (১৫শ অধ্যায়)। যেহেতু শরীরী বস্তুটির অস্তিত্ব, শৈল্পিক পুনরুদ্বোধনকে পূর্ণমাত্রায় সৃষ্টি করার পক্ষে যথেষ্ট নয় এবং যেহেতু তা' সৃষ্টি করতে হলে, যে অবস্থায় প্রথম উদ্দীপক কারণটি কাজ করেছিল, সেই অবস্থাকে স্মরণ করতেই হবে সেইহেতু, যে ইতিহাস-জ্ঞান কল্পনার সঙ্গে অতীত শিল্পকর্মের সংযোগ স্থাপন করায় এবং

শৈল্পিক বিচারের ভিত্তিস্বরূপ হয় তার প্রয়োজন নিয়েও আলোচনা করেছি (১৬ অধ্যায়)। তারপর উপসংহারে কি করে পুনরুদ্বোধন ব্যাপারটি পরে চিন্তা-পদ্ধতি দ্বারা বিস্তারিত হয় তা' দেখিয়েছি এবং শিল্পের ও সাহিত্যের ইতিহাসের প্রক্রিয়াটি পরীক্ষা করেছি (১৭ অধ্যায়)।

শৈল্পিক ব্যাপারটির নিজের স্বরূপ কি এবং অন্যান্য আত্মিক ক্রিয়ার সঙ্গে, আনন্দ-বেদনা-আবেগের সঙ্গে, শিল্পরূপী বস্তুটির সঙ্গে, স্মৃতির সঙ্গে এবং এবং ঐতিহাসিক আলোচনার সঙ্গে তার সম্পর্ক কি—তা' আলোচনা করা হয়েছে। চিন্ময় অবস্থা থেকে ধীরে ধীরে ব্যাপারটি শেষ পর্যন্ত সৎস্বভাব বস্তুরূপ পরিগ্রহ করেছে, অর্থাৎ জন্মমুহূর্ত থেকে আরম্ভ করে ক্রমপরিবর্তিত হয়ে ইতিহাসের বিষয়বস্তুতে পরিণত হয়েছে।

শিল্পতত্ত্বের যে-সব বিরাট বিরাট গ্রন্থ আছে, তাদের সঙ্গে তুলনা করতে গেলে, আমাদের এই গ্রন্থখানি ক্ষুদ্রাবয়ব বলে মনে হবে বটে, কিন্তু যখন আমরা দেখব যে ঐ সব গ্রন্থের দশভাগের নয় ভাগ অবান্তর বিষয়ে, যেমন বিভিন্ন মনস্তাত্ত্বিক বা পরাতাত্ত্বিক সংজ্ঞায়, ছদ্ম-শৈল্পিক সংজ্ঞায় [মহীয়ান (সাবলাইম), হাস্যোদ্দীপক (কমিক), করুণ (ট্র্যাজিক) প্রভৃতি] বা শিল্পতত্ত্বের জীববিদ্যা উদ্ভিদবিদ্যা ও ধাতুবিদ্যায় এবং ইতিহাস আলোচনায় পরিপূর্ণ, দেখব যে শিল্পতত্ত্বের মধ্যে সমস্ত রকম শিল্পের ও সাহিত্যের ইতিহাস টেনে আনা হয়েছে এবং হোমার ও দান্তে, এরিয়োস্টো ও শেকস্‌পীয়র, বীটোফেন ও রোসিনি, মাইকেল এঞ্জেলো ও রাফেল সকলেরই সম্বন্ধে মন্তব্য করা হয়েছে, তখন তা' মনে হবে না।

ঐ সমস্ত অবান্তর বিষয় বাদ দিলে, এ গর্ব আমরা অবশ্যই করতে পারি যে আমাদের গ্রন্থ তাদের চেয়ে ক্ষুদ্রতর নয়, বরং প্রচলিত সাধারণ গ্রন্থগুলি থেকে অপেক্ষাকৃত সমৃদ্ধ; কারণ ঐ গ্রন্থগুলি শিল্পতত্ত্বের আসল আসল সমস্যা বাদ দিয়েছে অথবা এড়িয়ে গেছে।

* * * আমরা প্রকাশন-বিজ্ঞান স্বরূপ শিল্পতত্ত্বের প্রত্যেকটি দিক নিয়ে আলোচনা করেছি বটে, কিন্তু একটি কাজ বাকী আছে—আমাদের এই গ্রন্থের নামের সঙ্গে "সাধারণ ভাষা-বিজ্ঞান" নামক যে উপ-শিরোনামটি যোগ

করেছি, তার যুক্তিযুক্ততা প্রমাণ করা হয়নি। প্রমাণ করা হয়নি—শিল্পবিজ্ঞান এবং ভাষাবিজ্ঞান, শিল্পতত্ত্ব ও ভাষাতত্ত্ব, যথার্থ বিজ্ঞান হিসাবে, দু'টি স্বতন্ত্র বিজ্ঞান নয়, একই বস্তু। ভাষাতত্ত্ব বলে স্বতন্ত্র কোন বিজ্ঞান নেই; আমাদের বহু আকাঙ্ক্ষিত ভাষা-বিজ্ঞানের—সাধারণ ভাষাতত্ত্বের মধ্যে দর্শনে পরিণত করার মতো যেটুকু আছে—তার সঙ্গে শিল্পতত্ত্বের কোন পার্থক্যই নেই। যিনিই সাধারণ ভাষাতত্ত্ব অর্থাৎ ভাষা-দর্শন পড়তে যাবেন, তিনিই শৈল্পিক সমস্যা নিয়ে আলোচনা করবেন এবং যিনি শিল্পতত্ত্ব পড়তে যাবেন তাঁকেই ভাষাতত্ত্ব পড়তে হবে। ভাষার দর্শন এবং শিল্পের দর্শন একই বস্তু।

ভাষাতত্ত্ব যদি শিল্পতত্ত্ব থেকে পৃথক কোন বিজ্ঞান হতো তা'হ'লে প্রকাশন তার বিষয়বস্তু হতে পারত না—কারণ প্রকাশন আসলে শিল্পেরই বস্তু। অর্থাৎ ভাষা প্রকাশন—এই কথাই অস্বীকার করতে হতো। কিন্তু ভাষা বলতে নিরর্থক ধ্বনি বা শব্দ বুঝায় না। সার্থক প্রকাশের জন্য গঠিত ও পরিচ্ছিন্ন শব্দকেই ভাষা বলে। আর এমন যদি হতো যে ভাষাতত্ত্ব শিল্পতত্ত্বের সদৃশ কোন বিশিষ্ট বিজ্ঞান, তা'হ'লে তার বিষয়বস্তু হতো—বিশেষ শ্রেণীর প্রকাশন। কিন্তু আগেই এ প্রমাণ করেছি যে প্রকাশনের মধ্যে শ্রেণীবিভাগ নেই।

যে সব সমস্যা ভাষাতত্ত্ব সমাধান করতে চেষ্টা করে এবং যে-সব ভুলে ভাষাতত্ত্ব জড়িত রয়েছে —শিল্পতত্ত্বেও সেই একই সমস্যা, সেই একই ভুল রয়েছে। ভাষাতত্ত্বের দার্শনিক প্রশ্নগুলিকে শিল্পতত্ত্বের সূত্রে পরিণত করা সহজসাধ্য না হ'লেও অসাধ্য ব্যাপার নয়।

একের প্রকৃতি বা স্বরূপ নিয়ে যত বাদ বিসংবাদ বা আপত্তি দেখা দিয়েছে অঙ্কের প্রকৃতি নিয়েও সেই একই রকম বাদ বিসংবাদ ও আপত্তি দেখা যায়। যেমন প্রশ্ন উঠেছে—ভাষাতত্ত্বকে, ঐতিহাসিক বা বৈজ্ঞানিক এর কোন্ শ্রেণীর শাস্ত্রবিধির অন্তর্ভুক্ত করতে হবে? এবং ঐতিহাসিক শাস্ত্রবিধি থেকে বৈজ্ঞানিক শাস্ত্রবিধিকে পৃথক করার এবং বৈজ্ঞানিক শাস্ত্র বলে গ্রহণ করার পরে প্রশ্ন হয়েছে—প্রকৃতি-বিজ্ঞানের অথবা মনস্তত্ত্বমূলক বিজ্ঞানের

অন্তর্ভুক্ত হবে ?—এখানে মনস্তত্ত্বমূলক বিজ্ঞান বলতে মনস্তত্ত্ব এবং অন্যান্য আত্মার বিজ্ঞান বুঝানো হয়েছে।

শিল্পতত্ত্বের ক্ষেত্রেও একই প্রশ্ন উঠেছে। কেউ কেউ শিল্পতত্ত্বকে প্রকৃতি-বিজ্ঞান হিসাবে গণ্য করেছেন (শিল্পতত্ত্বকে প্রকাশনের বাস্তব রূপের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলেছেন)। কেউ কেউ মনোবিজ্ঞান হিসাবে গণ্য করেছেন (প্রকাশনের সামান্য রূপটিকে প্রকাশনের শ্রেণীবিভাগের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলেছেন)। কেউ কেউ আবার, এরূপ কোন বিষয়ের বিজ্ঞান থাকতে পারে —এই কথাটাই অস্বীকার করেছেন এবং শিল্পতত্ত্বকে কতগুলি ঐতিহাসিক ঘটনার সংগ্রহ বলে মনে করেছেন। এঁদের কেউই, শিল্পতত্ত্বকে আত্মিক ক্রিয়ার বা মূল্যের বিজ্ঞান—আত্মার বিজ্ঞান বলে চিনতে পারেননি।

ভাষিক-প্রকাশ বা বাক্‌কে, অনেক সময়েই, ভাবব্যঞ্জক বস্তু (a fact of interjection) বলে মনে করা হয়েছে। এই ভাবব্যঞ্জক ধ্বনি, মানুষের এবং পশুর—এক কথায় জীবমাত্রেরই আবেগ প্রকাশের বাস্তব উপকরণ। কিন্তু অনতিবিলম্বেই এ উপলব্ধি হয়েছে যে বেদনার সহজ শারীর প্রতিক্রিয়া যে "আঃ" এবং "আঃ" শব্দটি—এই দুয়ের মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য রয়েছে। এই আবেগব্যঞ্জকপদ-মতবাদ (থিওরি অফ ইণ্টারজেকশান) পরিত্যক্ত হওয়ার পরে (এই মতবাদকে জার্মানীর ভাষাতত্ত্ববিদ্‌রা রসিকতা করে "আঃ আঃ"-মতবাদ বলেছেন)—"অনুষঙ্গ বা প্রথা মতবাদ" (থিওরি অফ এ্যাসোসিয়েশন অর কন্‌ভেনশান) উপস্থিত হয়েছিল। শিল্পতত্ত্বের ক্ষেত্রে অনুষঙ্গবাদকে বিধ্বস্ত করতে যে আপত্তি উত্থাপিত হয়েছে এখানেও সেই একই আপত্তি প্রযোজ্য। বাক্ একক; বহু প্রতিরূপের সংযোগে উৎপন্ন কোন কিছু নয়। বহুত্ব দিয়ে প্রকাশনকে ব্যাখ্যা করা চলে না; বস্তুতঃ বহুত্বের অস্তিত্ব প্রকাশন নির্ভর। ভাষাতাত্ত্বিক অনুষঙ্গবাদেরই রকমফের হচ্ছে 'অনুকার' অর্থাৎ অনুকারী শব্দ (অনোমেটোপোইয়া); যাকে ভাষাতত্ত্ববিদ্‌রাই "বাউ-উয়াউ" (Bow-wow) মতবাদ নাম দিয়ে নিন্দা করেছেন। ঐ ধ্বনিটি কুকুরের ডাকের অনুকরণ থেকে জন্মেছে এবং অনুকারবাদীদের মতে—ঐ ধ্বনি থেকেই কুকুরের নাম হয়েছে "ডগ"।

'ভাষা' বিষয়ে, আমাদের সময়ে সবচেয়ে প্রচলিত মতবাদ (স্থূল প্রাকৃতবাদ বাদ দিলে) হিসাবে যা' চলছে তা' বহু মতবাদের সমষ্টি। মনে করা হয় —ভাষার উৎপত্তি হয়েছে কিছুটা ভাবাবেগের স্বতঃস্ফূর্ত উচ্ছ্বাস থেকে, কিছুটা অনুকার থেকে, কিছুটা প্রথা থেকে। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে যে দার্শনিক অবনতি দেখা দিয়েছিল এই মতবাদটি ঐ অবনত যুগেরই যোগ্য সিদ্ধান্ত।

* * * যে সব ভাষাতত্ত্ববিদ্ মনে করেন যে ভাষা মূলতঃ চৈতন্যেরই সৃষ্টি বটে কিন্তু পরে অনুষঙ্গের দ্বারা বহুল হয়েছে, যাঁরা ভাষার ব্যবহারিক প্রকৃতিটি (এ্যাক্টিভিস্টিক নেচার) ভালোভাবে আবিষ্কার করেছেন, তাঁদের একটি ভুলের দিকে এখানে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

কিন্তু এই ভেদকল্পনা ঠিক নয়, কারণ এক্ষেত্রে উৎপত্তি বলতে, প্রকৃতি বা স্বভাব ছাড়া আর কিছুই বুঝায় না। ভাষা যদি আত্মিক সৃষ্টি হয়, তবে সর্বদা সৃষ্টিই হবে। আর যদি অনুষঙ্গ হয়, তবে আরম্ভ থেকেই তা' হবে। শিল্পতত্ত্বের যে সাধারণ সূত্র আমরা জেনেছি, তা' বুঝতে না পারাতেই এই ভুলটি দেখা দিয়েছে—সেই সূত্রটি এই :—নতুন প্রকাশন ততক্ষণ সৃষ্ট হতেই পারে না, যতক্ষণ পুরাতন প্রকাশন প্রত্যয়ের স্তরে নেমে না যায়। আমরা যখন নতুন শব্দ উচ্চারণ করি তখন সাধারণতঃ আমরা অর্থের বৈচিত্র্য বা বিস্তার ঘটিয়ে পুরাতন শব্দকে পরিবর্তিত করি, কিন্তু এই প্রক্রিয়া অনুষঙ্গ-নির্ভর ব্যাপার নয়, সৃজনাত্মক ব্যাপার ; যদিও ঐ সৃজনের উপাদান, কল্পিত আদিম মানুষের প্রত্যয়রাজি নয় ; যে মানুষ বহুকাল সমাজের মধ্যে বাস করেছে, যে মনের মধ্যে বহু জিনিস, বিশেষতঃ বহু ভাষা সঞ্চয় করেছে, সেই মানুষেরই প্রত্যয়।

* * * শিল্পতত্ত্বের শৈল্পিক ব্যাপার ও বৌদ্ধিক ব্যাপারের পার্থক্যের প্রশ্নটি ভাষাতত্ত্বে ব্যাকরণ ও তর্কশাস্ত্রের সম্পর্কের প্রশ্ন হয়ে দেখা দিয়েছে। এই সমস্যার সমাধান করা হয়েছে :—দুটি অংশতঃ সত্য উপায়ে—তর্কশাস্ত্র ও ব্যাকরণের অবিচ্ছেদ্যতা—এবং বিচ্ছেদ্যতা দেখিয়ে। কিন্তু পূর্ণ সমাধান এই—নৈয়ায়িক রূপ বৈয়াকরণিক (শৈল্পিক) রূপ থেকে অবিচ্ছেদ্য বটে, কিন্তু বৈয়াকরণিক রূপটি নৈয়ায়িক রূপ থেকে বিচ্ছেদ্য।

*** একটি লোক গ্রামের পথে হেঁটে যাচ্ছে—এমন কোন ছবি দেখে আমরা বলতে পারি—"এই ছবিতে গতির ব্যাপারকে রূপ দেওয়া হয়েছে। এই গতিকে ইচ্ছাকৃত বলে ধরলে বলা চলে—'কার্য' (এ্যাকশান); এবং যেহেতু গতিমাত্রেই বস্তু-সাপেক্ষ এবং প্রত্যেক কার্য কর্তা-সাপেক্ষ, এই ছবিতে বস্তু বা ব্যক্তির রূপ উপস্থাপিত হয়েছে। কিন্তু এই গতির নির্দিষ্ট স্থান আছে, যা এই পৃথিবীর অংশ, বিশেষতঃ যা' তারই কোন একটি প্রদেশ এবং আরো বিশেষতঃ 'গ্রাম' নামক জঙ্গলাকীর্ণ ও তৃণাচ্ছাদিত স্থান এবং আরো আরো বিশেষতঃ প্রকৃতিকৃত বা মনুষ্যকৃত, 'পথ' নামক নির্দিষ্ট একটি রূপ। এখন, পৃথিবী বলতে তো একটি নক্ষত্রই (স্টার) বুঝায়, পৃথিবী একটিমাত্রই, কিন্তু, দেশ, প্রদেশ, পথ, জাতিবিশেষ, কারণ আরো অনেক দেশ, প্রদেশ পথ, রয়েছে।" এরূপ আলোচনা আরো কিছুক্ষণ চালানো যেতে পারে। যে ছবিটি কল্পনা করা হয়েছে তার বদলে—"পেটার গ্রামের পথে চলছে"—এই বাক্যটি ব্যবহার করে এবং তার সম্বন্ধে ঐরূপ একটু মন্তব্য প্রকাশ করতে যেয়ে আমরা 'ক্রিয়া' (গতি ও কার্য), বিশেষ্য (বস্তু বা ব্যক্তি), ব্যক্তিবাচক বিশেষ্য, জাতিবাচক বিশেষ্য এমনি আরো সব সংজ্ঞা পেয়েছি।

দুই ক্ষেত্রেই, আমরা কি করেছি? আগে যা' শুধু প্রতিভানে ধরা দিয়েছে, তাকে বুদ্ধি দ্বারা বিস্তার করা ছাড়া আর কিছুই করিনি অর্থাৎ আমরা নৈয়ায়িকতার দ্বারা শৈল্পিকতাকে নষ্ট করেছি। কিন্তু শিল্পতত্ত্বে যেমন ভুলের আরম্ভ হয় যখন আমরা নৈয়ায়িক থেকে শৈল্পিকে পৌঁছতে চেষ্টা করি এবং যখন গতির, কার্যের, বস্তুর, ব্যক্তির রূপ সম্বন্ধে সামান্যের রূপ, বিশেষের রূপ সম্বন্ধে প্রশ্ন করি, তেমনি ভাষাতত্ত্বেও ভুলের আরম্ভ হয় যখন, গতি বা ক্রিয়াকে ক্রিয়াপদ বলা হয়, বস্তু বা ব্যক্তিকে বিশেষ্য বা বিধেয় বলা হয় এবং যখন এই সব বিশেষ্য, ক্রিয়া প্রভৃতি নিয়ে পদ-প্রকরণ বা ভাষা-তাত্ত্বিক পরিভাষা (ক্যাটিগোরি) তৈরি করা হয়। শিল্প-সাহিত্যে শ্রেণী-বিভাগ কল্পনা—আমাদের শিল্পতত্ত্বে যা' আগেই সমালোচিত হয়েছে—আর ব্যাকরণে পদ-বিভাগ পরিকল্পনা—একই ধরনের ব্যাপার।

ক্রিয়া বা বিশেষ্য নির্দিষ্ট এবং স্বতন্ত্র শব্দে প্রকাশিত হয়—এ কথা বলা ভুল। প্রকাশন একটি অবিভাজ্য সত্তা। তার মধ্যে ক্রিয়া এবং বিশেষ্য নেই। বাক্যরূপ একক ভাষা-সত্তাকে ভেঙে-চুরে আমরা বুদ্ধির সাহায্যে ঐ সব তৈরি করে থাকি। এই শেষোক্ত কথাটিকে বৈয়াকরণরা যে অর্থে গ্রহণ করেন সেই অর্থে নয়, ব্যবহার করতে হবে—সমগ্র অর্থদ্যোতক একটি অবয়বী অর্থে, যাতে সরলতম একটি উচ্ছ্বাস থেকে বৃহৎ কাব্য পর্যন্ত সমানভাবে ব্যক্ত হতে পারে। কথাটি বিরোধাভাসের মতো শুনতে বটে, কিন্তু এইটিই অতি সরল সত্য।

শিল্পশাস্ত্রে যেমন উল্লিখিত ভুলের জন্য বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির সৃষ্টিকে প্রচলিত বিশেষ কোন শ্রেণীতে ফেলা যাচ্ছে না বলে বা সর্বাংশে মিলছে না বলে অসম্পূর্ণ বলে নিন্দা করা হয়, ভাষাশাস্ত্রেও তেমনি "পদ"-পরিকল্পনার ফলে অনুরূপ ভুল করা হয়—ভাষাকে, পদ-বিন্যাসের বৈশিষ্ট্য অনুসারে—বাক্যে অমুক অমুক পদ, যেমন ক্রিয়া, আছে কি নেই তা হিসাব করে—'সম্পূর্ণ' এবং 'অসম্পূর্ণ' বলা হয়।

অবশ্য ভাষাতত্ত্ব যখন এই কথা বলেছে যে শব্দ হচ্ছে যা' উচ্চারিত এবং যথার্থ একরূপ শব্দ নেই, তখন শৈল্পিক ব্যাপারের অবিভাজ্য ব্যক্তিত্ব বা বিশেষত্বটিকেই আবিষ্কার করেছে। তার ফলে, একার্থক অসমোচ্চার শব্দ বা প্রতিশব্দ ও ভিন্নার্থক সমোচ্চার শব্দের সম্ভাবনা অস্বীকৃত হয়েছে এবং এক শব্দকে অন্য শব্দে যথার্থ অনুবাদ করা, মাতৃভাষা থেকে বিদেশী ভাষায় অনুবাদ করা যে অসম্ভব তা' দেখানো হয়েছে। কিন্তু এই সিদ্ধান্তের বা মতবাদের সঙ্গে, ভাষাকে শ্রেণীবিভক্ত করার চেষ্টাকে মেলানো যায় না। বিশেষ যুগের বিশেষ মনুষ্যগোষ্ঠীর লিখিত বা কথিত সরলবাক্য বা যৌগিক বাক্যের বাইরে ভাষার কোন অস্তিত্বই নেই, অর্থাৎ শিল্পকর্মের দেহেই তাদের বাস্তব অবস্থান এবং শিল্পকর্মের—ক্ষুদ্র বা বৃহৎ, মৌখিক বা লিখিত, শীঘ্রবিস্মৃত বা দীর্ঘকালস্মৃত, তাতে কিছু এসে যায় না—বাইরে তাদের কোন অস্তিত্ব নেই।

কোন মানবগোষ্ঠীর শিল্পকর্ম বলতে, সমগ্র শিল্পকর্মের সমষ্টি ছাড়া আর কি বুঝায়? শিল্পকর্মের বৈশিষ্ট্য বলতে (ধরা যাক গ্রীক শিল্প বা প্রোভাঁস্যাল

সাহিত্য)—ঐ সব শিল্পকর্মেরই আকৃতি-প্রকৃতি লক্ষণ ছাড়া আর কি বুঝায়? আর ঐ সব প্রশ্নের উত্তর সাহিত্যের ইতিহাসকে বিশেষভাবে বর্ণনা করে অর্থাৎ—ভাষার 'বাস্তব সত্তা' বর্ণনা করে ছাড়া আর কি ভাবেই দেওয়া যেতে পারে?

মনে হতে পারে যে এই যুক্তিটি ভাষায় প্রচলিত শ্রেণীবিভাগের বিরুদ্ধে খুবই কার্যকরী কিন্তু সেই শ্রেণীবিভাগের শাণী—সেই তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের গৌরব ঐতিহাসিক-বংশপীঠিকা-ভিত্তিক শ্রেণীবিভাগের পক্ষে সম্পূর্ণ অপ্রযোজ্য। অবশ্যই অপ্রযোজ্য, কিন্তু কেন? কারণ এই যে ঐ ঐতিহাসিক-বংশপীঠিকা-ভিত্তিক পদ্ধতি—শুধুমাত্র শ্রেণীবিভাগ নয়। যিনি ইতিহাস লেখেন, তিনি শ্রেণীবিভাগ করেন না এবং ভাষাতত্ত্ববিদ্‌রা নিজেরাই এ কথা বলে ফেলেছেন যে ঐতিহাসিক পর্বানুসারে যে সমস্ত ভাষাকে সাজানো-গোছানো যায় (এ পর্যন্ত যাদের পর্যায়বদ্ধ করা গেছে), তারা পৃথক ও স্বতন্ত্র কোন প্রজাতি নয়—ক্রম-বিকাশের বিভিন্ন পর্বসমন্বিত একটি একক সত্তা (সিংগিল হোল্)।

*** ভাষাকে কখনো কখনো ইচ্ছামূলক বা খামখেয়ালী ব্যাপার বলে মনে করা হয়েছে। আচার কোন কোন সময়ে এত স্পষ্ট দেখা গেছে যে, ইচ্ছাশক্তির দ্বারা কৃত্রিম উপায়ে ভাষা সৃষ্টি করা সম্ভব নয়—In Caesar civitatem dare potes homini verbo non potes—এই কথাটি জনৈক রোম-সম্রাটকে বলা হয়েছিল। প্রকাশনের শৈল্পিক প্রকৃতিটি (জ্ঞানাত্মিকা, কর্মাত্মিকা নয়) বুঝতে পারলেই, যে ব্যাকরণে শুদ্ধ বাক্য ব্যবহারের বিধি নির্ধারিত হয় সেই বিধি-প্রবণ (নরমেটিভ) ব্যাকরণের ভুল ধরবার কৌশলটি বুঝতে পারা যাবে।

সু-বুদ্ধি সর্বদাই এই ভুলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে যে ঐ বিদ্রোহের অন্যতম দৃষ্টান্ত ভল্‌তেয়ার মহাশয়ের নামে প্রচলিত—"ব্যাকরণ অধঃপাতে যাক"—এই উক্তি। বিধি-প্রবণ ব্যাকরণ যে অসম্ভব তা' যাঁরা ব্যাকরণ পড়ান তাঁরা স্বীকারও করেন এবং যখন তাঁরা এ স্বীকার করেন যে সূত্র পড়ে ভালো লেখা শেখা যায় না, প্রত্যেক নিয়মেরই ব্যতিক্রম আছে এবং ব্যাকরণ

শিখতে হবে পড়ার ও দৃষ্টান্তের ভিতর দিয়ে—আর তাতেই সাহিত্য-রুচি তৈরি হবে। কেন অসম্ভব তার বৈজ্ঞানিক কারণ নিহিত রয়েছে—আমরা যা' এতক্ষণ প্রতিপাদন করেছি সেই সূত্রেরই মধ্যে—জ্ঞানের ক্রিয়াপ্রকরণ (টেকনিক) স্বতোবিরুদ্ধ কথা। বাচন-বিধি প্রবর্তক ব্যাকরণ (নর-মেটিভ গ্রামার) ভাষিক প্রকাশনের অর্থাৎ জ্ঞানের ক্রিয়া-প্রকরণ ছাড়া আর কি?

* * * তবে, ব্যাকরণ যেখানে কোন দার্শনিক সত্য স্থাপনের দাবি রাখে না, ব্যাকরণ বলতে বুঝায—শুধু কতকগুলি বিধি-নিষেধ অর্থাৎ ভাষা শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা বা নিয়মকানুন, সেখানে অবশ্য ভিন্ন কথা। সে-ক্ষেত্রে পদেব সংজ্ঞা প্রভৃতিও প্রয়োজনীয় এবং স্বীকার্য এবং "ভাষা-তত্ত্বের গ্রন্থ" নামে যে সব বই প্রচলিত এবং যাতে আমরা সব কিছুরই কিছু কিছু পাই—স্বরযন্ত্রের বর্ণনা থেকে, স্বর অনুকরণের কৃত্রিম যন্ত্র (ফোনোগ্রাফ) থেকে, ইণ্ডো-ইয়োরোপীয়, সেমিটিক কোপটিক, চাইনীজ এবং অন্যান্য ভাষা-তত্ত্বের সার-সংগ্রহ পর্যন্ত, ভাষার উৎপত্তি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে দার্শনিক সাধারণ সিদ্ধান্ত থেকে, কি করে ফর্মা তৈরি করতে হয় সে সম্বন্ধে নির্দেশ, লেখন-তত্ত্ব এবং ভাষাতত্ত্ব বিষয়ক গবেষণা কার্যের তথ্যগুলির বিন্যাস পর্যন্ত সব বিষয়ই পাই, সেগুলি সহ্য করতেই হবে। কিন্তু ভাষার স্বরূপ সম্বন্ধে, ভাষার প্রকাশস্বরূপতা সম্বন্ধে, যে সমস্ত ধারণা খণ্ডিতাকারে এবং অসম্পূর্ণাকারে এখানে উপস্থাপিত করা হয়েছে—তা' শেষ পর্যন্ত শিল্পতত্ত্বের ধারণাতেই পর্যবসিত হয়। ভাষার প্রকৃতির বা স্বরূপের জ্ঞান দেয় অথচ যা' শিল্প-তত্ত্বের বহির্ভূত, এমন কিছুই নেই এবং গ্রন্থবদ্ধ ব্যাকরণ—(এম্পিরিকাল গ্রামার) যা' পণ্ডিতী কর্মকৌশল মাত্র—জীবন্ত ভাষার ইতিহাস অর্থাৎ বাস্তব সাহিত্য-সৃষ্টির ইতিহাস, আসলে সাহিত্যের ইতিহাস ছাড়া আর কিছুই না।

* * * শৈল্পিককে দৈহিক বলে যে ভুল করা হয় এবং যে ভুল থেকে সুন্দরের আদি রূপ সন্ধান করার চেষ্টা দেখা দিয়ে থাকে, সেই একই ভুল করেন তাঁরা যাঁরা ভাষার মৌল রূপ খুঁজতে বস্তুরূপে উপস্থিত বা লিখিত ধ্বনিসংকেতগুলিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে ভাগ করতে চেষ্টা করেন। অক্ষর, স্বরবর্ণ,

ব্যঞ্জনবর্ণ, অক্ষরসমষ্টি বা শব্দ—বাক্যের এই অংশগুলিকে, যা' পৃথক পৃথক ভাবে কোন নির্দিষ্ট অর্থ প্রকাশ করে না—ভাষার বাস্তব সত্তা (ফ্যাক্টস্ অফ ল্যাঙ্গুয়েজ) বললে চলবে না, বলতে হবে—ধ্বনিমাত্র বা পৃথকীকৃত এবং বস্তুরূপে শ্রেণীবিভক্ত ধ্বনিসমূহ।

একই ধরনের ভুল হচ্ছে 'মূল' (রুটস্) সন্ধান বা নির্দেশ। অবশ্য বিখ্যাত ভাষাতত্ত্ববিদ্‌রা একে আজ আর তেমন মূল্য দেন না। ভাষিক বা প্রকাশ ব্যাপারের সঙ্গে দৈহিক বিষয়কে গুলিয়ে ফেলে এবং ভাবের ক্রমপর্যায়ে যৌগিকের আগে আসে সরল এই কথা মেনে নিয়ে,তাঁরা শেষ পর্যন্ত এই কথাই ভেবে নিয়েছেন যে ক্ষুদ্রতম দৈহিক ঘটনাই ক্ষুদ্রতম ভাষিক ব্যাপার। তাইতো এমন কল্পনা আবশ্যক হয়েছে যে—সব চেয়ে আদিম ভাষাগুলি স্বভাবে একাক্ষরিক এবং ঐতিহাসিক গবেষণা নিশ্চয়ই আমাদের একাক্ষরিক মূল আবিষ্কারের লক্ষ্যে পৌঁছে দেবে। কিন্তু (ঐ কাল্পনিক প্রকল্পকে অনুসরণ করলে) প্রথম মানুষের প্রথম প্রকাশনটি ধ্বন্যাত্মক না হয়ে, অনুকারী শারীরিক সহজ প্রতিক্রিয়াও হতে-পারে—শব্দে প্রকাশিত না হয়ে, অঙ্গ-ভঙ্গীতে প্রকাশ পেতে পারে। আর যদি ধরেই নেওয়া যায় যে শব্দেই তা' প্রকাশিত হয়েছিল, তা' হ'লেও তা' যে অনেকাক্ষর হয়নি,—একাক্ষরই হয়েছিল এমন অনুমান করার কোন যুক্তি নেই। ভাষাতত্ত্ববিদ্‌রা যে-ক্ষেত্রে অনেকাক্ষরকে একাক্ষরে পরিণত করতে পারেন না, সে ক্ষেত্রে তাঁরা নিজের অজ্ঞতা ও অক্ষমতাকেই সরাসরি নিন্দা করে থাকেন এবং ভবিষ্যতের উপর ভরসা করেই ক্ষান্ত থাকেন। তাঁদের ঐ ভরসার কোন ভিত্তি নেই এবং তাঁদের আত্মনিন্দা ভুল ধারণাজনিত বিনয় মাত্র। তারপর অক্ষরের পরিমাণ, শব্দের পরিমাণ নির্ধারণ সম্পূর্ণ খামখেয়ালী ব্যাপার, ব্যবহারিক প্রয়োজনানুসারেই, কোন রকমে, তা' করা হয়ে থাকে। আদিম ভাষা বা অশিক্ষিতের ভাষা এক অখণ্ড প্রবাহ—তার সঙ্গে, বাক্যকে শব্দ, অক্ষর প্রভৃতি পণ্ডিত-কৃত কাল্পনিক বস্তুতে ভাগ ভাগ করে নেওয়ার চেতনার কোন সম্পর্ক নেই।

ঐরূপ বিভাগের উপরে ভাষাতত্ত্বের কোন খাঁটি সূত্র স্থাপনা করা চলে

না। তার প্রমাণ পাওয়া যায় ভাষা তত্ত্ববিদ্‌দের এই স্বীকারোক্তিতেই যে... (হায়াটুস)...ক্যাকোফোনি...(ডায়াবেসিস্) বা...(সাইনাবেসিস্) প্রভৃতির কোন খাঁটি ধ্বনিসূত্র নেই, আছে শুধু রুচির সূত্র—অর্থাৎ শৈল্পিক সূত্র। কী সেই শব্দ সূত্র যা' একই সময়ে, রীতির সূত্র নয়?

* * * পরিশেষে আলোচ্য এই যে, আদর্শ ভাষার জন্য সন্ধান বা ভাষা প্রয়োগের বৈচিত্র্যকে ঐক্যে পরিণত করবার পদ্ধতি খোঁজার চেষ্টা সুন্দরকে যুক্তি দিয়ে পরিমাপ করার সংস্কার থেকে, এবং যে ধারণাকে আমরা মিথ্যা 'শৈল্পিক পরমার্থতা' বলেছি সেই ধারণা থেকে জন্মেছে। ইতালীতে একে আমরা বলেছি—'ভাষার ঐক্যের প্রশ্ন'।

ভাষা নিয়ত সৃষ্টি। একবার যা' ভাষায় ব্যক্ত হয়েছে, তার আর পুনরাবৃত্তি নেই—যা' সম্ভব সে শুধু যা' সৃষ্ট হয়েছে তাকেই পুনঃসৃষ্টি করা। প্রতি মুহূর্তের নতুন নতুন প্রত্যয় শব্দার্থের অবিরাম পরিবর্তন ঘটিয়ে তথা নতুন নতুন প্রকাশন সৃষ্টি করে চলেছে। সুতরাং আদর্শ ভাষার সন্ধান করা আর গতির স্থিরত্ব সন্ধান করা একই ব্যাপার। বস্তু মনের মধ্যে যে প্রতিধ্বনি জাগায় তার অনুসারে অর্থাৎ—প্রত্যয় অনুসারেই প্রত্যেকে কথা বলে এবং প্রত্যেকের বলা উচিতও। 'ভাষার ঐক্য' সমস্যার যে কোন একটি সমাধান, (প্রায় লাতিনের মতো 'স্ট্যাণ্ডার্ড' ইতালীয় ভাষাই স্বীকার করা হোক, বা চতুর্দশ শতাব্দীর ভাষার বা ফ্লোরেন্সের কথ্য ভাষার কাছাকাছি কোন আদর্শ ভাষা, স্বীকার করা হোক) দৃঢ়ভাবে সমর্থন করা সত্ত্বেও, সমর্থক যে দশের কাছে মনের ভাব ব্যক্ত করার সময়ে তাঁর স্বীকৃত তত্ত্বকে প্রয়োগ করতে কুণ্ঠিত হন, তা' একেবারে অকারণ ঘটনা নয়। কারণ এই যে, তিনি মনে করেন—স্বাভাবিক প্রত্যয়ের সঙ্গে যেটা মিলে যায় সেটা ছাড়া অন্য কোন পৃথক শব্দের বেলায়, লাতিন, চতুর্দশ শতাব্দীর ইতালীয় ভাষা বা ফ্লোরেন্সের শব্দ প্রয়োগ করলে, সত্যের খাঁটি রূপটিকে বিকৃত করা হবে। বক্তার বদলে তিনি হবেন নিজেই নিজের বৃথা শ্রোতা, খাঁটি মানুষের বদলে বৃথা বাক্-গর্বী, অকপট ব্যক্তির স্থলে অভিনেতা। কোন তত্ত্ব-অনুসারে লেখা আসলে লেখাই নয়—বড় জোর তা' সাহিত্য তৈরি করা।

ভাষার ঐক্যের প্রশ্নটি বার বার ঘুরে ফিরে হাজির হচ্ছে, কারণ, এর যে পরিচয় দেওয়া হয়েছে তাতে,—ভাষার মিথ্যা ধারণার উপরে প্রতিষ্ঠিত বলেই, এ অসমাধেয়। ভাষা পুরাতন অস্ত্রের অস্ত্রাগার নয়, শব্দকোষ বা সংজ্ঞা-সংগ্রহ নয় বা কম-বেশী মমী-করা নরকঙ্কাল নয়।

আদর্শ-ভাষার প্রশ্নটি বা ভাষার ঐক্যের প্রশ্নটি আমরা যে ভাবে খারিজ করে দিয়েছি তা' আকস্মিক বলে মনে হতে পারে, তবু, বহু শতাব্দী ধরে ইতালীতে যাঁরা এই প্রশ্ন নিয়ে বাদ-বিতর্ক করে আসছেন তাঁদের প্রতি আমরা সম্মান ছাড়া অন্য কোন মনোভাবই পোষণ করিনে। ঐ সমস্ত আন্তরিক বাদ-বিতর্কের বিষয় মূলতঃ শিল্পতত্ত্ব, শিল্প-বিজ্ঞান নয় ; সাহিত্য, সাহিত্যতত্ত্ব নয়, সার্থক বাচন ও লেখন—ভাষাবিজ্ঞান নয়।

তাঁদের ভুল হয়েছে এই যে তাঁরা একটা প্রয়োজনের তাগিদকে বৈজ্ঞানিক প্রস্তাবে পরিণত করতে চেষ্টা করেছেন, ভাষার ব্যবধানে ব্যবহিত মানুষের মধ্যে সহজতর সংযোগ স্থাপনার ঔচিত্যের কথা ভেবে—একটি মাত্র আদর্শ ভাষা উদ্ভাবনের চেষ্টা করেছেন। সার্বজনীন ভাষা, যে ভাষায় সংজ্ঞার ও সামান্যের স্থিরতার মতো স্থিরতা থাকবে, তেমনি একটি ভাষা তৈরি করার চেষ্টা যেমন ব্যর্থ, তেমনি এ চেষ্টাও ব্যর্থ। উন্নততর পারস্পরিক বুঝাপড়ার যে সামাজিক প্রয়োজন আছে, তা' সার্বজনীন শিক্ষার বিস্তার ছাড়া, যান-বাহন ব্যবস্থার উন্নতি ছাড়া এবং চিন্তা-ভাবনার আদান-প্রদান ছাড়া আর কোন উপায়েই মেটানো সম্ভব নয়।

* * * এই সব ইতস্ততোবিক্ষিপ্ত মন্তব্য থেকেই স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে যে ভাষাতত্ত্বের বৈজ্ঞানিক সমস্যা এবং শিল্পতত্ত্বের সমস্যা একই ; একের সত্য ও মিথ্যা অন্যেরই সত্য এবং মিথ্যা। ভাষাতত্ত্ব এবং শিল্পতত্ত্ব যে দুটি স্বতন্ত্র বিজ্ঞান বলে মনে হয়েছে, তার কারণ এই লোকে ভাষাতত্ত্ব বলতে বুঝে—ব্যাকরণ বা ব্যাকরণের ও দর্শনের মিশ্রণ, অর্থাৎ খামখেয়ালী স্মৃতি-সহায়ক নিয়মাবলী বা পণ্ডিতী পরিভাষার জগাখিচুড়ি,—এ কথা বুঝে না যে ভাষাতত্ত্ব হচ্ছে আসলে একটি বিজ্ঞান—বিশুদ্ধ বাগ্‌দর্শন।

ব্যাকরণ অথবা ব্যাকরণের সঙ্গে আরো যে সব বস্তু মিশে থাকে তারা,

মনের মধ্যে এই কুসংস্কার তৈরি করে যে ভাষার অস্তিত্ব পৃথক পৃথক এবং সংযোজনীয় শব্দের মধ্যেই নিহিত থাকে, জীবন্ত কথাবার্তার মধ্যে—অ-যুক্তি-বিশ্লেষ্য প্রকাশন-তন্ত্রের মধ্যে নিহিত থাকে না।

দার্শনিক প্রতিভাসম্পন্ন যে সমস্ত ভাষাতত্ত্ববিদ্ ভাষা-সমস্যার গভীরতম প্রদেশে প্রবেশ করেছেন, তাঁদের অবস্থা (উপমা দিয়ে বলতে গেলে বলা যায়) সুড়ঙ্গ খোদাইকরদের মতো: কিছুদূর এগিয়ে গেলেই তারা তাঁদের সহকর্মী শিল্প-দার্শনিকদের—যাঁরা বিপরীত দিক থেকে কাজ করে এগিয়ে আছেন তাঁদের গলার আওয়াজ শুনতে পান। বৈজ্ঞানিক বিস্তারের স্তরে পৌছলেই, ভাষাতত্ত্ব যখন প্রকৃত দার্শনিক মর্যাদা পায়, তখন শিল্পতত্ত্বের সঙ্গে এক হয়ে যায় এবং তা' যায় কোনরূপ অবশিষ্ট কিছু না রেখেই।

॥ সমাপ্ত ॥

বেনিডেট্টো ক্রোচের

দি এসেন্স অফ এস্থেটিক

বা

শিল্পতত্ত্ব-সার

[রাইস্ ইন্‌ষ্টিটিউট-এর উদ্বোধনী ভাষণ—ডগলাস আইনস্‌লি কর্তৃক ইংরেজিতে অনূদিত, ১৯১২]

শিল্পতত্ত্ব-সার

"এস্তেতিকা" বা থিওরি অফ এস্থেটিক বেনিডেট্টো ক্রোচের অক্ষয় ও অতুলনীয় বিরাট কীর্তি বটে, কিন্তু একমাত্র কীর্তি নয়। শিল্পতত্ত্বে তাঁর যে দান, এস্তেতিকা গ্রন্থে তা' বিস্তারিতভাবে এবং শিল্পতত্ত্ব-সার গ্রন্থে সংক্ষেপে এবং সরলতর ভাবে পরিবেষিত হয়েছে। শিল্পতত্ত্ব-সার গ্রন্থটি "রাইস ইন্‌ষ্টিটিউট"-এর উদ্বোধনী ভাষণের জন্য ১৯১২ খ্রীঃ লিখিত হয়েছিল এবং এস্তেতিকা-গ্রন্থের ইংরেজি-অনুবাদক শ্রদ্ধেয় ডগলাস আইন্‌সলি কর্তৃক অনুদিত হয়েছিল। এই আলোচনা নিম্নলিখিত চারটি অধ্যায়ে বিভক্ত :—

(ক) শিল্প কি ?

(খ) শিল্পসম্বন্ধে কয়েকটি কুসংস্কার।

(গ) আত্মিক ক্রিয়ায় এবং সমাজে শিল্পের স্থান।

(ঘ) শিল্পের সমালোচনা ও ইতিহাস।

প্রথম অধ্যায়ের সারাংশ

(ক) The art is vision or intuition :—

শিল্প হচ্ছে নির্বিকল্পক দর্শন বা প্রতিভান। 'Intuition', 'vision', 'contemplation', 'imagination', 'fancy' 'figurations', 'repesentations' প্রভৃতি একই অর্থে প্রযুক্ত হয়ে থাকে। তবে শিল্প প্রতিভান এ কথা বললেই—শিল্প কি নয় তা' সঙ্গে সঙ্গে বলা হয়ে যায়।

(১) এর প্রথম তাৎপর্য এই যে—শিল্প বলতে কোন বস্তু পদার্থ—'physical fact'—বুঝায় না। কেন বুঝায় না জিজ্ঞাসা করলে আমরা বলব—বস্তুর কোন পারমার্থিক সত্তা (reality) নেই এবং শিল্প—'supremely real'—যার পর নাই বাস্তব। সুতরাং শিল্প বস্তু হতে পারে না। বিরোধাভাস বলে মনে হ'লেও—কথাটি সত্য। বস্তুর পারমার্থিক সত্তা নেই—

বস্তু হচ্ছে construction of our intellect for the purpose of science—বস্তুবাদী দার্শনিকরা ছাড়া আর সকলেই এ কথা স্বীকার করেন এবং বস্তুবাদীদের প্রকৃতিও শেষ পর্যন্ত—'supermaterial principle.'

(২) দ্বিতীয় তাৎপর্য—শিল্প যেহেতু প্রতিভান (intuition) এবং প্রতিভান ধ্যানবিশেষ (contemplation), শিল্প কোন প্রয়োজনমূলক ব্যাপার নয় (art cannot be a utilitiarian act)। প্রয়োজনমূলক ব্যাপারের উদ্দেশ্য—আনন্দকে লাভ করা এবং বেদনাকে পরিহার করা। অতএব—শিল্পের সঙ্গে প্রয়োজনের এবং আনন্দ-বেদনার কোন যোগ নেই। (has nothing to do with the useful and with pleasure and pain as such)।

আনন্দ যে শিল্পের উদ্দেশ্য হতে পারে না,—সব রকম আনন্দই যে শৈল্পিক আনন্দ নয়—এতেই প্রমাণিত। শৈল্পিক আনন্দ লৌকিক আনন্দ নয়—শিল্পের সুষমা বা সৌন্দর্য উপলব্ধি থেকে যে আনন্দ জন্মে সেই বিশেষ আনন্দ। দৃষ্টান্ত দিলেই স্পষ্ট হবে—শিল্পে যে ব্যক্তিরূপ উপস্থাপিত হয়, সেই ব্যক্তিটির স্মৃতির সঙ্গে আমাদের বাসনার যোগ থাকায় ব্যক্তিটি আনন্দদায়ক হতে পারে বটে কিন্তু ব্যক্তির রূপটি সম্যকভাবে পরিস্ফুট না হওয়ায়, শিল্প হিসাবে তা' অসুন্দর। অন্যপক্ষে যে ব্যক্তিরূপ ব্যক্ত করা হয়েছে সেই ব্যক্তিটি আমাদের কাছে ঘৃণার পাত্র হতেও পারে, কিন্তু রূপটি সুব্যক্ত হওয়ায় শিল্পটি সুন্দর হতে পারে। অতএব শিল্পের সংজ্ঞা দিতে যেয়ে, এ কথা বলা যথেষ্ট নয় যে শিল্প হচ্ছে তাই যা' আনন্দ সৃষ্টি করে। যখনই আমরা আনন্দকে কোন বিশেষণ দ্বারা বিশেষিত তথা সীমাবদ্ধ করি—শিল্পের আনন্দকে 'শৈল্পিক' আনন্দ, উচ্চতর ইন্দ্রিয়ের আনন্দ, খেলার আনন্দ, আত্মশক্তি-উপলব্ধির আনন্দ, সমালোচনার আনন্দ প্রভৃতি আখ্যা দ্বারা বিশেষিত করি, তখনই আনন্দকে আর শিল্পের বৈশেষিক লক্ষণ বলে মনে করিনে।

(৩) তৃতীয় তাৎপর্য এই যে শিল্পকে নৈতিক ব্যাপার বলে গণ্য করা চলে না। নৈতিক ব্যাপার বিশেষ ধরনের 'practical act', এবং শিল্প হচ্ছে —'theoretic act'। সুতরাং নৈতিক ব্যাপার হতে পারে না। (And

since it is not the result of an act of will, so it escapes all moral discrimination)।

(৪) চতুর্থ তাৎপর্য হচ্ছে—শিল্প কোন সংজ্ঞাত্মক জ্ঞান নয় (we deny that it has the character of conceptual knowledge)। সংজ্ঞাত্মক জ্ঞান স্বরূপতঃ দার্শনিক তত্ত্ব-জ্ঞান, বস্তু-সত্তার জ্ঞান ; এর উদ্দেশ্য অবাস্তবের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে বাস্তবকে প্রতিষ্ঠিত করা। মোট কথা—সংজ্ঞাত্মক জ্ঞানে বাস্তব-অবাস্তব চেতনা বিশেষভাবে কাজ করে থাকে। কিন্তু প্রতিভানে সে চেতনা থাকে না—(intuition means, precisely indistinction of reality and unreality, the image with its value as mere image) প্রতিভান যেন চৈতন্য ক্রিয়ার স্বপ্নাবস্থা আর দর্শন জাগ্রদাবস্থা।

সুতরাং শিল্পী শিল্পকর্মের মধ্যে যা' ব্যক্ত করেছেন তা' পরমার্থতঃ বা ইতিহাসতঃ সত্য কি মিথ্যা এ প্রশ্নই অবান্তর ; কারণ সত্য-মিথ্যা বিচার সেখানেই সম্ভব যেখানে বস্তু-সত্তা সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্ত করা হয়। এ আপত্তিও নিরর্থক যে সামান্য-নিরপেক্ষ ভাবে কোন বিশেষ থাকতে পারে না এবং পারে না বলেই প্রত্যেকটি প্রতিরূপ সামান্য রূপেরই বিশেষ অভিব্যক্তি। কারণ আমরা এ কথা মানিনে যে প্রতিভানে সামান্যকেই ন্যায়সম্মতভাবে উপস্থাপিত বা চিন্তা করা হয়।

শিল্পের স্বধর্ম হচ্ছে—ধ্যানস্বরূপতা (Ideality is the intimate virtue of art)। শিল্পের মধ্যে যে পরিমাণে ভাবনা ও সিদ্ধান্ত মেশে সেই পরিমাণে শিল্পত্বের হানি ঘটে। শিল্প যেখানে শিল্পী না হয়ে সমালোচক হয়ে দাঁড়ায় ; রসিক না হয়ে ভাবুক হয়—'meditative observer of life' হয়, সেখানেই শিল্পের মৃত্যু ঘটে।

(৫) শিল্প যেমন দর্শন থেকে পৃথক, তেমনি 'পুরাণ' (Myth) থেকেও পৃথক। পুরাণে যাঁরা বিশ্বাস করেন, পুরাণ তাঁদের কাছে সত্যের বা পরমার্থ-জ্ঞানের প্রকাশ। পুরাণ তাঁদের কাছেই শিল্প যারা পুরাণে বিশ্বাস করেন না, পুরাণকে রূপক বলে মনে করেন, কল্পনা বলে গ্রহণ করেন। যাঁরা বিশ্বাসী

তাঁরা পুরাণকে 'ধর্ম' ব'লেই মানেন। ধর্ম হচ্ছে দর্শন—অসম্পূর্ণ দর্শন, যেমন দর্শন হচ্ছে বিশুদ্ধ বা বিস্তারিত ধর্ম—পরম ব্রহ্মের বা সনাতন সত্তার চিন্তা। পুরাণ ও ধর্মের সঙ্গে সত্যাসত্য-বিচার মিশে থাকে, শিল্পে চিন্তার লেশমাত্র থাকে না। (Art lacks the thought that is necessary ere it can become myth and religion, and the faith that is born of thought; the artist neither believes nor disbelieves in his images, he produces it :)

(৬) শিল্পকে প্রতিভান বলার আর এক তাৎপর্য এই যে, শিল্পকে 'production of classes and types, species and genera' অথবা—'an exercise of unconscious arithmetic' বলে স্বীকার করা হয় না। অর্থাৎ শিল্পকে বিজ্ঞান এবং গণিতশাস্ত্র থেকে পৃথক বলে স্বীকার করা হয়। বিজ্ঞানে ও গণিতে 'Conceptual form as mere general representation or mere abstraction'রূপে ব্যক্ত হলেও, অর্থাৎ—ideality থাকলেও তাদের—'generalisation and abstraction'—'practical acts'। অতএব শিল্পের শত্রু। বিজ্ঞানের ও গণিতের সঙ্গে শিল্পের সম্পর্ক জল আর আগুনের মতো চিরশত্রুর সম্পর্ক।

শিল্পের প্রতিভানত্বের তাৎপর্যগুলি বুঝতে না পেরেই অনেকেই শিল্পকে দর্শন, অথবা ধর্ম অথবা ইতিহাস, অথবা বিজ্ঞান প্রভৃতির সঙ্গে গুলিয়ে ফেলেছেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে, শেলিঙ এবং হেগেল শিল্পকে ধর্ম ও দর্শনের সঙ্গে মিশিয়ে ফেলেছেন ; তেইন প্রকৃতি-বিজ্ঞানের সঙ্গে, ফ্রান্সের বাস্তববাদীরা (verists) ঐতিহাসিক তথ্যের সঙ্গে, হার্বার্টপন্থীরা গণিতের সঙ্গে শিল্পকে একাকার করে ফেলেছেন। মন্দের ভালো এইটুকু যে তাঁরা এ কথাটা অন্তত বুঝতে পেরেছেন যে শিল্প হচ্ছে—theoretic activity (জ্ঞানাত্মিকা ক্রিয়া) এবং উৎকল্পনা ও কল্পনার পার্থক্য, শিল্প ও তত্ত্বচিন্তার পার্থক্য নির্দেশ করতে যেয়ে সত্যের রাজ্যে পৌঁছে গেছেন।

কিন্তু শিল্পকে প্রতিভান বা কল্পনা বা রূপ বলে স্বীকার করলেই সব সমস্যার সমাধান হয়ে যায় না। বাইরের দ্বন্দ্ব মিটে যায় বটে কিন্তু ভিতরে

(within the field of images) এক দ্বন্দ্ব দেখা যায়। রূপের কোন্ বৈশিষ্ট্যে রূপ শিল্পের মর্যাদা পাবে? কোন্ রূপকে খাঁটি রূপ বলা হবে এবং কেনই বা বলা হবে? যে রূপের দার্শনিক, ঐতিহাসিক, ধর্মীয়, বৈজ্ঞানিক, নৈতিক প্রভৃতি মূল্যের কোনও একটিও নেই, সেই বিশুদ্ধ প্রতিরূপের প্রয়োজন কি? বিশুদ্ধ প্রতিরূপের জগৎ অলস স্বপ্নের জগৎ ছাড়া আর কি?

এ কথা সত্য বটে যে প্রতিভান প্রতিরূপ সৃষ্টি করে, কিন্তু এ কথা ঠিক নয় যে প্রতিভান—এলোমেলো প্রতিরূপ, পুরাতন প্রতিরূপের স্মরণ, একের পর এক প্রতিরূপকে সাজিয়ে যাওয়া এবং প্রতিরূপের সঙ্গে অন্য প্রতিরূপকে খেয়ালখুসী মতো জুড়ে দেওয়া—ঘোড়ার কাঁধে মানুষের মাথা বসিয়ে দেওয়া—শিশুর খেলা বিশেষ। প্রতিভানের সঙ্গে মিথ্যা কল্পনার পার্থক্য এখানেই যে প্রতিভান 'একক' বা 'বহু-সমবায়ে-এক' এককেন্দ্রিক একটি নিটোল প্রতিরূপ বৃত্ত এবং কৃত্রিম কল্পনা কেন্দ্রহীন প্রতিরূপপরম্পরা। উনবিংশ শতাব্দীতে imagination এবং fancy-র পার্থক্য নির্ণয় করবার যে চেষ্টা হয়েছে তাতেই উভয়ের স্বরূপ ব্যক্ত হয়েছে। সে যাই হোক প্রশ্ন দাঁড়াচ্ছে এই—বিশুদ্ধ প্রতিরূপের প্রয়োজন কি? কি করে বিশুদ্ধ প্রতিরূপ জন্মলাভ করে?

এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার ভালো উপায় হচ্ছে—অসম্বদ্ধ উৎকল্পনা থেকে শৈল্পিক প্রতিভানকে পৃথক করার জন্য যে সব মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে, তাদের সমালোচনা করা, ঐক্যতত্ত্বের স্বরূপ বিচার করা এবং কল্পনার সৃজনধর্মিতা প্রমাণ করা।

বলা হয়েছে শৈল্পিক প্রতিরূপ হচ্ছে সেই প্রতিরূপ যা' 'unites the intelligible with the sensible, and represents an idea' অর্থাৎ যা তত্ত্বকে রূপের মাধ্যমে ব্যক্ত করে—ভাবকে রূপের মধ্যে অঙ্গদান করে। এই ধারণা পোষণ করলে কল্পনাকে শেষ পর্যন্ত বুদ্ধির এলেকার, শিল্পকে দর্শনের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে ফেলা হয় এবং শেষ পর্যন্ত—শিল্পকে রূপক (allegory) বলেই গণ্য করতে হয়। রূপক হচ্ছে—'the external union, the conventional and arbitrary juxtaposition of two spiritual acts, a concept or thought and an image, where it is assumed that

this image must represent *that* concept.'—দু'টি আত্মিক ক্রিয়ার বাহ্যিক সংযোগ,—সংজ্ঞা বা চিন্তা এবং প্রতিরূপ এই দু'টি আত্মিক ক্রিয়ার প্রথানুসারে বা খেয়ালানুসারে সমাবেশ ঘটানো। এবং এই মনে করেই ঘটানো যে এই প্রতিরূপের দ্বারা ঐ সংজ্ঞাটি উপস্থাপিত হবে। কিন্তু এতে শুধু যে শৈল্পিক প্রতিরূপের অখণ্ডত্বই খণ্ডিত হয় তাই নয়, ইচ্ছা করে দ্বিধার সৃষ্টির করা হয়—চিন্তা বা তত্ত্ব এবং প্রতিরূপের মধ্যে অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ স্থাপিত হয় না। তত্ত্ব চিন্তা করতে যেয়ে রূপের কথা ভুলে যেতে হয় এবং রূপ উপভোগ করতে যেয়ে চিন্তার কথা ভুলে যেতে হয়।

রূপকবাদীদের দ্বৈতবাদের সমাধান করতে যেয়ে প্রতিভান-বাদকে সূক্ষ্মতর করার চেষ্টা করা হয়ে থাকে এবং বলা হয়ে থাকে—প্রতিভানকে 'সংকেত' (symbol) বলে মনে করা হয়ে থাকে। কারণ সংকেতে ভাব ও রূপের স্বতন্ত্র সত্তা থাকে না—রূপ থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে ভাবকে চিন্তা করা যায় না, অথবা ভাবনিরপেক্ষ হয়ে সংকেত স্বতন্ত্র রূপ নিয়ে থাকতে পারে না। শর্করাখণ্ড এক গ্লাস জলের মধ্যে গলে গিয়ে যে-ভাবে জলের প্রতিটি অণু-পরমাণুর সঙ্গে মিশে যায়, তেমনি ভাব বা তত্ত্ব রূপের মধ্যে সম্পূর্ণ বিগলিত হয়ে যায় 'the idea does not stand by itself in the symbol, thinkable separately from the symbolizing representation, nor does the symbol stand by itself, representable in a living manner without the idea symbolized)। কিন্তু যে ভাবটি অন্তর্হিত হয়েছে, যে ভাবটি সম্পূর্ণ রূপের দেহে বিলীন হয়ে গেছে, যে ভাবটিকে আমরা আর ভাব রূপে ধরতে পারিনে, সে আর ভাব থাকে না, সে—'is only the sign that the unity of the artistic image has not yet been achieved'। নিশ্চয়ই শিল্প সংকেত; সংকেতময়, তাৎপর্যময়, কিন্তু প্রশ্ন—কিসের সংকেত?—তার অর্থ কি? প্রতিভান তখনই শিল্প—তখনই খাঁটি প্রতিভান—যখন তা' 'not a chaotic mass of images only when it has a vital principle that animates it, making it all one *with itself*.' অর্থাৎ যখন তা' *প্রতিরূপের অরাজক সমাবেশ মাত্র নয়,*

যখন তা' একটি প্রাণশক্তির অভিব্যক্তি। সুতরাং প্রশ্ন—কি ঐ প্রাণশক্তি (vital principle) ?

শিল্পতত্ত্বের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় যে দ্বন্দ্ব, সেই রোমান্টিসিজিম ও ক্লাসিসিজিমের দ্বন্দ্বের স্বরূপ বিচার করে দেখলেই এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে।

রোমান্টিসিজিমের সাধারণ সংজ্ঞা দিতে দিয়ে গিয়ে বলা যায়—রোমান্টিসিজিম শিল্পের কাছে আবেগের, প্রেমের ও ঘৃণার, বেদনার ও আনন্দের, নৈরাশ্যের ও উদ্দীপনার স্বতঃস্ফূর্ত এবং সুতীব্র উচ্ছ্বাস দাবি করে এবং ঝাপসা, অস্পষ্ট, ভাঙা ভাঙা প্রতিরূপ পেয়েই সন্তুষ্ট থাকে, অস্পষ্ট সংকেত, অসম্পূর্ণ অভিব্যক্তি, শক্তিমান এবং এলোমেলো রূপ নিয়েই পরিতৃপ্ত হয় (Romanticism asks of art, above all, the spontaneous and violent effusion of the affections, of love, and hate, of anguish and joy, of despair and elation ; and is willingly satisfied and pleased with vaporous and indeterminate images,broken and allusive in style, with vague suggestions, with approximate phrases, with powerful and confused sketches)। অন্যপক্ষে ক্লাসিসিজিম ভালোবাসে—শান্ত আত্মা,বিজ্ঞ পরিকল্পনা,বিশিষ্টতাপূর্ণ,সুস্পষ্টাকার, সুচিন্তিত, সুসমঞ্জস, সুপরিস্ফুট মূর্তি এবং রূপ-পরিকল্পনার (representation) দিকে বেশী ঝোঁক দেয় (Classicisim loves the peaceful soul, the wise design, figures studied in their characteristics and precise in outline, ponderation, equilibrium, clarity and resolutely tends toward representation)। এই দুই পক্ষের প্রত্যেকেই অন্য পক্ষের ত্রুটি দেখাতে পারে। রোমান্টিকরা বলতে পারে—সৃষ্টি যতোই প্রতিরূপসমৃদ্ধ হোক, যদি হৃদয়েই কোন সাড়া না জাগায় তবে সে সুন্দর রূপ দিয়ে কি হবে? রূপে সুন্দর না হলেও যদি সৃষ্টি হৃদয়ে আবেগ জাগাতে সক্ষম হয় তা' হলেই তা' সার্থক। ক্লাসিসিজিমের পক্ষ বলতে পারে—খানিকটা আবেগের আন্দোলন দিয়ে কি হবে যদি আত্মা কোন সুন্দর রূপ উপলব্ধি না করে? রূপটি যদি সুন্দর হয়, যদি আমাদের রুচি তৃপ্ত হয় তা'

হলেই যথেষ্ট। কিন্তু এই দুই পক্ষের কোন পক্ষই সম্পূর্ণ সত্যকে ব্যক্ত করে না তারা আংশিক সত্যকে ব্যক্ত করে। কারণ যাঁরা মহান শিল্পী,তাঁদের সৃষ্টি একাধারেই রোমান্টিক এবং ক্লাসিক,একাধারে ভাব এবং রূপ-কল্পনা—'a vigorous feeling which has become almost brilliant representation'।

এর থেকে এই সূত্রই পাওয়া যায় যে আবেগই হচ্ছে প্রতিভানের সেই প্রাণশক্তি যা' তাকে সংগতি ও ঐক্য দান করে (what gives coherence and unity to the intuition is feeling : the intuition is really such because it represents a feeling, and can only appear from and upon that)। শিল্প হচ্ছে—রূপের বৃত্তে আবদ্ধ আবেগ (aspiration enclosed in the circle of representation)। গীতিকাব্যই হোক আর মহাকাব্যই হোক অথবা নাটকই হোক—সবই স্বরূপত 'Lyrical' (Artistic intution is always lyrical intuition)। শিল্প আবেগেরই প্রকাশ এই কথাটি সমর্থন করতে জনৈক ইংরেজ সমালোচক সুন্দর একটি কথা বলেছেন—বলেছেন, 'all the arts tend to the condition of music'। অবশ্য শৈল্পিক প্রতিরূপের জন্ম আবেগেরই গর্ভে এ কথা স্বীকার করলে, এই কথাই বলা উচিত 'all the arts are music'। জনৈক সুইস শিল্পদার্শনিকের—'every landscape is a state of the soul' উক্তিটিও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। শিল্পে যে প্রাকৃতিক দৃশ্য উপস্থাপিত হয় তা বাহ্যতঃ দৃশ্য বা রূপ বটে, কিন্তু আসলে তা স্রষ্টার 'state of the soul' অর্থাৎ বিশেষ ভাবমাত্র। প্রত্যেক সার্থক সৃষ্টিতে ভাব (a state of the soul) সম্পূর্ণ রূপ (imaginative form) পরিগ্রহ করে। আর অসার্থক সৃষ্টি বলতে বুঝায় সেই সৃষ্টি যাতে অসমন্বিত বিভিন্ন ভাবের (states of soul) দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়, সার্থক প্রতিভান organic এবং অসার্থক প্রতিভান—mechanical।

দ্বিতীয় অধ্যায়

শিল্প সম্বন্ধে কয়েকটি কুসংস্কার

(ক) আধেয় (Content) এবং আধারের (form) পার্থক্য।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে শিল্পতত্ত্বে এই পার্থক্যকে কেন্দ্র করে দু'টি শাখা দেখা দিয়েছিল। এক—আধেয়বাদী শিল্পতত্ত্ব (Gehaltsaesthetik), দুই—আধারবাদী শিল্পতত্ত্ব (formaesthetik)। নিম্নলিখিত প্রশ্ন বা সমস্যা থেকেই ঐ দু'টি শাখার উৎপত্তি হয়েছিল—

(১) শিল্পের শিল্পত্ব কি শুধুমাত্র আধেয়তে অথবা শুধুমাত্র আধারে নিহিত? অথবা আধেয় ও আধার উভয়ের মধ্যেই নিহিত?

(২) আধেয়ের স্বরূপ কি? আধারের স্বরূপ কি? একদল বললেন—শিল্পের আত্মা আধেয়তে বা বস্তুতে নিহিত এবং সেই আধেয় হচ্ছে আনন্দ অথবা নীতি অথবা ধর্ম বা দর্শন, অথবা সৌন্দর্য। অন্যদল বললেন—শিল্পে আধেয় নিমিত্ত বা উপলক্ষ্য মাত্র—সুন্দর সুন্দর রূপ সৃষ্টির অবলম্বন মাত্র (a peg or hook from which beautiful forms are suspended)। আধার বা রূপই আসল—শৈল্পিক রুচির একমাত্র পরিতোষক; ঐক্য, সামঞ্জস্য, সঙ্গতি প্রভৃতিই একমাত্র উপভোগ্য।

এক পক্ষ 'আধেয়' বা বস্তুকে করলেন মুখ্য এবং 'আধার' বা রূপকে করলেন গৌণ; অন্যপক্ষ 'আধারকে' করলেন মুখ্য এবং 'আধেয়কে' করলেন গৌণ। আধেয়বাদীরা বললেন—আধেয় আধার বা রূপের সুযোগ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে থাকে এবং আধারবাদীরা বললেন—আধেয় গৌণ হলেও, শিল্পমূল্য বিচারে আধেয়ের কোন স্থান না থাকলেও, শিল্পের সামগ্রিক মূল্যের হিসাবে আধেয়ের মূল্যও অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে। ঊনবিংশ শতাব্দীর জার্মানীতে হেগেলপন্থী এবং হার্বার্টপন্থীদের মধ্যে আধেয় ও আধারের আপেক্ষিক গুরুত্ব নিয়ে প্রচণ্ড বাদবিতণ্ডা চলেছিল। শুধু জার্মানীতেই যে এই বাদ-প্রতিবাদ সীমাবদ্ধ হয়ে ছিল তা' নয়, প্রত্যেক দেশেই, শিল্পতত্ত্ববিদ্‌রা

দুই শিবিরে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিলেন। শিল্পতত্ত্বের ইতিহাস পর্যালোচনা করতে গেলে দেখা যাবে—প্রাচীনযুগে, মধ্যযুগে, আধুনিক যুগে এবং অতি-আধুনিক যুগেও—এই দুই পক্ষের দ্বন্দ্ব চলেছে। হামেশাই এসব কথা শোনা যায়—নাটকখানি রূপে খুব সুন্দর, কিন্তু বিষয়বস্তুতে ব্যর্থ; কবিতাটির 'ভাব' খুব বড়, কিন্তু কুৎসিত ছন্দে রূপ দেওয়া হয়েছে।······ চিত্রকর খুবই বড় চিত্রকর হতে পারতেন যদি না তিনি তার পরিকল্পনা ও বর্ণপ্রয়োগ শক্তিকে 'অতো তুচ্ছ ও অযোগ্য বস্তু'তে প্রয়োগ না করতেন······।

কেন এই সব মতবাদ দেখা দিয়েছে তা' আমরা জানি। যেটুকু আলোচনা করা হয়েছে তা' থেকে সকলেই বুঝতে পেরেছেন যে এই মতবাদ-গুলি—'have sprung from the trunk of hedonistic, moralistic, conceptualistic or physical conceptions of art'। কিন্তু কৌতুকের বিষয় এই যে একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে—আধেয়বাদীরা আধারবাদীতে এবং আধারবাদীরা আধেয়বাদীতে পরিণত হয়েছেন। হার্বার্টের "সুন্দর আধার" এবং হেগেলবাদীদের "সুন্দর আধেয়" সর্বাংশেই এক, কারণ উভয়ই—"nothing"—অসৎ। আধেয়বাদীরা (হার্টমানের—ফিলোসফি ডেস শোনেন—philosophie des schonen দ্রষ্টব্য)—'সুন্দর আধেয়' নির্ধারণ করতে যেয়ে, beautiful, sublime, comic, tragic, humouristic, pathetic, idyllic, sentimental প্রভৃতি—এমন কি 'ugly'-কেও—'সুন্দর আধেয়ে'র তালিকায় স্থান করে দিয়েছেন—এমনিভাবে তারা "whole of reality"কেই আধেয় করে তুলেছেন এবং আধেয়ের বিশিষ্টতার গণ্ডী ভেঙ্গে ফেলে দিয়ে, নিজেদের মতবাদেরই গোড়া কেটে দিয়েছেন। অন্যপক্ষে আধারবাদীরা সুন্দর আধারের ব্যাখ্যা করতে যেয়ে "harmony of form with content"-এর অবতারণা করেছেন এবং এই কথাই শেষ পর্যন্ত মানছেন যে শিল্প 'relation of the beautiful content with the beautiful form'। অর্থাৎ আধেয়ের গুরুত্ব স্বীকার করছেন।

আসল সত্য এই :—শিল্পে আধেয়কে ও আধারকে স্পষ্টভাবে পৃথক করতে হবে বটে, কিন্তু পৃথক পৃথক করে 'শৈল্পিক' বিশেষণে বিশেষিত করা চলবে না।

কারণ, তাদের যে সম্বন্ধ তা' শৈল্পিক সম্বন্ধ মাত্র। অর্থাৎ তাদের ঐক্য নৈর্ব্যক্তিক নির্জীব ঐক্য নয়—সব্যক্তিক ও সজীব ঐক্য—একটা নির্বিকল্পক সংশ্লেষ। শিল্প হচ্ছে প্রতিভানের মধ্যে আবেগের ও প্রতিরূপের নির্বিকল্পক শৈল্পিক সংশ্লেষ। এই সংশ্লেষ সম্বন্ধে বলা যায়—প্রতিরূপ ছাড়া আবেগ অন্ধ এবং আবেগ ছাড়া প্রতিরূপ শূন্য। (Content and form must be clearly distinguished in art, but must not be separately qualified as artistic , precisely because their relation only is artistic—that is, their unity, understood not as an abstract, dead unity, but as concrete and living, which is that of the synthesis a priori; and art is a true aesthetic synthesis a priori of feeling and image in the intuition as to which it may be repeated that feeling without image is blind and image without feeling is void.)

শিল্পীর কাছে, সংশ্লেষের বাইরে আবেগের ও প্রতিরূপের কোন অস্তিত্ব নেই। এই সংশ্লেষের বাইরে যে আবেগ সে নিছক ব্যক্তিগত আবেগ (practical aspect of the spirit) এবং যে প্রতিরূপ সে শিল্পের নির্জীব অবশেষ, শুক্‌নো পাতা, কল্পনা বায়ুর শিকার। কারণ শিল্প কোনরকম কৃত্রিম কল্পনা নয় বা বিক্ষোভকারী আবেগও নয়—এই স্তরের ঊর্ধ্বে আর একটি আবেগ যে—'longing to create and to contemplate with the joy and anguish of artistic creation'। যদি এ ধারণা আমাদের স্থির থাকে যে—'the content is formed and the form filled, that feeling is figured and the figure a figure that is felt' তা'হ'লে আধেয় ও আধারের মধ্যে কে মুখ্য কে গৌণ এ প্রশ্ন অবান্তর বলেই মনে হবে। তবে যিনি শিল্পের স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠিত করতে বিরুদ্ধবাদীদের সঙ্গে সার্থক সংগ্রাম করে গেছেন এবং 'form' শব্দটি দ্বারা স্বাতন্ত্র্যকে চিহ্নিত করেছেন, সেই শ্রদ্ধেয় ডি স্যাঙ্কটিস্ (De Sanctis)-এর প্রতি সম্মান দেখানোর জন্যই—প্রতিভানবাদী শিল্পতত্ত্বকে "এস্থেটিক অফ ফর্ম" বলা যেতে পারে।

এখানেই একটি আপত্তি উত্থাপন করতে পারেন—প্রতিভানবাদী শিল্পতত্ত্ব যেহেতু আবেগ বা আত্মার অবস্থাকে শিল্পের আধেয় বলে গণ্য করে, সেইহেতু তা' প্রতিভানের গণ্ডীর বাইরে গিয়ে দাঁড়িয়েছে এবং এই কথাই বলতে চেয়েছে যা' আবেগ বা আত্মার অবস্থা নয় তা' শিল্পের আধেয় হতে পারে না। [It is useless to refute an objection that certainly might be made (but rather with the sophistry of the advocate than with the acuteness of the scientist), namely, that the aesthetic of the intuition also, since it describes the content of art as feeling or state of the soul, qualifies it outside the intuition and seems to admit that a content which is not feeling or a state of the soul, does not lend itself to artistic elaboration and is not an aesthetic content.] কিন্তু কুতার্কিকরা ভুলে যান—আবেগ বা আত্মার অবস্থাটি, বিশিষ্ট কোন আধেয় বা বস্তু নয়, সমগ্র বিশ্বকে প্রতিভানের রূপে বা অধীনে দেখা—(the whole universe seen sub specie intuitionis),—তা' কোন চিন্তা নয় যা' সমস্ত জগতকে জ্ঞানের অধীনে ভাগ করতে চায়; প্রাকৃত বস্তু ও গাণিতিক বিষয় নয় যা সমস্ত জগৎকে বিভিন্ন শ্রেণীর অধীনে ভাগ করে এবং ইচ্ছাও নয় যা' সমগ্র বিশ্বকে বাসনার অধীনে লাভ করতে চায়।

(খ) আর একটি মিথ্যা ভেদ কল্পনা করা হয়—(তাতেও আধেয় ও আধার শব্দ দুটি প্রয়োগ করা হয়), প্রতিভান (intuition) এবং প্রকাশনের (expression) মধ্যে—প্রতিরূপ ও প্রতিরূপের বস্তু-রূপের মধ্যে। এই ভেদ-কল্পনায় একদিকে রাখা হয়—আবেগের রূপকল্পনাকে, মানুষের, প্রাণীর, প্রাকৃতিক দৃশ্যের, ঘটনার, অভিযানের এমনি সব কিছুর প্রতিরূপকে, অন্যদিকে রাখা হয় —শব্দ, সুর, রেখা, বর্ণ প্রভৃতিকে। একটিকে বলা হয় শিল্পের আন্তর উপাদান, অন্যটিকে বাহ্য উপাদান,একটি যথার্থ শিল্প, অন্যটি আঙ্গিক বা করণ (টেকনিক)। কিন্তু সমস্যা এই যে আপাত দৃষ্টিতে ভেদ কল্পনা করা সহজ হলেও, দু'টি স্বতন্ত্র

উপাদানের মিলন কি করে হয় তা' ব্যাখ্যা করতে কেউ পারেননি। কি করে বাহ্য আন্তরের সঙ্গে যুক্ত হবে এবং তাকে প্রকাশ করবে? কি করে শব্দ বা বর্ণ, শব্দ বিনা বর্ণ বিনা প্রতিরূপকে প্রকাশ করবে? অশরীরী কি করে শরীরী হবে? একই ক্রিয়ায়,স্বতঃস্ফূর্ত কল্পনা, ভাবনা এবং অঙ্গ-রচনা যুগপৎ সম্ভব হবে? একবার প্রতিভানকে প্রকাশ থেকে পৃথক করলে রহস্যময় যোগ কল্পনা না করা পর্যন্ত আর তাদের মিলিত করা যাবে না। সুতরাং দেখা যাক—প্রকাশ ছাড়া প্রতিভান ধারণা করা যায় কি না। বস্তুতঃ আমরা প্রকাশিত প্রতিভানদেরই দেখে থাকি। চিন্তা যতক্ষণ শব্দমূর্তি পরিগ্রহ না করে, ততক্ষণ চিন্তাই নয়, গীতি-রূপকে তখনই আমরা পাই যখন তা' ধ্বনি-রূপে ব্যক্ত হয়—চিত্র তখনই চিত্র হয় যখন বর্ণিত হয়। শব্দহীন চিন্তা, স্বরহীন গান, বর্ণহীন চিত্র সম্ভব নয় (Thought, musical fancy, pictorial image did not indeed exist without expression, they did not exist at all, previous to the formation of this expressive state of the spirit)। শব্দহীন চিন্তার, স্বরহীন গানের এবং বর্ণহীন চিত্রের অস্তিত্বে বিশ্বাস সরলতার নিদর্শন হতে পারে, কিন্তু এই সরলতা আর এমন কোন শিল্পীর অস্তিত্বে বিশ্বাস যার মনে ভাব ও কল্পনা গিজগিজ করে অথচ যিনি ঐ ভাবকে রূপ দিতে পারেননা, একই ব্যাপার। শিল্পকে যখনই আমরা 'প্রতিভান' বলছি, তখনই আমরা প্রতিভান-বহির্ভূত বস্তু-জগতের সত্তা (existence of a physical world outside of it) অস্বীকার করছি—বিষয়ী ও বিষয়ের সমান্তরাল অস্তিত্ব অস্বীকার করছি এবং উভয়ের অসম্ভব সংযোগের কল্পনা বর্জন করছি। কারণ প্রতিভান স্বয়ংসম্পূর্ণ ব্যাপার। প্রকাশ ছাড়া প্রতিরূপ যেমন সম্ভব নয়, তেমনি যে প্রতিরূপ প্রকাশ হবে তা' সম্ভব। একটি কবিতা থেকে ছন্দ মাত্রা এবং শব্দ বাদ দিলে কবিতার অস্তিত্বই থাকে না (poetry is born as these words, that rhythm and that metre)।

কিন্তু যে কথা গোড়াতেই বলেছি—কোন ভুলই অবিমিশ্র ভুল নয়, ভুলের মধ্যেও সত্যের অংশ কিছু কিছু থাকে। প্রতিভান ও প্রকাশ

অবিচ্ছেদ্য হওয়া সত্ত্বেও, তাদের মধ্যে যে ভেদকল্পনা হয়েছে তার মূলে একটুখানি সত্য আছে। কল্পনা ও অঙ্গ-নির্মাণ এই দু'টি ব্যাপারের মধ্যে যে ভেদকল্পনা করা হয় তা' যুক্তিযুক্ত। শিল্পের মূল এলেকার মধ্যে না হলেও, আত্মার সমগ্র সত্তার মধ্যে তারা পরস্পরসম্বন্ধ এবং সংযুক্ত। অঙ্গ-নির্মাণ ব্যাপারের সমস্যা শিল্পীর সম্মুখে একটি বাস্তব সমস্যাই বটে। যে শিল্পীর মন প্রতিভানে পরিপূর্ণ—তিনি তো একটি সম্পূর্ণ ব্যক্তি (whole man), অতএব—কর্মী ব্যক্তিও (practical man)। তাই তিনি তাঁর আত্মিক ক্রিয়ার ফলগুলি রক্ষা করবার জন্য চেষ্টিত হন তথা প্রতিরূপ বা প্রতিভানের পুনরুপস্থাপনার (reproduction) ব্যবস্থা করতে উদ্যোগী হন (hence he engages in practical acts which assist that work of reproduction.)। এই অঙ্গনির্মাণ-ক্রিয়া (practical acts) অন্যান্য কর্মের মতোই জ্ঞাননিয়ন্ত্রিত এবং সেই কারণেই "টেকনিকাল" নামে অভিহিত। আর যেহেতু তারা কর্মাত্মিকা ক্রিয়া, জ্ঞানাত্মিকা ক্রিয়া নয়, জ্ঞানক্রিয়ার বহির্ভূত, সেই হেতু তাদের "ফিজিকাল" বলা হয়। এই ভাবে শব্দের সঙ্গে লেখার, গীতের সঙ্গে স্বরলিপির, চিত্রের সঙ্গে চিত্রিত পট, কাষ্ঠফলক ও দেওয়ালের এবং ভাস্কর্যের পাথরে-গড়া লোহা-ব্রোঞ্জ-প্রভৃতি ধাতুতে-গড়া মূর্তির সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপিত হয়েছে। এই দু'টি ক্রিয়া এতো স্বতন্ত্র যে—it is possible to be a great artist with a bad technique, অর্থাৎ মন্দ টেকনিক নিয়েও বড় শিল্পী হওয়া সম্ভব।

কিন্তু যা' অসম্ভব সে হচ্ছে বড় কবি হয়ে মন্দ কবিতা লেখা, বড় চিত্রকর হওয়া অথচ বর্ণে আভা সৃষ্টি করতে না পারা, বড় গায়ক হওয়া অথচ সুর-সঙ্গতি সৃষ্টি করতে না পারা—এক কথায় বড় শিল্পী হয়ে প্রকাশ করতে না পারা। তাইতো রাফেল সম্বন্ধে বলা হয়েছে—হাত দু'খানি না থাকলেও রাফেল বড় চিত্রশিল্পী হতে পারতেন—হতে পারতেন তাঁর 'sense of design and colour'-এর জন্যই।

প্রতিভানের এই সব বস্তুরূপে রূপান্তর গ্রহণকে আমরা অভাবের এবং শ্রমের নানারকম বস্তু-সামগ্রীতে রূপান্তরিত হওয়ার সঙ্গে তুলনা করতে

পারি এবং এর জন্যই লোকে শুধু 'শিল্পবস্তু' (artistic things) এবং "সুন্দর বস্তু"র (beautiful things) কথাই বলে না, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের (beautiful of nature) কথাও বলে। একথা ঠিক যে, প্রতিরূপ পুনরুপস্থাপনের উপায়স্বরূপ যে সব বস্তু নির্মাণ করা হয় তারা ছাড়াও, এমন অনেক প্রাকৃতিক বা মানবকৃত বস্তু আছে যারা পুনরুপস্থাপনের কাজ করে থাকে অর্থাৎ are more or less adapted to fixing the memory of our intuitions—প্রতিভানের স্মৃতি উদ্বোধিত করতে সক্ষম। এই সব বস্তুকেই 'প্রাকৃতিক সৌন্দর্য' (natural beauties) বলা হয় এবং তখনই তারা আমাদের মুগ্ধ করে যখন আমরা তাদের শুধু শিল্পীর চোখেই দেখি। কিন্তু প্রাকৃতিক সৌন্দর্য শিল্পের সৌন্দর্যের তুলনায় ভঙ্গুর ও পলায়নপর, সুতরাং —অবর বা হেয় (Nature is stupid compared with art and that She is "mute" if man does not make her speak.)।

(গ) তৃতীয় ভেদকল্পনা—অবিচ্ছেদ্যের মধ্যে বিচ্ছেদ কল্পনা—শৈল্পিক প্রকাশকে দুই স্তরে ভাগ করা (two moments of expression)—সমুচিত প্রকাশ (propriety of expression) এবং অলংকৃত প্রকাশে (adorned expression) ভাগ করা—এবং তারই ভিত্তিতে প্রকাশকে নিরলংকার (naked) ও সালংকার (ornate) এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করা। বিভিন্ন শিল্পের ক্ষেত্রেই এই ভেদ কল্পনার দেখা পাওয়া যায় বটে কিন্তু সাহিত্য-শিল্পের ক্ষেত্রেই এর প্রাদুর্ভাব বেশী এবং 'অলংকার' (Rhetoric) নামে বিখ্যাত। বহু প্রাচীনকাল থেকে এ চলে আসছে এবং আজও এর উৎপাত কমেনি। এর উপদ্রব শুধু শিল্পতত্ত্বের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ হয়ে নেই, সাহিত্য-সমালোচনার ক্ষেত্রে এবং সাহিত্য ও শিক্ষার ক্ষেত্রেও এ বেশ জাঁক করে বসে আছে। এরই আওতায় 'writing in an inflated, affected and improper form'—প্রশ্রয় পেয়েছে এবং কৃত্রিমতা ও সৌন্দর্য একার্থক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কিন্তু, এই ভেদকল্পনা স্বতোবিরুদ্ধতা-দুষ্ট। কারণ যার মধ্যে এ ভেদকল্পনা করতে চেষ্টা করে—ভেদকল্পনার সঙ্গে সঙ্গেই তার অপমৃত্যু ঘটে-

প্রতিভানত্ব হারিয়ে ফেলে। যথার্থ প্রকাশ সুন্দর হতে বাধ্য, কারণ সৌন্দর্য প্রকাশনের যাথার্থ্য ছাড়া আর কিছুই নয়।

কোন প্রকাশনকে 'নিরলংকার' (naked) বললে যদি এই বুঝায় যে আরো কিছু যোগ না করা পর্যন্ত প্রকাশ সম্পূর্ণ হবে না, তা'হ'লে বুঝতে হবে নিরলংকার প্রকাশ অযথার্থ প্রকাশ—সংক্ষেপে প্রকাশ বা সুন্দর নয়। অন্যপক্ষে সালংকার প্রকাশ যদি সর্বাংশেই প্রকাশ হয়ে উঠে থাকে তবে বুঝতে হবে তা' যথার্থ প্রকাশই হয়েছে। তাকে অলংকৃত বলা না-বলা সমান কথা। প্রকাশ অনলংকৃত বা অলংকৃত যাই হোক, যার মধ্যে—'inexpressive additional, external elements' থাকে, সেই অসুন্দর, কারণ সে যথার্থ প্রকাশে পরিণত হতে পারেনি।

প্রকাশ ও সৌন্দর্য দুটো ভিন্ন সংজ্ঞা নয়; একই সংজ্ঞার দুই ভিন্ন নাম। শৈল্পিক কল্পনা সর্বদাই শরীরী এবং অবাস্তরশূন্য অর্থাৎ অলংকারশূন্য।

এই ভেদকল্পনার মূলে যে উদ্দেশ্য কাজ করেছে তা' হচ্ছে—চিন্তা ও কল্পনার মধ্যে, দর্শন ও কবিতার মধ্যে, তর্কশাস্ত্র ও শিল্পতত্ত্বের মধ্যে সম্বন্ধ নির্ধারণ করা। অনলংকৃত প্রকাশকে বলা হয়েছে—চিন্তার বা দর্শনের প্রকাশ এবং অলংকৃত প্রকাশকে বলা হয়েছে—কল্পনার ও কাব্যের প্রকাশ।

এই ভেদকল্পনা সবচেয়ে বেশী ক্ষতি করেছে ভাষাতত্ত্বের আলোচনায়। ভাষার স্বরূপ আলোচনাকে এ বিপথে নিয়ে গেছে। '' ভাষা এবং কাব্য যে এক এই তত্ত্বটিকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। আমাদের কাছে ভাষা ও কাব্য এক, কারণ শিল্প আমাদের কাছে প্রতিভান এবং প্রতিভান মানেই প্রকাশ এবং প্রকাশ ও ভাষা অভিন্ন। কবির মতোই মানুষ প্রতি মুহূর্তে নিজের প্রত্যয়কে ও আবেগকে প্রকাশ করে এবং সেই প্রকাশের সঙ্গে কবির প্রকাশের মৌলিক কোন পার্থক্য নেই। এখানেই কবির সঙ্গে সাধারণ মানুষের অন্তরঙ্গ যোগ।

আর একটি কুসংস্কারেরর দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেই আমি কুসংস্কারের আলোচনা শেষ করছি। এটি খুবই প্রচলিত কুসংস্কার। এখনও শিল্পের সমালোচনায় ও ইতিহাস-রচনার ক্ষেত্রে এর খুবই প্রতিপত্তি রয়েছে।

এই কুসংস্কারটি হচ্ছে—'the belief in the possibilily of distinguishing several or many particular forms of art, each one determinable in its own particular concept and within its limits and furnished with its proper laws'—শিল্পকে বহু স্বতন্ত্র শ্রেণীতে ভাগ করা যায় এই বিশ্বাস। এই বিভাগ দু'শ্রেণীর। এক শ্রেণীর নাম দি থিওরি অফ আর্টস—অর্থাৎ শিল্পকে কাব্য, চিত্র, ভাস্কর্য, সংগীত, স্থাপত্য, প্রভৃতিতে ভাগ করার পরিকল্পনা। অন্য শ্রেণীর নাম—'থিওরি অফ লিটারারি এ্যাণ্ড আর্টিস্টিক কাইণ্ড্‌স্'—বিশেষ বিশেষ শ্রেণীকে নানা উপশ্রেণীতে ভাগ করা। যেমন, গীতিকাব্য, নাটক, রোমান্স, মহাকাব্য, কমেডি, ট্র্যাজেডি, ধর্মমূলক, সামাজিক, গার্হস্থ্য ইত্যাদি। এর প্রভাবেই সমালোচকরা শিল্পের গুণ বা দোষ বিচার না করে, শিল্প কি পরিমাণে শ্রেণী-বৈশিষ্ট্য গ্রহণ বা বর্জন করেছে তাই বিচার করে সন্তুষ্ট থাকেন। শিল্পের বা সাহিত্যের ইতিহাস যাঁরা লিখেছেন তাঁরাও, তাঁদের ইতিহাসে বিভিন্ন শ্রেণীর বিবরণই লিপিবদ্ধ করেছেন। কিন্তু আসল কথা এই যে শিল্পের শ্রেণীবিভাগ সম্ভব নয়। কারণ প্রত্যেক শিল্পে state of the soul ব্যক্ত হয় এবং আত্মার অবস্থা ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে ভিন্ন এবং প্রতি মুহূর্তেই নতুন এবং প্রত্যেকটি প্রতিভান স্বতন্ত্র। সুতরাং প্রত্যেকটি প্রতিভানের জন্য ভিন্ন ভিন্ন খোপ (pigeon-holes) করা দরকার।

অবশ্য অন্য যুক্তিতে শ্রেণীবিভাগের উপযোগিতা আছে। শিল্পের সৃষ্টি বা বিচারের জন্য শ্রেণীবিভাগের প্রয়োজন নেই বটে, কিন্তু—to collect and to some extent circumscribe the infinite single intuitions, for the use of the attention and of memory—মনোযোগের এবং স্মৃতির ব্যবহারের জন্য অসংখ্য খণ্ড খণ্ড প্রতিভানের শ্রেণীবিভাগ আবশ্যক। তবে এ কথা ভুলে গেলে চলবে না—এর কোন দার্শনিক ভিত্তি নেই। শিল্পমাত্রেই প্রতিভান—ছোট একটু কবিতা এবং বড় একখানি কাব্য শিল্প হিসাবে সমান। তবু—'There must be some mode of arranging, subordinating, connecting, understanding

and dominating the dance of the intuitions, if we do not wish to lose our wits with them'। এই 'mode' আছে এবং তারই নাম 'ইতিহাস'। ইতিহাসে প্রত্যেক শিল্প স্ব স্ব স্থান অধিকার করে থাকে এবং তাদের ক্রমবিন্যাস থেকে আত্মার ক্রমবিকাশের রূপটি উদ্ধার করা যায়।

তৃতীয় অধ্যায়

আত্মায় ও মানবসমাজে শিল্পের স্থান

শিল্পের পরতন্ত্রতা বা স্বতন্ত্রতা নিয়ে রোমান্টিক যুগেই সব চেয়ে উগ্র বাদবিতণ্ডা দেখা দিয়েছিল এবং তখনই "শিল্পের জন্য শিল্প" (art for art's sake) কথাটি এবং তার প্রতিবাদে "জীবনের জন্য শিল্প" (art for life) কথাটি প্রচলিত হয়েছিল। দার্শনিকরা কথা দু'টি নিয়ে খুব মাথা না ঘামালেও শিল্পী, সমালোচক, পণ্ডিতরা যথেষ্ট মাথা ঘামিয়েছেন। বর্তমানে পণ্ডিত সমালোচকদের উৎসাহ আর তেমন নেই তবে নতুন শিক্ষার্থীরা এবং অধ্যাপকরা সমস্যাটি নিয়ে বিতর্ক ও বক্তৃতাদি করে থাকেন। অবশ্য রোমান্টিক যুগের আগেও যে এ নিয়ে আলোচনা না হয়েছে এমন নয় এবং এখনও শিল্পদর্শনের গ্রন্থে প্রশ্নটি আলোচিত হয়ে থাকে।

আসলে, স্বতন্ত্রতা-পরতন্ত্রতা নিয়ে বিতণ্ডা করা—আর শিল্পের অস্তিত্ব আছে কিনা এবং থাকলে তার স্বরূপ কি এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা একই কথা—(to enquire whether art is or is not, and, if it is, what it is)। যদি কোন ক্রিয়ার পদ্ধতি অন্য কোন ক্রিয়ার পদ্ধতির উপর নির্ভরশীল হয়, তাহলে সেই ক্রিয়া আসলে অন্য ক্রিয়াই এবং তার অস্তিত্ব স্বতন্ত্র কিছু নয়—প্রথাসম্মত মাত্র। শিল্প যদি নীতিনির্ভর, আনন্দনির্ভর বা দর্শননির্ভর হয়, তা'হ'লে তা' নীতি, আনন্দ বা দর্শনই—শিল্প নয়। শিল্পকে যদি স্বতন্ত্র কিছু বলে মনে করি, তবে শিল্প নীতি থেকে, আনন্দ থেকে, দর্শন থেকে এবং অন্যান্য বস্তু থেকে কোথায় পৃথক তা' আবিষ্কার করতেই হবে। এমন লোক অনেক আছেন যাঁরা শিল্পের স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করেন বটে, কিন্তু শিল্পের স্থান নির্দেশ করেন অন্য কোন মহৎ বৃত্তির নিচুতে—বলেন, শিল্প হচ্ছে 'নীতির পরিচারিকা, রাজনীতির বধূ এবং বিজ্ঞানের ভাষ্যকার'। এঁরা সেই দলের লোক যাঁরা নিজেদের মত নিজেরাই খণ্ডন করতে ভালবাসেন। এই দলের সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। আমরা আগেই দেখিয়েছি—শিল্প বস্তুজগৎ

থেকে, নৈতিক, অর্থনৈতিক এবং বৌদ্ধিক ক্রিয়া থেকে সম্পূর্ণ পৃথক : শিল্প হচ্ছে প্রতিভান এবং ঐ সিদ্ধান্ত করেই শিল্পের স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করেছি।

** তবে স্বতন্ত্রতা-পরতন্ত্রতার বিতণ্ডার মধ্যে আর একটি সমস্যা নিহিত আছে; ইচ্ছা করেই আমি আগে সে সম্বন্ধে কোন কথা বলিনি। এখন সেই সমস্যাটির বিচার করব। স্বতন্ত্রতা সম্বন্ধ-বিষয়ক সংজ্ঞা (concept of relation) এবং সেই দিক থেকে দেখলে, নিরপেক্ষ স্বাতন্ত্র্য থাকতে পারে একমাত্র পরমার্থের (Absolute)। প্রত্যেকটি বিশেষ পদার্থ এক হিসাবে যেমন স্বতন্ত্র, তেমনি অন্য হিসাবে পরতন্ত্র। অর্থাৎ একই সঙ্গে স্বতন্ত্র ও পরতন্ত্র, তা' না হ'লে আত্মা (spirit) এবং পরম সত্তা (reality) কতকগুলি বিচ্ছিন্ন নিরপেক্ষ সত্তার সমষ্টি অথবা কতকগুলি অসৎপদার্থের সমাবেশে পরিণত হতো। 'রূপের স্বতন্ত্রতা' কথা বললেই সঙ্গে সঙ্গে যে বস্তুর উপরে রূপ কাজ করে, সেই বস্তুকেও বুঝায়। শিল্পের স্বরূপ আলোচনা করতে যেয়ে আমরা যে কথা বলেছি, তাতেই শিল্পকে—'an intuitive formation of a sentimental or passionate material'—বলা হয়েছে। রূপকে নিরপেক্ষ স্বাতন্ত্র্য দিতে গেলে—রূপ বস্তুশূন্য অর্থাৎ অসৎ পদার্থে পরিণত হবে। কিন্তু আমরা যে স্বাতন্ত্র্যের ধারণা করেছি তাতে একটি ক্রিয়াকে অন্য ক্রিয়ার অধীন মনে করতে নিষেধ করা হয়েছে। সুতরাং পরতন্ত্রতার এমন ধারণা করতে হবে যাতে স্বাতন্ত্র্যের ধারণা ব্যাহত না হয় (the dependence must be such as to guarantee the independence)। প্রশ্ন—দুয়ের সমন্বয় কি করে করা যাবে ? যদি বলা যায়—দুটি পরস্পরভারসাম্যরক্ষাকারী শক্তির মতো একটি ক্রিয়া অন্যটির উপর ততখানিই নির্ভরশীল অন্যটি প্রথমটির উপর যতখানি নির্ভরশীল, এবং উভয়ের সম্পর্ক এমন যে এক অন্যকে পরাভূত করে না, তা' হ'লেও সমস্যার সমাধান হয় না। কারণ একে যদি অন্যকে পরাভূত না করে তবে একে অন্যকে অবরুদ্ধ করে (we have reciprocal arrest and stasis); আর যদি পরাভূত করে, তা'হ'লে একে অন্যের অধীন হয়ে পড়ে। অতএব বিভিন্ন আত্মিক ক্রিয়ার যুগপৎ স্বাতন্ত্র্য এবং পারতন্ত্র্য ব্যাখ্যা করার একটিমাত্র পন্থাই আছে এবং সেই পন্থাটি হচ্ছে—'Conceiving

them in the relation of condition and conditioned, in which the conditioned surpasses the condition and presupposes it, and, becoming again in its turn condition, gives rise to a new conditioned, thus constituting a series of development.' অর্থাৎ দু'টি ক্রিয়ার মধ্যে নিমিত্ত-নৈমিত্তিক সম্বন্ধ কল্পনা করা যাতে নৈমিত্তিক নিমিত্ত-সাপেক্ষ হওয়া সত্ত্বেও,নিমিত্তকে অতিক্রম করে যায় এবং নিজেই আবার নিমিত্ত হয়ে নতুন নৈমিত্তিককে জন্ম দেয়। এই নিমিত্ত-নৈমিত্তিক পরম্পরা কল্পনা করার একটিমাত্র ত্রুটি হচ্ছে এই যে প্রথম নিমিত্তের পিছনে কোন নৈমিত্তিক থাকবে না এবং শেষ নৈমিত্তিক আর নতুন নিমিত্ত হবে না। এই ত্রুটিও সংশোধন করা যায় যদি শেষকে প্রথমের নিমিত্ত এবং প্রথমকে শেষের নিমিত্ত করা যায় অর্থাৎ যদি পরম্পরাটিকে পারস্পরিক ক্রিয়ার ফল বা বৃত্তাকার বলে কল্পনা করা যায় 'the series be conceived as reciprocal action or rather (abandoning all naturalistic phraseology) as a circle'—এই ধারণাই সমস্যা সমাধানের একটিমাত্র উপায়। যাঁরা আত্মিক ক্রিয়াকে আত্মার স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র নিরপেক্ষ বৃত্তির কাজ বলে মনে করেন এবং যাঁরা সমস্ত আত্মিক ক্রিয়াকে একটি ক্রিয়ার অধীন বা পরিণাম বলে স্বীকার করেন—এই দুই পক্ষের সমন্বয় করতে পারে শুধু এই ধারণাটিই।

কিন্তু, এই ধারণা খুবই সূক্ষ্ম ও জটিল, সুতরাং এই ধারণা প্রয়োগ না করে, কিভাবে আত্মার মধ্যে শিল্পের জন্ম হয় সেই প্রক্রিয়াটি লক্ষ্য করা যাক। শিল্পী-ব্যক্তি লৌকিক ভাবাবেগের বিক্ষোভ থেকে মুক্ত হতে রূপকল্পনায় প্রবৃত্ত হন তথা শিল্প সৃষ্টি করেন। রূপ রচনা করে তিনি আনন্দ লাভ করেন, কারণ তিনি সেই উদ্দেশ্যেই কাজ করেন। কিন্তু এই আনন্দ কি সুনির্দিষ্ট? (Is the satisfaction definite ?) শিল্পী কি শুধু রূপের আকর্ষণেই আকৃষ্ট হয়েছিলেন? একই সঙ্গে রূপের এবং অন্য কিছুর; শিল্পী হিসাবে রূপের উদ্দেশ্যে, ব্যক্তি হিসাবে অন্য কিছুর উদ্দেশ্যে; প্রথম স্তরে প্রতিরূপের দিকে এবং যেহেতু প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় স্তরের সঙ্গে যুক্ত, দ্বিতীয় ও তৃতীয়

স্তরের দিকে—মুখ্যতঃ প্রথমের দিকে, গৌণতঃ দ্বিতীয় তৃতীয়ের দিকে?' প্রথম স্তরে পৌঁছে যাওয়ার পরেই তিনি দেখেন দ্বিতীয় স্তর তার পিছনে রয়েছে তখন যে দ্বিতীয় আগে গৌণ ছিল তা' প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্যে পরিণত হয়, নতুন চাহিদা উপস্থিত হয়, নতুন প্রক্রিয়ার আরম্ভ হয়। কিন্তু তাই বলে প্রতিভান-শক্তির স্থানে নতুন কোন শক্তির আবির্ভাব ঘটে না, প্রতিভান-শক্তির মধ্যেই নতুন প্রক্রিয়া (process) শুরু হয়। ('Not be it well observed, that the intuitive power gives place to another power, as though taking its turn of pleasure or of service, but the intuitive power itself—or rather the spirit itself, which at first seemed to be, and in a certain sense was, all intuition—develops in itself new process which comes forth from the vitals of the first') একটি আত্মাই তার সমগ্র সত্তা নিয়ে প্রথম একটি বৃত্তির খাত ধরে ব্যক্ত হয় এবং তখন আর কোন শক্তিকে মেনে চলে না; পরে সেই বৃত্তি চরিতার্থ হলে, তা থেকে অন্য রকমের অভাব জাগে এবং সেই অভাব পূরণের চেষ্টা শুরু হয়। তখন আবার 'a new feeling, a new disiring, a new willing, a new passionateness' জাগে এবং আত্মা চায় 'new intuition, a new lyricism, a new art' এমনি ভাবেই বৃত্তটি সম্পূর্ণ হয়—শেষটির সঙ্গে প্রথমটির যোগ স্থাপিত হয়। * [শৈল্পিক, বৌদ্ধিক, আর্থনৈতিক, নৈতিক এই চার বৃত্তির কথা স্মরণে না রাখলে উক্তিগুলির তাৎপর্য উপলব্ধি করা যাবে না—]

* * যাঁরা শিল্পের মধ্যে তত্ত্ব, ইতিহাস গণিত, শ্রেণী, নীতি, আনন্দ প্রভৃতি দেখতে পান, তাঁরা ঠিকই দেখেন, কারণ শিল্পের মধ্যে সব কিছুই থাকে; কারণ আত্মা তো একক। কিন্তু সর্বময় হওয়া সত্ত্বেও শিল্পের শিল্পত্ব ক্ষুণ্ণ হয় না, কারণ ঐ সমস্ত কিছুর শিল্পের মধ্যে উপকরণের বা ফলশ্রুতির মর্যাদা ছাড়া আর কোন মর্যাদাই নেই। শিল্প স্বরূপে প্রতিভান ছাড়া আর কিছুই নয়।

* * শিল্পের মধ্যে হীন নীতি বা দর্শন ব্যক্ত হলেও শিল্পীকে তার জন্য

নিন্দা করা চলে না, কারণ শিল্পী যখন শিল্পী তখন তিনি রূপকার ছাড়া আর কিছুই নন (in so far as he is an artist, he does not act and does not reason, but poetises, sings, and in short, expresses himself.)।

* * এখানেই আর একবার কল্পনার ও যুক্তির সম্বন্ধ, শিল্প বিজ্ঞানের সম্বন্ধ নিয়ে দু' একটি কথা বলব। এই সম্বন্ধের সংস্কার থেকেই কাব্য (poetry) ও গদ্যের (prose) পার্থক্য সন্ধান করার প্রবৃত্তি দেখা দিয়েছে। এরিস্টটলের পোয়েটিক্সে প্রথম এই সমস্যাটির সমাধান করার চেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। তিনি লিখেছেন, ছন্দোবদ্ধ হলেই কাব্য হয় না, কাব্য গদ্যবদ্ধ বা পদ্যবদ্ধ দু'রকমই হতে পারে। আমরা আরো গভীর বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে—প্রতিভান ও সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে প্রশ্নটির আলোচনা করব। আমাদের মতে—কাব্য হচ্ছে প্রতিরূপের প্রকাশ এবং গদ্য হচ্ছে সিদ্ধান্ত বা সংজ্ঞার প্রকাশ। কিন্তু উভয় প্রকাশই, প্রকাশ হিসেবে, স্বভাবে এক; উভয়েই একই শৈল্পিক মূল্যের অধিকারী—(possess the same aesthetic value)। কবি যদি হন ভাবাবেগের প্রকাশক (lyrist of feeling) গদ্যকার ও তার ভাবাবেগের প্রকাশক—অবশ্য তার ভাবাবেগ সংজ্ঞাকে ব্যক্ত করার আবেগ। সনেট-রচয়িতাকে কবি বললে, যিনি 'মেটাফিজিক', 'সোমুমা টিলিয়োলাজ্যিয়া', 'সায়েঞ্জা নুয়োভা', 'ফেনোমেনোলজি অফ দি স্পিরিট' রচনা করেছেন, অথবা যিনি পেলোপোনেসিয়া-যুদ্ধের কাহিনী, অগাস্টাসের ও টাইবেরিয়াসের রাজনীতির কাহিনী রচনা করেছেন তাঁকে কবি বলা হবে না কেন আমি বুঝতে পারিনে। সনেটের মতোই এই সব রচনায় 'passion and lyrical and representative force' আছে। সংজ্ঞা ও সিদ্ধান্তকে ঘিরে এই যে আবেগ, এই যে উচ্ছ্বাস ও রূপকল্পনা তার মধ্যেই তাদের কাব্যত্ব নিহিত থাকে।

* * * শিল্প ও নীতির (morality) সম্বন্ধ নিয়ে আগেই আলোচনা করা হয়েছে। এখানে এ সম্বন্ধে এইটুকুই বলতে চাই যে, শিল্পসৃষ্টির সময় শিল্পীর মধ্যে সৃষ্টির আবেগ ছাড়া আর কোন আবেগই থাকে না এবং থাকে

না বলেই শিল্পীর মধ্যে কর্তব্যবোধ ঐকান্তিক থাকে। এবং এই হিসাবে—'every poet in the act of creation is moral because he accomplishes a sacred function'। শিল্পী যদি তার কর্তব্য বা নীতি থেকে ভ্রষ্ট না হন তা'হ'লে তার শিল্পের মধ্যে যে নীতির কথাই যাক, তাকে নীতিহীন বলা চলবে না।

* * * আমরা আত্মার বৃত্তিকে চার শ্রেণীতে ভাগ করেছি (জ্ঞানাত্মিকা ক্রিয়া দু'টি—প্রাতিভাসিক এবং বৌদ্ধিক জ্ঞান, কর্মাত্মিকা ক্রিয়া—আর্থনৈতিক ও নৈতিক) এবং দেখিয়েছি—কোনটিই নিরপেক্ষ নয়। অর্থাৎ প্রত্যেকটিই আবশ্যক। সুতরাং যাঁরা কোন একটিকে একমাত্র করে তুলে অন্যগুলিকে পরিহার করতে চান তাঁরা ভুল করেন। দার্শনিক, নীতিবাগীশ ও কর্ম-বিলাসীদের শিল্পের নিন্দায় এবং শিল্পীদের দর্শন-নীতি—কর্ম-বিমুখতায় এই ভুলের পরিচয় পাওয়া যায়।

* * নিমিত্ত-নৈমিত্তিকের বৃত্ত-কল্পনার বিরুদ্ধেও আপত্তি দেখা দিয়েছে। বলা বাহুল্য এই ধারণা দিয়েই আমরা শিল্পের স্বাতন্ত্র্য ও পারতন্ত্র্যের যৌগপদ্য প্রমাণ করেছি এবং অন্যান্য আত্মিক ক্রিয়ার (spiritual forms) ব্যাখ্যা করেছি। কিন্তু তবু আপত্তি উঠেছে। যাঁরা আপত্তি তুলেছেন তাঁদের বক্তব্য এই—'it thinks the work of the spirit a tiresome and melancholy doing and undoing, a monotonous turning upon itself not worth the trouble.' কিন্তু তাঁরা এই কথাটা ধরতে পারেন নি যে বৃত্তটি শুধুমাত্র আসা-যাওয়ার নিষ্ফল পুনরাবৃত্তি নয়—অবিরাম সমৃদ্ধির (continuous enrichment) ইতিহাস। যে শেষ নৈমিত্তিক আবার প্রথম নিমিত্ত হয়, সে পুরাতন প্রথম নিমিত্তটি থেকে পৃথক—তা' জীবনের বহু অভিজ্ঞতা ও ধ্যান-ধারণায় সমৃদ্ধ। সে 'affords material for a more lofty, more refined, more complex and more mature art.'

বৃত্তের ধারণাটি—আসলে প্রগতির (progress) চেতনার ও বাস্তব জগতের (reality) ক্রমবিকাশের যথার্থ দার্শনিক ধারণা (the idea of

the Circle is nothing but the true philosophical idea of progress, of the perpetual growth of the spirit and of reality itself where nothing is repeated, save the form of growth.)।

* * এই ধারণারই বিরুদ্ধে আর একটি আপত্তি বা বিদ্রোহ দেখা যায়—বৃত্তের অর্থাৎ জীবনের নিয়মের ঊর্ধ্বে কোন এক শান্ত গতিহীন অবস্থায় কল্পনার মধ্যে। বলা বাহুল্য এই শান্ত অবস্থা আসলে, 'an effectual negation of reality'—মৃত্যুর অবস্থা। কেউ কেউ এমন এক আধ্যাত্মিক অবস্থার স্বপ্ন দেখেন যেখানে বৃত্তের বিলোপ ঘটে যায়,—চিন্তার চিন্তা ছাড়া আর কিছুই থাকে না এবং জ্ঞান ও কর্মের ঐক্য ঘটে। এই অবস্থাকে প্রেম বা ভগবান বলা হয়ে থাকে। কিন্তু এঁরা বুঝতে পারেন না—'this thought, this unity, this Love, this God, already exists in and for the Circle, and that they are uselessly repeating a search already completed.'।

চতুর্থ অধ্যায়

শিল্পের সমালোচনা ও ইতিহাস

শিল্প-সাহিত্যের সমালোচনাকে শিল্পীরা অনেক সময় উৎপাত বলেই মনে করে থাকেন, কারণ সমালোচকরা তাঁদের উপর বিধি-নিষেধের আদেশ জাহির করেন, অনুমতি বা ছাড়পত্র দিয়ে থাকেন এবং মন্তব্যাদি প্রকাশ করে শিল্পকর্মের ক্ষতি বা উপকার করে থাকেন। এই কারণে শিল্পীদের কেউ কেউ মনে মনে ঘৃণা করলেও মুখে সমালোচককে খুব সমীহ করে চলেন, তোষামোদ ও প্রশংসা করে থাকেন; কেউ কেউ মনোমত প্রশংসা না পাওয়ায় এবং তোষামোদ করে নিজেকে ছোট করতে না চাওয়ায়, সমালোচকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন, নানাভাবে উপহাস করেন এবং সমালোচনার নিরর্থকতা প্রমাণ করতে চেষ্টা করেন। এই অবস্থার জন্য কোন ক্ষেত্রে ব্যর্থকাম শিল্পী এবং কোন ক্ষেত্রে সমালোচক—pedagogue সমালোচক দায়ী। এই সব সমালোচক বিধানদাতা ঋষি এবং অবতারের মতো ফতোয়া জাহির করেন—শিল্পীকে 'এ কর, ও কর' বলে আদেশ করেন, তাঁর মনোমত বিষয়বস্তু নির্বাচন করতে বলেন এবং বর্তমানের শিল্পের দোষ-ত্রুটি নিয়ে আক্ষেপ করেন।

* * * এই ধরণের পেডাগগ্ সমালোচকের সমালোচনা ছাড়া আর এক ধরনের সমালোচনা আছে। তাকে বলা যায়—বিচারকের (Judge) সমালোচনা। বিচারক-সমালোচক কোন ফতোয়া জাহির করেন না, তিনি সৃষ্ট শিল্পের গুণ-দোষ-সৌন্দর্য-অসৌন্দর্য নির্ধারণ করতে চেষ্টা করেন।

কিন্তু প্রশ্ন এই—কুৎসিত থেকে সুন্দরকে পৃথক করবার জন্য, এই সমালোচনার কোন প্রয়োজন আছে কি? সৃষ্টি ব্যাপারটিই তো আসলে কুৎসিত থেকে সুন্দরকে উদ্ধার বা পৃথক করা। অসুন্দরকে অপসারিত করেই তো প্রকাশের বিশুদ্ধতায় তথা সুন্দরে পৌঁছতে হয়। প্রত্যেকটি বিশুদ্ধ প্রকাশ মানেই অসুন্দরের আক্রমণ প্রতিহত করে সুন্দরকে সৃষ্টি করা। এই অসুন্দর

হচ্ছে—'his tumultuous human passions striving against the pure passion of art, his weaknesses, his prejudices, his convenience, his *laissez faire*, his haste, his having one eye on art and another on the spectator, on the publisher, on the impressario'—অর্থাৎ সেই সমস্ত কিছু যা' প্রতিরূপ-প্রকাশে কবির মনে বাধা সৃষ্টি করে। কিন্তু শিল্পী সৃষ্টির সময়ে নিজেই নিজের কঠোর সমালোচক, কোন কিছুই তাঁর চোখ এড়িয়ে যেতে পারে না, নিজেই তিনি বুঝতে পারেন কোথায় তিনি শিল্পী আর কোথায় তিনি সামান্য ব্যক্তিমাত্র, কোথায় সুন্দর কোথায় অসুন্দর। অতএব যে সমালোচনার উদ্দেশ্য সুন্দর-অসুন্দরের বিচার, তার প্রয়োজন কি ?

আর এক শ্রেণীর সমালোচনা আছে—যার উদ্দেশ্য টীকা বা ভাষ্য রচনা করা। কোন্ যুগে শিল্পের সৃষ্টি, সৃষ্টির বিষয়বস্তু কি, কঠিন কঠিন অর্থ, ঐতিহাসিক উল্লেখের ব্যাখ্যা এই সব যোগানোই এই সমালোচনার উদ্দেশ্য। সমালোচক যেন একজন শিক্ষক, যিনি শিল্প-রস আস্বাদনে সাহায্য করেন। 'Criticism is the art of teaching to read'—সমালোচকের উক্তিটি এখনও এই সমালোচনার মধ্যে বেঁচে আছে। শুধু যে প্রাচীন যুগের শিল্প সাহিত্যেরই ব্যাখ্যার প্রয়োজন আছে তাই নয়, সমসাময়িক শিল্প-সাহিত্যেরও ব্যাখ্যা আবশ্যক। এই হিসাবে সমালোচনার প্রয়োজন অবশ্যই স্বীকার্য। কিন্তু প্রশ্ন এই—একে ভাষ্য বা টীকা না বলে সমালোচনা বলা হবে কেন ? সমালোচনা না বলাই ভাল। না বললে অনেক ভুল বুঝাবুঝির হাত এড়ানো যাবে।

তা' হ'লে—প্রকৃত ও সত্য সমালোচনা কি ? প্রথমতঃ—সমালোচনা একাধারে উল্লিখিত তিনটি ব্যাপারই। অর্থাৎ সমালোচনায় ঐ তিনটি ব্যাপার অপরিহার্য।

(১) Without the moment of art, the material on which to exercise itself would be wanting to criticism—সৃষ্টির মুহূর্ত বাদ দিলে, সমালোচনা তার বিষয় বস্তুই হারিয়ে ফেলবে।

(২) Without taste (judicial criticism) the exercise of

art would be wanting to the critic.—রুচি না থাকলে সমালোচক শিল্পের রূপটিই ধারণা করতে পারবে না।

(৩) this experience would be wanting without exegensis. without the removal of the obstacles to reproductive imagination……কিন্তু প্রশ্ন এই—শিল্পকল্পের যথাযথ পুনরুদ্বোধনের জন্য যে সব তথ্য আবশ্যক, তা' সংগ্রহ করা সম্ভব কি ? সংগ্রহের সম্পূর্ণতা সম্ভব কি ? আর যতোই সম্পূর্ণ হোক, কল্পনা তার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে বাধ্য থাকবে কি ? সে কি নতুন কল্পনা হয়ে নতুন কিছু যোগ করবে না ? সুতরাং অন্যের বা অতীতের শিল্পকর্মের যথাযথ পুনরুদ্বোধন অসম্ভব নয় কি ?

এই শেষ প্রশ্নটির উত্তর নির্ভর করছে—আমাদের 'রিয়েলিটি'র ধারণার উপরে। যাঁরা মনে করেন—রিয়েলিটি হচ্ছে অণু-পরমাণুর দ্বন্দ্ব বা কতকগুলি 'মোনাডে'র সমষ্টি,তাঁদের কাছে যথাযথ পুনরুদ্বোধন অসম্ভব বলেই মনে হবে। কিন্তু আমাদের কাছে রিয়েলিটির ধারণা ভিন্ন—reality is spiritual unity and in spiritual unity nothing is lost and everything is an eternal possession। চৈতন্যের ঐক্য না থাকলে পুনরুপস্থাপন বা স্মরণ কোনটিই সম্ভব হতো না। আমরা যদি নিজেরা সিজার বা পোম্পে না হতাম—অর্থাৎ যে 'সামান্য' একদিন সিজার বা পোম্পের বিশেষ রূপ ধারণ করেছিল, সেই যদি আমাদের এই বিশেষ বিশেষ রূপ পরিগ্রহ না করতো, তাঁরা যদি আমাদের মধ্যে জীবিত না থাকতেন, তা' হ'লে সিজার বা পোম্পের ধারণা আমরা করতে পারতাম না। তারপর—যে দর্শন সামান্য ও বিশেষের মধ্যে বিচ্ছেদ কল্পনা করে—বিশেষকে সামান্যের 'accident' মনে করে সেই দর্শনে বিশ্বাসীরাই মনে করে একমাত্র সামান্যই পুনরুপস্থাপ্য।

আমরা মনে করি প্রকৃত সামান্য হচ্ছে সেই সামান্য যা' বিশেষাশ্রিত—বিশেষে পরিণত। তারপর, এ কথাও স্মরণীয় যে সম্পূর্ণ ও যথাযথ পুনরুপস্থাপন, আদর্শ বিশেষ এবং প্রত্যেক আদর্শেরই মতো realised in infinity। সুতরাং প্রত্যেক পুনরুপস্থাপনই যথাসাধ্য এবং যথাসম্ভব।

কিন্তু শিল্প, তার ঐতিহাসিক তথ্য এবং রুচি সমালোচনার 'conditions',

কিন্তু সমালোচনা নয়। এই তিনটির দ্বারা শুধু পুনরুপস্থাপন এবং প্রতিরূপের বা প্রকাশনের আস্বাদন সম্ভব হয়। আসল সমালোচনা—প্রতিভানের বাস্তবতা-অবাস্তবতা বিচার। শিল্পে যেহেতু সুন্দরই বাস্তব এবং অসুন্দরই অবাস্তব, সমালোচনা আসলে প্রতিভানের সৌন্দর্য-অসৌন্দর্য বিচার। শেষ পর্যন্ত শিল্পের সংজ্ঞার উপরে এই বিচার নির্ভর করে। শিল্পের সংজ্ঞার উন্নতি এবং অবনতির সঙ্গে সমালোচনার উন্নতি-অবনতি যুক্ত হয়ে আছে। শিল্পের যতরকম মিথ্যা সংজ্ঞা বা দর্শন আছে, সমালোচনায় ততরকম মিথ্যা পদ্ধতি দেখা দিয়েছে। যেমন (ক) এক রকম সমালোচনা আছে যা' প্রতিভানের স্বরূপটি উপলব্ধি না করে শিল্পকে খণ্ডে খণ্ডে ভাগ করে এবং শ্রেণীবিভক্ত করে। (খ) আর একরকম সমালোচনা আছে—যার নাম নীতি-সন্ধানী (moralistic), যা' শিল্পের মধ্যে শিল্পীর উদ্দেশ্য আবিষ্কার করতে চেষ্টা করে। (গ) আর এক রকম আছে—যার নাম আমোদ-সম্ভোগী (hedonistic), যা' শিল্পের আমোদজনকতার মাত্রা পরিমাপ করে। (ঘ) আর এক রকম সমালোচনা আছে যাকে বলা যায়—তত্ত্ব-হিসাবী (intellectualistic), যা' দর্শনের প্রকৃতি ও প্রগতি অনুসারে শিল্পের প্রগতি বিচার করে। (ঙ) আর এক রকম সমালোচনা আছে যাকে বলা হবে—মনস্তাত্ত্বিক (psychological) যা' আধার বা রূপ থেকে আধেয় বা বস্তুকে পৃথক করতে চেষ্টা করে এবং শিল্পের বিচার না করে শিল্পীর বিশ্লেষণ করতে চেষ্টা করে। (চ) আর এক শ্রেণীর সমালোচনা আছে যা' আধেয় থেকে আধারকে বা রূপকে পৃথক করে এবং রূপের নিরপেক্ষতা কল্পনা করে আনন্দ লাভ করে। (ছ) আর এক শ্রেণী আছে যা' অলংকার ও সৌন্দর্যকে সমার্থক মনে করে এবং (জ) আর এক শ্রেণী আছে যা' প্রথমে বিভিন্ন শিল্পের শ্রেণীর সূত্র তৈরি করে এবং পরে সেই সূত্র দিয়ে মেপে মেপে গ্রহণ বা বর্জন করে।

"এস্থেটিক ক্রিটিসিজিম্" এবং "হিস্‌টোরিকাল ক্রিটিসিজিম্"—নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্ব করলেও, এ কথা বলবই তারা খাঁটি সমালোচনা নয়। এই দুই পদ্ধতি সাধারণতঃ দর্শনের এবং বিশেষতঃ শিল্পের সংজ্ঞার প্রতি খুবই বিরক্ত! প্রথম পদ্ধতি দাবি করে—সমালোচনা করতে পারেন শুধু শিল্পীই, দ্বিতীয়

পদ্ধতির দাবি—সমালোচনার জন্য পাণ্ডিত্য আবশ্যক। প্রথমের কাছে সমালোচনা একমাত্র রুচি-নির্ভর, দ্বিতীয়ের কাছে—গবেষণা-নির্ভর। শিল্পতত্ত্বে সংজ্ঞা-নিরপেক্ষ বিশুদ্ধ রুচির কোন স্থান নেই, তেমনি স্থান নেই ইতিহাসের —যে তথ্য কুড়িয়েই খালাস, শিল্পের তত্ত্বের কোন ধার ধারে না।

অবশ্য যথার্থ সমালোচনা "এস্থেটিক"ই বটে; কিন্তু সে দর্শনকে ঘৃণা করে না, বরং দর্শনকেই আশ্রয় করে। আর সে ঐতিহাসিকও (হিসটোরিকাল) বটে, কারণ সে নানা তথ্য সংগ্রহ করে প্রতিভানের উৎস এবং উপাদান নির্ধারণ করার চেষ্টা করে, প্রতিভানটিকে সম্পূর্ণ রূপে ধ্যান করতে চেষ্টা করে। এই ভাবে দেখলেই দেখা যাবে—"ঐতিহাসিক সমালোচনা" এবং "শৈল্পিক সমালোচনা" একই ("historical criticism" of art and "aesthetic criticism" are the same)

কিন্তু, সমালোচনা বলতে যদি ঐতিহাসিক সমালোচনাই বুঝায় তা' হ'লে সঙ্গে সঙ্গে এ সিদ্ধান্তও অনিবার্য হয়ে পড়ে যে সুন্দর ও অসুন্দরের পার্থক্য-বিচার শুধু মাত্র সুন্দর বা অসুন্দর বলে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করা নয়। সমালোচনাকে ব্যাখ্যার (explanation) স্তরে উন্নীত হতেই হবে এবং ব্যাখ্যার স্তরে উন্নীত হওয়ার অর্থ—'জীবন সমালোচনায়' (criticism of life) পরিণত হওয়া। কারণ—it is not possible to judge—that is to characterise—works of art, without at the same time judging and characterising the works of whole life। প্রত্যেক বড় সমালোচকই, একাধারে, যত বড় দর্শন-নীতি-রাজনীতির সমালোচক তত বড় শিল্পের সমালোচক—শিল্পের, দর্শনের, নীতির ও রাজনীতির সমালোচক। এ কথা ভুলে গেলে চলবে না—আত্মার বৃত্তিগুলিকে কল্পনায় বিচ্ছিন্ন করা গেলেও কার্যত: বিচ্ছিন্ন করা যায় না। তা' করতে গেলে দেখা যাবে—তাদের অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে পড়েছে। অতএব—আমরা অন্য সমালোচনা থেকে শিল্প সমালোচনাকে পৃথক করতে পারিনে।

সমালোচনা ও শিল্পের ইতিহাসের পার্থক্যও আপাত পার্থক্য। বস্তুত: প্রকৃত ও সম্পূর্ণ সমালোচনা হচ্ছে—'the serene historical narration

of what has happened'—যা' ঘটেছে তার প্রশাস্ত, ঐতিহাসিক বিবরণ। সমালোচনা যেমন অন্যান্য সমালোচনা থেকে অবিচ্ছেদ্য, তেমনি শিল্পের ইতিহাসও মানব সভ্যতার সমগ্র ইতিহাসের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য যোগে যুক্ত।*

* * * (And since the criticism of art has shown itself to us to be inseparable from other criticism, so the history of art can be separated from the complete history of human civilisation only with a view to giving it literary prominence and where it certainly follows its own law, which is art, but receives its historical impulse from the complete history, which belongs to the spirit as a whole never to one form of the spirit torn from the others.)

সমাপ্ত